তখন দিগন্তব্যাপী হাহাকারের মধ্যেও আমি অটল থাকতে পেরেছি. তোদের মার মৃত্যুর পর থেকে সেই আলোটাই আমার সামনে দীপ্তি পে'ত— যখন তা'ও নিবে গেল, তখন যে কেবলমাত্র তোদের পানে চেয়েই আমার সব হাহাকার জয়ধ্বনিতে পূর্ণ করে দিয়েছি। তাঁর গচ্ছিত সম্পত্তি সযত্নে রক্ষা ক'রে যে তাঁরই হা'তে তুলে দিতে পেরেছি এরই সার্থকতায়—আমার হৃদয় মন ভরিয়ে দিয়েছি।

"আমি শুধু এই কথাটিই তোমাদের ব'লে রাখতে চাই-মা যে তোমাদের সতীলক্ষ্মী মা'কে দিয়ে ভগবান এখনও যে তিনটি সম্পত্তির অধিকারী ক'রে রেখেছেন—তাঁর নিয়োজিত কর্ম্মে, তাঁর প্রদর্শিত পথে যতদিন না তাদের চালিয়ে দিতে পারি ততদিন আমারও কর্ত্তব্যের শেষ হ'বে না, তোমরাও এ বৃদ্ধ পিতাকে ততদিন পর্য্যন্ত যথাসম্ভব সহানুভূতিই দান কোরো মা। আর আমি কিছুই বলতে চাই নে।"

হেরম্বনাথ উঠিতে উঠিতে বলিলেন—তোমরা খেয়ে নাও মা। আমি যাই।

ফিরিয়া পুনরায় কহিলেন—সুশীলা, সুনীলা নীলা, তোমাদের উপর আমার অন্য জোর নেই মা! তোমরা ত আমার নও, তোমরা তাঁর। এই বিপুল বিশ্বসৃষ্টি যেমন তাঁর—তোমরাও তাঁর। আমি তাঁর মহামূল্য সামগ্রীর রক্ষকমাত্র। ভারটুকু নমিত করতে পারলে তোমরাও সুখী হ'তে পারবে, আমিও সহাস্যমুখে তাঁর অনুগ্রহ লাভ ক'রে ধন্য হ'ব।

তিনি প্রস্থান করিতেই মেয়েরা দাঁড়াইয়া উঠিল। তাহারা অর্দ্ধভুক্ত আহার্য্য ফেলিয়াই উঠিয়াছিল কিন্তু তিনেরই মনের পাত্র কোথাকার

কোন্ কুবেরের ভাণ্ডারের অমৃতে ভরিয়া উঠিল যে, কোথায় রহিল ক্ষুধা, কোথায় রহিল তাহাদের পিপাসা! কোলাহল করিয়া তাহারা উপরে উঠিয়া গেল এবং অনেক রাত্রি পর্যান্ত বিনিদ্র থাকিয়া তাহাদের সন্ন্যাসী সংযমী পিতার কথাগুলিই ভাবিতে লাগিল।

নবম পরিচ্ছেদ

বিষম কাণ্ড।

ইহা কাহারও অবিদিত নাই যে, পৃথিবীতে সংযমের চেয়েও বড় জিনিষ একটা আছে যাহাকে অভিধানে অসংযম বলিয়া থাকে; ধর্ম্মের চেয়ে অধর্ম্ম বড়; দয়ার চেয়ে নিষ্ঠুরতা জগতে বেশী দেখা যায়। সে রাত্রে সুশীলা অন্ধকারে একাকী নিজের বুকের 'পরে হাত রাখিয়া বারংবার ইহাই শপথ করিয়াছিল যে, এখন হইতে কেবলমাত্র পিতাকে সুখী করাই তাহার জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য হইবে। কোন কারণেই তাঁহাকে ব্যথা দিয়া নিজের অধোগতি টানিয়া আনিবে না।

সঙ্গোপনে ইহাও সে স্বীকার করিয়াছিল যে, রাঁচীতে থাকা পিতার অনিচ্ছা, সে রাঁচীও যাইবে না। তাহার ছোট বোন দুটি যেমন পিতার স্নেহের তলে বাস করিয়া থাকে, সে'ও থাকিবে। মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের সোণার খাঁচার কল্পনা যেমন ভয়াবহ, তাহার কাছে গৃহপ্রাচীরে আবদ্ধ থাকার কল্পনাও তাহাপেক্ষা অল্প নহে, কিন্তু সে তাহাও সহ্য করিবে! মনের মধ্যে এই সঙ্কল্প লইয়া সে যখন প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিল, তখন ব্রতধারিণী হিন্দু গৃহলক্ষ্মীটির মতই তাহার মুখ চোখ পবিত্র আলোকোদ্ভাসিত, আর হৃদয় মন শান্ত সংযত হইয়া গেছে।

কিন্তু কোথায় রহিল তাহার সংযম! আর কোথায় রহিল তাহার সে প্রতিজ্ঞা। সে কথা পরে বলিতেছি।

প্রীতির নিদর্শন

বেলা দেড়টা বাজিতেই সিংহ সাহেবের প্রকাণ্ড ড্যামলার কার হেরম্বনাথের বাটীর সম্মুখে থামিতেই সুশীলা সিংহ সাহেবকে দেখিয়াই পাংশু বিবর্ণ হইয়া গেল। সিংহ সাহেব প্রশান্ত মুখে উপরে আসিয়া স্বাভাবিক সহজ স্বরেই কহিলেন—চল সুশীলা, দেড়টা বেজে গেছে যে।

সুশীলা হঠাৎ 'না' বলিতে পারিল না, সে সিংহ সাহেবকে বসিতে আসন দিয়া, পিতাকে সংবাদ দিতে গেল। হেরম্বনাথ সসব্যস্তে উঠিয়া আসিতেই, সিংহ সাহেব বলিলেন—আজ একবার মাঠ-টা ঘুরে আসি।

হেরম্বনাথ কন্যার দিকে চাহিলেন, মুখে কোন কথা বলিতে পারিলেন না। সুশীলাও বিনা কথায় গৃহে প্রবেশ করিয়া, বেশ পরিবর্ত্তন সারিয়া সিংহ সাহেবের সঙ্গে গাড়ীতে উঠিল।

হেরম্বনাথ তখনও কোন কথা কহিলেন না। সুনীলা ও ফেণিলা সমস্তই দেখিয়াছিল, তাহারও এ আলোচনায় মন দিতে পারিল না।

সুনীলা জানিত, এ প্রসঙ্গ একবার উত্থাপিত হইলে নীলাকে কোনমতেই বাধা দেওয়া যাইবে না, এবং তাহাতেই কতকগুলা অপ্রিয় সত্য-মিথ্যা এমন জঘন্য হইয়া প্রকাশ পাইবে, যাহা ভাবিতেও সুনীলা বেদনা বোধ করিতেছিল। সারা মধ্যাহ্নটা সে পিতার ঘরে, পিতার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী পড়িয়া যাইতে লাগিল। হেরম্বনাথ মধ্যে মধ্যে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন—নীলা কোথায় সু?—সুনীলা বলিতেছিল, সে ঘরে শুইয়া হিষ্ট্রী অব্ রোম পড়িতেছে। হেরম্বনাথ কতবার বলিলেন—আহা, তাকে ডাক্ সু, তাকে ডাক্, সে শুনুক এসে। এ যদি না শুনল······সুনীলা বলিল—না বাবা, ইতিহাসের চেয়ে প্রিয় তার আর কিছু নেই। সে বলে কবিত্ব কেবল ধোঁয়া, ইতিহাস স্থূল,

প্রত্যক্ষ! হেরম্বনাথ তর্কে প্রবৃত্ত হইয়া কহিলেন—তা'কে ডাক্ সু। আমি তা'কে বুঝিয়ে দিই, কবিতা ইতিহাসের চেয়েও প্রত্যক্ষ, একেবারে মনের কথাটি পর্য্যন্ত ধরিয়ে দেয়।—সুনীলা বলিল—না, বাবা, সে আস্‌বে না। তখন আর হেরম্বনাথ কিছু বলিলেন না। কিন্তু ইহা তিনি বুঝিতে পারিতেছিলেন, এই দুইটি অভিন্নহৃদয় তরুণী সখীর মধ্যে এমন কিছু ঘটিয়াছে—যাহাতে উভয়ে উভয়কেই এড়াইয়া চলিবার চেষ্টায় তৎপর!

সুনীলা পড়া শেষ করিয়া অপরাহ্নে উঠিয়া গেল। হেরম্বনাথও বারান্দায় আসিয়া চেয়ারখানা টানিয়া বসিয়া পড়িলেন,। কতবার আশা করিতেছিলেন—এখনি নীলা আসিয়া ঐ চেয়ারখানা টানিয়া বসিয়া পড়িবে, এখনই রোমের, গ্রীসের, অতীত ভারতের কথা কহিতে কহিতে উত্তেজিত হইয়া উঠিবে, কিন্তু দিবাকরের শেষ রশ্মিটুকু সোণার স্বপ্নের মত ছাদে ছাদে আলিসায় আলিসায় লুকোচুরী খেলিয়া, একেবারে কোন্ বাড়ীর আড়ালে ঢাকা পড়িয়া গেল, তবুও নীলা আসিল না।

সুনীলা জানিতে চাহিল, চা আনিবে কি-না—হেরম্বনাথ তাহাকেই কাছে ডাকিয়া, জিজ্ঞাসিলেন—নীলা কোথা রে সু?

দেখি বাবা—বলিয়া সুনীলা চলিয়া গেল; এবং দু'মিনিট পরেই আসিয়া বলিল—এখনও রোম্ পড়ছে।

না, না, সন্ধ্যাবেলা পড়া থাক্, ডাক্—

আমি ডেকেছি বাবা। বল্লে, বাবা বেরোন নি?

এই সময়ে ফেণিলা আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখখানি রৌদ্র দগ্ধ ফুলটির মত শুকাইয়া গেছে, চোখ দুইটি অত্যন্ত শ্রান্ত, হেরম্বনাথ সস্নেহে

তাহার কটিবেষ্টন করিয়া কহিলেন—এমন সময়ে কি পড়তে আছে মা ?

ফেণিলার ঠোঁট দু'খানি ঈষৎ নড়িয়া উঠিল, যেন সে কি বলিবে। হেরম্বনাথ তখনি বলিয়া উঠিলেন—আজ একা বসে' সূর্য্যাস্ত দেখতে হ'ল নীলা! ঐ ছাদে, ঐ আলিসায় রশ্মিগুলি নাচতে নাচতে ঢলে পড়ল, সরে সরে আবার ঐ হেমদত্তর চিলের কোঠায় পালিয়ে গেল, সবই সেই হ'ল—আমার কিন্তু আজ একটুও ভালো লাগল না দেখতে!

ফেণিলা মৃদুস্বরে কহিল—আমি ভেবেছিলুম, তুমি বেরিয়েছ বাবা।

এসময় কি কোনদিন আমি বেরুই মা? কেন তোমার কি মনে নেই, সেবার যখন ডিউক্ এল, আমি গার্ডেন পার্টির নেমন্তন্ন রাখতেও যেতে পারি নি।

ফেণিলার তাহা মনে ছিল, ঘাড়টি নাড়িয়া বলিল—তুমিই যে কাল বলেছিলে বাবা, বিকেলে খগেন বাবুর মেসে যাবে।

ওঃ—বলিয়া হেরম্বনাথ কেদারায় ঠেসান দিয়া পড়িলেন, আবার তখনি উঠিয়া বসিয়া কহিলেন—আজ গেলেও ত দেখা হ'ত না নীলা! আজ যে শনিবার।

নীলা আর কথা কহিল না। টুলটা টানিয়া টুক্ করিয়া বসিয়া পড়িল। সুনীলা ভৃত্যের হাতে চায়ের সরঞ্জাম দিয়া যখন বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল, তখন ভালো করিয়া কাহারো মুখ দেখিতে না পাইলেও কেমন একটা বিসদৃশ বোধ করিয়া, বিরক্তিপূর্ণ স্বরে চাকরটাকে তর্জ্জন করিয়া উঠিতেই, হেরম্বনাথ ও ফেণিলা যুগপৎ বিস্ময়ে ফিরিয়া চাহিলেন। ভৃত্য ক্ষুদ্র টেবিলটা টানিয়া চায়ের জিনিষগুলি নামাইয়া দিয়া, চলিয়া গেল।

প্রীতির

নিদর্শন

হেরম্বনাথ নীরবে চা-পান করিতে লাগিলেন; সুনীলা নিজেও এক পেয়ালা চা লইয়া বসিয়া গিয়াছিল, কিন্তু সেদিন স্বকৃত সুস্বাদু চা-ও তাহার রসনায় অত্যন্ত তিক্ত বিস্বাদ অনুভূত হইল—সকলের অজ্ঞাতে চায়ের পেয়ালা নামাইয়া রাখিয়া, একটু দূরে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অন্যদিন হইলে হেরম্বনাথ নিশ্চিত—আর এক, অন্ততঃ আধ পেয়ালা অতিরিক্ত খাইতে বারবার অনুরোধ করিতেন এবং নিষ্ফল হইলে নিজেই ক্ষতিটা বেশী করিয়া পূরণ করিয়া লইতেন--আজ তিনি কিছুই বলিলেন না—ইহাতেই তাহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, পিতা আজ অত্যন্ত অন্যমনস্ক, চিরদিনের অভ্যাসটিও ভুলিয়া বসিয়া আছেন!

এই সময়েই মোটর গাড়ীর ভেঁপুতে সচকিত হইয়া ফেণিলা আসন ছাড়িয়া উঠিল, এবং কোন দিকে না চাহিয়াই দ্রুত বেগে অন্যত্র পলায়ন করিল। হেরম্বনাথ বাধা দিবার উদ্যোগ করিতেই সুনীলা নিম্নকণ্ঠে জিজ্ঞাসিল—আর এক পেয়ালা দিই?

আর—থাক্—বলিয়া হেরম্বনাথ মূঢ়ের মত বসিয়া রহিলেন।

সুশীলা হাস্যমুখে কহিল—তোমার চা খাওয়া হ'য়ে গেছে বাবা?

তোমাদের চা আনি দিদি। মিঃ সিংহ আছেন ত?

আছেন--শুনিয়া সুনীলা চলিয়া গেল এবং সেই মুহূর্ত্তেই মিঃ সিংহ দর্শন দিলেন।

আমাকে পাঁচ মিনিট মাপ করুণ—বলিয়া সুশীলাও চলিয়া যাইতে, মিঃ সিংহ অদ্যকার রেশের বিশদ উপাখ্যান বিবৃত করিতে লাগিলেন। সিংহ সাহেবের তন্ময়তা বোধ করি তখনও ঘুচে নাই নতুবা এত বড় অমনোযোগী শ্রোতার সামনে এমন অনর্গল বকিয়া যাইতে তাঁহার নিজেরই

লজ্জা জন্মিত। হঠাৎ এক সময়ে ধারণা হইল, তাঁহার এত শ্রম সমস্তই বিফল হইতেছে, হেরম্বনাথ রেশের কথায় আদৌ মন দিতেছেন না—তখন তিনি গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসিলেন—আজ কি আপনার শরীরটা ভালো নেই?

হেরম্বনাথ হাসিয়া উঠিলেন; হাসিয়া কহিলেন—শরীর! শরীর খারাপ আমার কদাচিৎ হয়, মিঃ সিংহ। গত দ্বাদশ বর্ষের মধ্যে অসুস্থতা আমি টের ও পাই নি।

মিঃ সিংহ বলিলেন—না, না, শরীর লইয়া গর্ব্ব করিতে নাই। আমি বরাবর দেখিয়াছি এই গর্ব্ব যাহারা করে, তাহারাই অতি শীঘ্র রোগে পড়ে।

হেরম্বনাথ আরো উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন। এক মিনিট পরে, হাসি থামাইয়া বলিলেন—তবে, বোধ করি মিঃ সিংহ, অতি শীঘ্র পড়িতে চাই বলিয়াই আমি এত গর্ব্ব করিয়া থাকি।

সুশীলা বারান্দায় পা দিবার পূর্ব্বেই প্রশ্ন এবং উত্তর সবটাই শুনিতে পাইয়াছিল, যেমন নিঃশব্দে সে আসিয়াছিল, তেমনি সন্তর্পণে বাহির হইয়া গেল। তাহার আগমন নির্গমন কোনটাই যাঁহার দৃষ্টির অগোচর রহিল না, তিনি ঈষৎ চঞ্চল হইয়া যেন আপনাকেই কহিলেন—আমার আবার একটু তাড়া আছে কি-না!

হেরম্বনাথ "আপনার চা-টা এখনো এ'ল না! ও সু, সু"…বলিয়া ডাকিতেছিলেন, মিঃ সিংহ "না, অত তাড়া নেই। আসুক-না, আমি ত আছিই"…ইত্যাদি কহিয়া চেয়ারের উপর সুবিশাল দেহভার ন্যস্ত করিয়া দিলেন।

একটু পরে কহিলেন—আপনি সেদিনের সেই জকি ভদ্রলোকটির কথা শুনেছিলেন ত! আজও আমাদের দেখা হ'য়েছিল তাঁর সঙ্গে। তিনি খগেনবাবুর খোঁজ করছিলেন। সেকেণ্ডে থাকলে, খগেন বাবুর আজ মোটামুটি লাভ হ'ত। "সেলুন" তাঁর টিপ ছিল।

হেরম্বনাথ সাগ্রহে জিজ্ঞাসিলেন—খগেন যায় নি রেসে?

সেকেণ্ডে যায় নি। শেষে দেখি থার্ডে ঢুকে, কাবলী টাবলী কতকগুলো ছোট লোকের সঙ্গে......

আপনি দেখলেন?

সুশীলাও দেখেছেন। অবশ্য সে আমাদের দেখতে পায় নি। তবে হেরেছে—বেশ হেরেছে। কারণ, আমরা যখন ফিরছি, ক'টা কাবুলী-ওয়ালা মিলে রাস্তায় তা'কে টানাটানি করছিল, দেখা গেল।

হেরম্বনাথ লাফাইয়া উঠিলেন, বলিলেন—তারা টানাটানি করছিল কেন?

সিংহ ভাবিয়া চিন্তিয়া কহিলেন—ঠিক বলতে পারি না, তবে অনুমান হয়......

হ্যাঁ-হ্যাঁ...

যাক্।......এই যে চা এসে পড়েছে। সুনীলা ও সুশীলা, সিংহ সাহেবের সম্মুখে চা ও নানাবিধ মিষ্টান্নপূর্ণ রেকাবী নামাইয়া দিল।

সিংহ সাহেব বলিলেন—কি কাণ্ড করেছ—সুশীলা? হ্যাঁ, অনুমান হয়, রেশ্ খেলবার টাকা জোটে নি—ঐ কাবলীদের কাছে ধার করেছেন।

হেরম্বনাথ জিজ্ঞাসিলেন—মাঠে, অচেনা লোককে টাকা ধার কাবলীতেও দেয়?

শুনেছি ত—দেয়। কাবলীর টাকা ত আর মারা যাবার নয়।

কেন?

দেখুন-না। আমি ধার চাইলাম, দিলে—আমি ত আর মাঠ ছেড়ে পালাতে পারব না, যখন বেরুব, ঠিক ধরবে। জিত হ'য়ে থাক্‌লে সুদশুদ্ধ (দশটাকায় একটাকা বেশী) শোধ, হার হ'লে তখনই টানা হেঁচড়া।

হেরম্বনাথ উৎকণ্ঠিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনারা দেখ্‌লেন, খগেনকে তারা টানা হেঁচড়া করছে?—বলিয়া তিনি সুশীলার দিকে চাহিতে লাগিলেন।

সুশীলা নতমুখ, নীরব।

সিংহ সাহেব যেন হেরম্বনাথের ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়াছেন—এই মর্ম্মে দৃপ্তকণ্ঠে কহিলেন—দেখ্‌লেও আমরা কি করতে পারতাম বলুন? অত লোকের মাঝখানে আমি ত আর জামিন হ'য়ে তাঁকে ছাড়াতে পারতাম না। কত বড় বড় সাহেব সুবো অবধি আমাকে চেনে!

হেরম্বনাথ যেন এ-সবের কিছুই শুনিতে পান নাই, ব্যগ্র হইয়া বলিলেন—আপনারা দেখ্‌লেন তাঁকে টেনে নিয়ে গেল?

সিংহ সাহেব আস্তে আস্তে বলিলেন—দেখলাম বৈ-কি!

হেরম্বনাথ আর কিছুই বলিলেন না। সুশীলা চায়ের পেয়ালাটা নামাইয়া দিয়া ধীরপদে প্রস্থান করিল। সিংহ সাহেবও চা-টুকু নিঃশেষ করিয়া কহিলেন—গুড্‌-নাইট।

সুশীলা তাঁহাকে দ্বার অবধি পৌছাইয়া দিতেই, সিংহ সাহেব সুশীলার করধারণ করিয়া বলিলেন—আসি সুশীলা!

প্রীতির

নিদর্শন

সুশীলা নমস্কার করিয়া উপরে আসিতে, হেরম্বনাথ বলিলেন—সুশীলা, রেশ্ যাওয়া ছাড়। রেশ্ ভদ্র বঙ্গ মহিলার খেলা নয়।

সুশীলা বলিতেছিল—কেন কত হাজার হাজার ভদ্রমহিলা……

হেরম্বনাথ বলিলেন—তর্ক করো না সুশীলা! ভদ্র মেয়ে জুয়া খেলে না।

সুশীলা দৃঢ়স্বরে কহিল—তুমি ত যাওনি বাবা, গেলে দেখ্তে……

বাধা দিয়া হেরম্বনাথ বিরক্তিপূর্ণ স্বরে কহিলেন—তর্ক করো না, আমি বল্‌ছি, রেশ্ ছাড়। রেশ্ বাঙ্গলা দেশের—বাঙ্গালী ছেলেমেয়েদের খেলা নয়।—বলিয়া তিনি দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং কোনদিকে না চাহিয়াই সোজা নিজের ঘরের দিকে চলিলেন।

আর সুশীলা! কোথায় রহিল—সারানিশি জাগিয়া যে সঙ্কল্প গঠন করিয়া হৃদয়, মন সংযমে ভরিয়া, প্রভাতে সে শয্যাত্যাগ করিয়াছিল! গমনোদ্যত পিতার পানে তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া অধিকতর তীব্রকণ্ঠে কহিল—তোমার ঐ এক কেমন বাবা! খগেনকে কাবলীওলায় টানাটানি করেচে, সে'ও আমার দোষ! সে জুয়া খেলে' সর্ব্বস্ব ঘোচায়—তা'তেও আমাদের দোষ! আমি ……ইত্যাদি ইত্যাদি।

—আমায় মাফ্ কর, সুশীলা!—

হেরম্বনাথ দ্বারটি ভেজাইয়া দিয়া বিছানায় প্রবেশ করিয়া, আজ অনেক দিনের পরে, দু'হাতে মুখ ঢাকিয়া—যেন—যেন—কাঁদিয়া ফেলিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

অভাবনীয়।

দ্বারটি ঠেলিয়া, অন্ধকারে হাঁতড়াইয়া সুইচ্ টিপিয়া সুশীলা ডাকিল—নীচে এসে একবার দেখে যাও বাবা।

হেরম্বনাথ তাড়াতাড়ি উঠিতেই, সুশীলা অগ্রসর হইল। হেরম্বনাথ জিজ্ঞাসিলেন—কি, হ'য়েছে কি?

সুশীলা কেবলমাত্র কহিল—জুতোটা রেখে এস, দেখতেই পাবে।

হেরম্বনাথ ভয়ার্ত্তমুখে নীচে নামিয়া আসিতেই সুশীলা মৃদুকণ্ঠে কহিল—ঐ দেখ।

হেরম্বনাথ প্রথমটা রান্নাঘরের জানালায় ফেণিলা ছাড়া আর কাহাকেও দেখিতে পান নাই। সুশীলা তাঁহাকে আর একটু অগ্রসর হইতে বলায় তিনি যখন ঠিক সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন জানালার বাহিরে পথে আর একটা লোকের শুষ্ক রুক্ষ মূর্ত্তি রাজপথের গ্যাসের আলোকে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। হেরম্বনাথের বক্ষ ভীষণ আবর্ত্তনে সমুদ্র বক্ষে জাহাজের মত দুলিতেছিল। তিনি উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন—নীলা!

রাজপথ হইতে মূর্ত্তিটা উর্দ্ধশ্বাসে সরিয়া গেল। হেরম্বনাথ ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—ওখানে কে ছিল নীলা?

নীলা একমুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া কহিল—খগেনবাবু।

প্রীতির
নিদর্শন

সুশীলা কহিল—কাণ্ড কতদূর এগিয়েচে, বুঝলে ত বাবা ?

হেরম্বনাথ ঘৃণায় লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া বলিলেন—খগেন ওখানে দাঁড়িয়েছিল কেন নীলা ? কি করতে এসেছিল ও ?

নীলা কথা কহিল না। হেরম্বনাথ কতবার প্রশ্ন করিলেন, নীলা অবনত মুখে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল, কোনটিরই উত্তর দিল না।

সুশীলা বার বার বিজয়োল্লাসে এই কথাটাই প্রচার করিতে লাগিল—বাবা ত কিছুই দেখবেন না, শুন্‌বেন না ! এই হ'বে না ত কি হ'বে ! এ ত সকলেই জানে, পথের কুকুরকে আস্কারা দিলে মাথায় ত উঠেই, অনেক অপকর্ম্ম করতেও তারা পেছোয় না। ছিঃ ছিঃ কি লজ্জা, কি লজ্জা !

হেরম্বনাথের মুখ দিয়া কথা সরিতেছিল না।

সুশীলা পিতাকে তদবস্থ দেখিয়া পুনশ্চ কহিল—এখন সামলাও বাবা। বড় ভালো ছেলে, বড় ভালো ছেলে, টকাটক্ পাশ করেছে, বি-এ, অনার্স ! মুখে আর সুখ্যাতি ধরে না যে, নাও এখন ! চাকর-বাকর পর্য্যন্ত জান্তে পেরেছে।

হেরম্বনাথ বেদনা ভরা দৃষ্টিতে একবার মাত্র চাহিয়াই মুখটি নামাইয়া লইলেন। সুশীলা বলিল—ঐ কামিনীই ত আমাকে ডেকে দিলে, বল্লে বড়দি', মজা দেখ-সে। আমি ভাবলুম, কি-না-কি ! ওমা, এসে দেখি, এই ব্যাপার ! সে কি ছাড়তে পারে এ বাড়ী ? ভেতরে ঢোকবার সাহস নেই, সব বিশ্বে জানাজানি হ'য়ে গেছে, তাই এখন, "শ্যাম বেড়ায় কুঞ্জের ধারে ধারে।"

হেরম্বনাথের মনে হইতেছিল, সুশীলার কথাগুলি ভীষণ আগুনে

পুড়িয়া লাল হইয়া কাণের মধ্য দিয়া তাঁর বুকটিকে পুড়াইয়া ফেলিতেছে। এবং এতই ভীষণ সে আগুন—যে স্থানটা স্পর্শ করিতেছে—একেবারে অচল, নিস্পন্দ করিয়া দিতেছে। অতি কষ্টে নিঃশ্বাস ফেলার মত একবার ফেণিলার পানে' চাহিয়া ডাকিলেন—ফেণিলা!

ফেণিলা মুখও তুলিল না, সাড়াও দিল না। হেরম্বনাথের মনে হইতেছিল, মেয়েটা যদি একটা মিথ্যা প্রতিবাদও করিতে পারে, সুশীলার বিষাক্ত জিহ্বা অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যও নিবৃত্ত হয়। কিন্তু সেই অবাধ্য মেয়েটা সেই যে ঘাড় গুঁজিয়া দাঁড়াইয়াছে, বোধ করি নিঃশ্বাসও ফেলিতেছে না। তবুও, হেরম্বনাথ বিরুদ্ধ আশা করিয়াও, বলিলেন—ফেণিলা, কিছু বল্‌বে?

ফেণিলা কথা কহিল না, কহিল সুশীলা। সুশীলা পূর্ব্ববৎস্বরে কহিল—ও বলবে কি? ওর দোষই বা কি! ছেলে মানুষ, ওকে ডেকেছে, ও গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ও-ত আর ভালোমন্দ অত শত জানে না। ওকে যেমন বুঝিয়েছে, তেমনি বুঝেছে। কামিনী ত স্পষ্টই বল্লে,—শুনেছে—কি দেওয়া-নেওয়ার কথা হ'চ্ছিল।—একমুহূর্ত্ত থামিয়া সুশীলা কণ্ঠে কিসের একটা খোঁচা তুলিয়া কহিল—এতক্ষণে বুঝলে ত বাবা!

হেরম্বনাথ কি বুঝিলেন, কে জানে! সেইখানেই বসিয়া পড়িয়া দু'হাতে কপালের শির দুটি চাপিয়া ধরিলেন।

সুশীলা আপন খেয়ালে বলিতে লাগিল—সাহসকেও বলিহারী। এই সন্ধ্যে রাত্রে, পথে এত লোকজন, গাড়ীঘোড়া, এত আলো,—তুচ্ছ করে' ভদ্রলোকের জানালায় দাঁড়িয়ে·····

হেরম্বনাথ বলিয়া উঠিলেন—আঃ সুশীলা, থাম-না!

প্রীতির

নিদর্শন

সুশীলা প্রথমটা থতমত খাইয়া গেল। তার পর আস্তে আস্তে বলিল—আমি থামলেই যদি সব দিক রক্ষে হত, না-হয় চুপই করতুম। কিন্তু এ-যে লোকজন, চাকর-বাকরও কাণাঘুষো করছে। আর, তা'ও বলি বাবা, এখনও তুমি চুপ চুপ করে' এই সবের প্রশ্রয় দিতে চাও? তা' হলে যা দাঁড়াবে……

কামানের গোলাটা সামনে ছিট্‌কাইয়া পড়িলে সৈনিক যেমন নিমেষের জন্য সন্ত্রস্থ হইয়া উঠে, সুশীলা-ও তেমনই অকস্মাৎ ফেণিলার তপ্ত কণ্ঠস্বরে কি-রকম হইয়া গেল।

ফেণিলা বলিতেছিল—কিচ্ছু দাঁড়াবে না দিদি। সে ভয় করো না। গরীবের ছেলের দ্বারা অপকার হ'বার সম্ভাবনা খুবই কম। সে ভেতরেও ঢুক্‌বে না, এবং তোমার কল্পিত নিদারুণ ভয়-ভাবনার পরিণামও কিছু ঘট্‌বে না।—বলিয়া সে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

সুশীলার জ্ঞান ফিরিয়া আসিতে সে যখন ঘরটা বেশ করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া লইতেছিল, তখনি আবার ফেণিলা বিক্ষিপ্ত চরণে ঘরে ঢুকিয়া ততোধিক বিক্ষিপ্তস্বরে কহিল—ভাবনা গরীবদের নিয়ে নয়। সারা [illegible]টায় যেখানে দেখ্‌বে, সব দেখ্‌বে ঐ হোমরা-চোমরা বড় বড় বাবুদের [illegible]যেই ভাবনা। বড় হ'য়েছেন বলেই বোধ করি কোন ছোট কাজ করতে তাঁরাই পেছোন না, কোন ভণ্ডামীই তাঁদের বাধে না—কিন্তু গরীবের বাধে। তাদের দারিদ্র অপরাধ ছাড়া আর বেশী ছিদ্র পাবে না দিদি—যা তোমার, এই দেশের বড়দের মধ্যে অগণিত দেখ্‌বে।

কাঠগড়ার আসামী বিচারকের সামনে যেমন কেবল চোখের

আগুণের দ্বারাই অভিযোক্তাকে বিচারকের ক্রোধানলে সমর্পণ করিতে চায়, সুশীলাও তেমনি বারবার পিতার পানে চাহিতে লাগিল।

ফেণিলা সে দৃষ্টি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া দিয়া বলিল—বড় লোকের বড় কথা দিদি, সে ধরবার মত ক্ষুদ্রতা তোমারও নেই, বড় লোকেরও বোঝবার ক্ষুদ্রতা নেই—কিন্তু গরীবের অল্প ছিদ্রকেই টেনে টুনে তোমরা বিরাট করে তুলতে খুব পার,—খুব চাও, খুব পার। তা আমি জানি।

আমরা চাই? তুমি জান!!!

সে কথা কি নিজেই জান না দিদি? আমাকে জিজ্ঞাসা করে আর কেন ভণ্ডামী করছ?

বাবা, বাবা! আমি ভণ্ডামী করছি! বাবা! শুন্ছ?

ফেণিলা আরো উত্তেজিত হইয়া উঠিল, কহিল—বাবাও শুন্‌ছেন, তুমিও শুন্‌ছ। আমি ত গোপন করতে চাই নি দিদি, কালও না, আজও না। আমার যা বলবার তা আমি এমনি করেই বল্‌তে চাই ও বল্‌তে পারি।

—বলিয়া সে বাহির হইয়া যাইতেছিল, সুশীলা সামনে দাঁড়াইয়া বলিল,—আজই আমার এখান থেকে চলে যাওয়াই উচিৎ ছিল, আমি কালই রাঁচী যাব।

তাই যেও দিদি, তাই যেও। আজই কেন যাও নি তাই ভাবি আমি।

তা ত বল্‌বেই তুমি। আজ গেলে ত আর তোমার খগেনবাবুর কীর্ত্তি······

দাঁড়াও দিদি! খগেনবাবু একা 'তোমার' নয়। একদিন সে আমার

তোমার, বাবার—সবারই ছিল। যখন কোন বড় লোক আসে নি, তখনকার কথা মনে পড়ে কি? তখন খগেন ছাড়া বায়স্কোপ দেখা চল্‌ত না, খগেন না এলে দিনটাই বৃথা মনে হ'ত, খগেন উপরি উপরি দু'দিন না এলে বাবাকে যে ছুটতে হ'ত খোঁজ নিতে,—সে কি একা আমারই বলে? সে ত তখনও গরীব ছিল দিদি, তখন ত কৈ এত অপ্রসন্ন ছিলে না তুমি! বড় লোক সে ত কোন দিনই নয়, তখন ত সে এ বাড়ীর কুকুর-বেড়ালটারও প্রিয় ছিল, বড় গাছের আওতায় ফেলে সে বেচারাকে মেরে কেন হাত গন্ধ করবে দিদি, তা'কে অব্যাহতি দাও। সে'ও বাঁচুক, তোমরাও বেঁচে যাও।

সুশীলা নিস্পন্দ অসাড়,—স্তম্ভিত হইয়া গেল। এতটুকু একটা মেয়ে, বয়সে দশ বছরেরও ছোট, সে মুখের উপর এই সব কথা বলিয়া গেল। পিতার সমক্ষে, অসঙ্কোচে বলিতেও তাহার দুঃসাহস হইল।

বোধ করি একমিনিটেরও কম সময় সুশীলার বিমূঢ়তা বর্ত্তমান ছিল, তাহারই পরে সে একেবারে ফেণিলাকে টানিয়া পিতার সামনে ছাড়িয়া দিয়া বলিল—অপরাধ আমার! রাস্তার হতভাগাকে ডেকে রান্নাঘরের জানালায় এনে গোপন আলাপন করি! অপরাধ আমার!

হেরম্বনাথ অন্য একটা দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেলেন। তাহাতে সুশীলার রোষ বাড়িল বৈ কমিল না। সেই দ্বিগুণিত রোষের বেগ সবলে ফেণিলার স্কন্ধে চাপাইতেই সুশীলা তেজের সঙ্গে প্রশ্ন করিল—অপরাধ আমার! কিন্তু ঐ হতভাগা পাজীটা জানেলায় দাঁড়িয়ে, হাত ধরে কি ধর্ম্ম কথা শোনাচ্ছিল শুনতে পাই কি?

ফেণিলা স্তব্ধ হইয়া রহিল দেখিয়া সে পুনরায় জোর দিয়া বলিল—বল-না কি সারমন প্রিচ্ করছিল, শুনে ধন্য হ'য়ে যাই ?

তবুও ফেণিলা কথা কহিল না দেখিয়া সুশীলা কথঞ্চিত শান্ত হইয়া বলিল—কামিনী কি বল্লে ? কতক্ষণ ধরে যে এ-রকম কথাবার্ত্তা হ'চ্ছে তার আর ঠিক নেই। শুধু কি কথাবার্ত্তাই হ'য়েছে—তারই বা ঠিক কি ?—এ কি খুব গর্ব্বের কথা ?

কথাটা এমন বিশ্রী, জঘন্য, মর্ম্মান্তিক না হইলে ফেণিলা চীৎকার করিয়া উঠিত, এবং যে কুৎসিৎ ইঙ্গিত করিতে সুশীলার এতটুকু বাধে নাই, তাহার প্রতিবাদ করিতে কামিনীরও ডাক পড়িত, কিন্তু ক্রোধে অপমানে সে-যেন একেবারে অসাড় হইয়া পড়িয়াছিল।

সুশীলা এবারে আরো শান্ত সংযত কণ্ঠে কহিল—কামিনী বল্‌তে ত আমি বিশ্বাসই করি নি। এ-কি বিশ্বাস করা যায় ? সে-যখন বল্লে মধু-ও দেখেছে, সে-ই কামিনীকে ডেকে দেখিয়েছে, তখন......

এতক্ষণে ফেণিলা মুখ তুলিয়া চাহিল। হাত দু'টি, চোখের পাতা দু'টি, একবার কাঁপিয়া উঠিল, শুষ্ক পাংশু কণ্ঠাধরে বল সঞ্চয় করিয়া ধীরে ধীরে কহিল—কামিনী কামিনী করো না দিদি। সে ত তোমার সেই রাঁচীর হোটেলওয়ালা চক্কোত্তীর কামিনী! তার কাহিনী ত তুমিই বলেছ আমাদের। তা'কে আর সাক্ষী করে' বাহবা নেবার দরকার নেই।

সুশীলা জিজ্ঞাসিল—বাহবা নেবার!

নয় ত কি দিদি!

ফেণিলা মুহূর্ত্তমাত্র মৌন থাকিয়া পুনশ্চ মৃদুকণ্ঠেই কহিল—নয় ত কি

দিদি! তোমার কামিনী, তুমি, এত যে হট্টগোল করছ, কি হ'য়েছে কি শুনি? এত যে গলাবাজী করছ, সাক্ষী সাবুদ ডাকছ, কি হ'য়েছে কি?

তা'হলে আমরা যা দেখেছি, তুমি বল্‌তে চাও সব মিথ্যে?

না তা আমি বল্‌তে চাই নে। আর তা বল্লে তোমাদেরই বা শ্রদ্ধা থাক্‌বে কেন দিদি। তোমরা ঠিকই দেখেছ। কিন্তু তা নিয়ে তোমার অমূল্য সময় নষ্ট করবার কোন দরকার নেই, মাথা ঘামিয়ে কোন ফলও নেই।

সুশীলা থতমত খাইয়া গেল। সে ত ঠিকই দেখিয়াছিল, এবং সে ঠিকই জানিত, ফেণিলার স্বীকার করিবার কিছুই নাই, কিন্তু সে যে তাহাকে একবারেই অগ্রাহ্য করিয়া দিয়া নিজের জিদ বজায় রাখিবে ইহাই ছিল, তাহার কল্পনার অতীত। তখন আর সে কোন কথাই কহিতে পারিল না, কেবলমাত্র ফেণিলার শেষের কয়টা কথা পুনরুচ্চারণ করিল—মাথা ঘামিয়ে আমাদের কোন ফলও নেই?

না, নেই। তোমারও না, তোমার কামিনীরও না।

সুশীলার মনে হইল, ফেণিলা তাহাকে কামিনীর সঙ্গে এক পংক্তিতে ফেলিয়া দিল। নিমন্ত্রণ বাড়ীর (পূর্ব্বেকার) শূদ্র ব্রাহ্মণ, ভদ্রেতর এবং গৃহে মনিব ভৃত্যের তারতম্যটুকু যাহারা কথায় বা কাজে বজায় রাখিতে পারে না, তাহাদের সঙ্গে তর্ক করিতেই সুশীলার প্রবৃত্তি হইতেছিল না কিন্তু এত বড় অপমানের বোঝা বহিয়া চলিয়া যাইতেও তাহার মনে যথেষ্ট দ্বিধা ছিল। সে মরিয়ার মত বলিয়া উঠিল—বেশ, আমরা না হয় তোমার চাকর বাকরেরই সামিল হ'লুম, বাবার কাছে বল্‌বে কি গুণনিধিটি কি অভিপ্রায়ে এসে, নির্জ্জনে, নিশীথে কুঞ্জমধ্যে⋯⋯

প্রীতির
নিদর্শন

ফেণিলা দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—থাক্ দিদি, যথেষ্ট হ'য়েচে। তোমার এ কবিত্বপূর্ণ বক্তৃতা এ-হেন বেনা-বনে অপব্যয় করো না। যদি দরকার হয়, আর বাবা জান্‌তে চান্, তাঁকে আমি অবশ্যই বল্‌বো, আর তুমিও যেথানে থাক—বাবাকে বলে দেব খবরটা পাঠিয়ে দিতে।—বলিয়া পাশের দরজাটা টানিয়া, ঝপাৎ শব্দে বন্ধ করিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

আরও অত্যাশ্চার্য্য ব্যাপার ঘটিল।

সেই 'রাত্রে হেরম্বনাথ আহারে বসিয়া পার্শ্বোপবিষ্ট সুনীলার পানে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন—মা, আমি দিনকতকের জন্য বাইরে যাচ্ছি।

সুনীলা জিজ্ঞাসিতেছিল কোথায় যাইবেন, কতদিন থাকিবেন—ইত্যাদি, বৃদ্ধ সে অবসরটুকুও না দিয়া কহিলেন—তুমি খুব সাবধানে থেকো মা। ঠিকানা রেখে যাব, বিশেষ দরকার বুঝলেই আমাকে খবর দিতে, চাই কি, তার করতেও বিলম্ব করো না। তোমারই 'পরে সব ভার রইল মা, খুব সাবধানে, যাতে সবদিক বজায় থাকে, তাই করে চলো মা। তুমি আমার সুশীলা মেয়ে, সব চেয়ে তোমার 'পরেই আমার অচলা বিশ্বাস।

সুনীলা ঘটনাস্থলে উপস্থিত না থাকিলেও সন্ধ্যার কুশ্রী কাণ্ডটা সবই জানিত। পিতার এই অকস্মাৎ বিদেশ গমনের যে সেই একমাত্র কারণ ইহাও সে অবগত ছিল,—কাজেই বাধা দিবার ইচ্ছা তাহার বিন্দুমাত্র জন্মিলই না। সে জিজ্ঞাসিল—কোথায় থাকবে, বাবা, কিছু ঠিক করেছ?

আমি লক্ষ্ণৌ-এ সুধীরের কাছেই থাক্‌বো। সুধীরের ঠিকানা ত তুমি জান, সু!

জানি বাবা। কবে……

কালই বারোটার এক্সপ্রেসে যাব, মা, একটু রাত জেগে তুমি আমার জিনিষপত্রগুলি গুছিয়ে গাছিয়ে দিয়ো। সকালে ত আর সময় হ'বে না, আমাকেও সকালে বাইরে যেতে হ'বে একটু।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কেহই আর কথা কহিল না। খাওয়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, সুনীলা বলিল—বাবা, ঐ কামিনীকে আমি রাখব না।

হেরম্বনাথ মুখ তুলিয়া সবিস্ময়ে কহিলেন—কেন সু?

সুনীলা ইতঃস্তত করিয়া আনতমুখে কহিল—না বাবা, ও-রকম নষ্ট চরিত্রের লোক কারুরই বাড়ীতে রাখা উচিৎ নয়।

হেরম্বনাথ একমুহূর্ত্ত পরে কহিলেন—তোমার দিদি ওকে রাঁচী থেকে এনেছেন-না?

হ্যাঁ। আমরা রাঁচীর ভাড়া দিয়ে দেব। ও যাক্ ফিরে। আমি ওকে কিছুতেই রাখতে পারব না।

আমি আর কি বল্‌ব সু? তুমি যা ভালো বুঝবে, তাই, করো মা।

একমিনিট থামিয়া পুনরায় কহিলেন—শুধু ঐ কামিনীকে রাখা-না-রাখার কথা নয় মা, সংসারের সকল ভালো-মন্দ, সব দায়ীত্বই যখন তোমার শিশুমস্তকে তুলে দিয়ে যাচ্ছি, তখন তোমার বুদ্ধি বিবেচনাতেই সকল কাজ তুমি করতে পারবে মা। তবে একটি কথা তোমাকে আমি বল্‌তে চাই সু, সে'টি হ'চ্ছে এই,—অল্পকারণে নিজেও ক্ষুব্ধ হ'য়ো না, না, অপরকেও ক্ষুণ্ন করো না। সংসারের এই একটিমাত্র সহজ পথ আছে, মানুষের সুখী হ'বার।

প্রীতির

নিদর্শন

সুনীলা একাগ্রচিত্তে পিতার কথাগুলি শুনিতেছিল। শুনিতে শুনিতে সে এতই তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিল যে, পিতা কখন্ হাতটি তুলিয়া, তাহারই মুখে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া, চুপ করিয়া বসিয়া গেছেন—সে জানিতেও পারে নাই। হেরম্বনাথ ডাকিতেই, তাহার যেন ঘুমটি ভাঙ্গিয়া গেল।

হেরম্বনাথ কহিলেন—তুমি যে ক্ষুব্ধ হও না, তোমার ব্যবহারেও কেউ ক্ষুণ্ণ হয় না—এই গোপন সন্তোষ কেবল তুমিই জানবে, সু, আর কেউ জানবে না। কিন্তু তা'তেও তোমার দুঃখ নেই মা। কারণ অন্ধকারেও যাঁর চোখে সব পড়ে, এ'ও তাঁর চোখে পড়ে' তুমি ধন্য হ'য়ে যাবে।—বলিয়া তিনি একমিনিট ধরিয়া স্থির দৃষ্টির দ্বারাই দুহিতাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আসন ছাড়িয়া উঠিলেন।

সুনীলা কিয়ৎকাল নীরবে সেখানেই বসিয়া রহিল। শেষে উঠিয়া নীচে নামিতে নামিতে হঠাৎ তাহার মনে হইল, আজ আবার খাওয়া দাওয়া লইয়া গণ্ডগোল ঘটিতে পারে। মনে পড়িতেই সে পিতার সন্নিকটে ফিরিয়া আসিতেছিল। আবার কি ভাবিয়া নামিয়া গেল। এবং নীচে আসিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার ভাবনা-চিন্তা সব বিদূরিত হইয়া গেল। সুশীলা আহার শেষ করিয়া একটি লবঙ্গ তুলিয়া মুখে দিতেছিল, তাহাকে দেখিয়াই কহিল, তোমরা খেয়ে নাও, সু।

ফেণিলাকে ডাকিবামাত্র সে'ও উঠিয়া আসিল। দু'জনে আহারে বসিয়াছে—নিকটে কেহই নাই, সুনীলা জিজ্ঞাসিল—নীলা, এসেছিলেন তিনি?

ফেণিলা মুখটি তুলিয়া বলিল—এসেছিলেন!

সুনীলা দুই মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া বলিল—কি বল্লেন ?

ফেণিলা কি ভাবিল, বলিল—দু'শ টাকার জন্যে এসেছিলেন।

টাকার জন্যে !!

হ্যাঁ।

অনেকক্ষণ দু'জনেই নীরব। শেষে সুনীলাই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া জিজ্ঞাসিল—তা ভেতরে না এসে……

ভেতরে আসতেন, কিন্তু বাইরে থেকেই সিংহ গর্জ্জন……

বাধা দিয়া সুনীলা কহিল—তিনি বাবার কাছে আসতেন, তাতে অন্য লোককে ভয় করার তাঁর দরকার ?

ফেণিলা বলিল—দরকার নেই ? কি বলছ তুমি! কাল যে অপমানটা করেছে তাঁকে, তিনি ওর সামনে আর আসতে পারেন ?

সুনীলা হঠাৎ কিছু বলিল না; প্রায় একমিনিট কাল সে চুড়ী কয়খানি নাড়াচাড়া করিয়া কহিল—কি জন্যে টাকার দরকার তা কিছু বলেছেন ?

না।

বাহিরে কাহার মৃদু পদশব্দ শুনিয়া উভয়েই দ্বারের পানে চাহিয়া রহিল। কামিনী উঁকি মারিয়া সরিয়া যাইতেছিল, সুনীলা তীক্ষ্ণস্বরে ডাকিল—কি কামিনী ?

না, কিছু না। তোমরা খাচ্ছ কি-না তাই দেখছিলুম দিদিমণি।—বলিয়া সে চলিয়া গেল।

সুনীলা রোষযুক্তস্বরে কহিল—যদি বা একটুও দয়া ছিল, তা আর রইল না। বিদেয় করে তবে আর কাজ !

ফেণিলা জিজ্ঞাসিল—ও-কে ?

হ্যাঁ। বাবাকে আমি আগেই বলে রেখেছি, নীলা, ওকে আমি রাখব না।

ফেণিলা বলিল—ওঁরা রাজী হয়েছেন ?

বাবা, আমার পরেই সমস্ত ভার দিয়েছেন। আর কারুকে রাজী করবার আমার দরকার নেই। জানিস্ নীলা, বাবা কালই লক্ষ্ণৌ যাচ্ছেন ?

বাবা !—লক্ষ্ণৌ ?

সুনীলা বলিল—হ্যাঁ। আমিও সম্মত হ'য়েছি।

আমরাও যাব ? না মেঝ্‌দি, এখন আমি······

বাবা একলা যাবেন, নীলা। আমরা থাক্‌ব।

ফেণিলা এক মুহূর্ত্ত পরে কহিল—হঠাৎ লক্ষ্ণৌ কেন মেঝ্ ?

সুনীলা বলিল—তা জানিনে, নীলা। সে কথা বাবা আমাকে কিছু বলেন নি।

ফেণিলা ব্যগ্রস্বরে কহিল—দিদি শুনেছেন ?

না। সকালে তাকে বলব 'খন। আমাকেই বলেছেন খেতে বসে।

শুনিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ফেণিলা কথা কহিল না; থালার 'পরে হাত রাখিয়া এবং সেই হাতটির 'পরেই চোখ দুটি স্থির করিয়া, বসিয়া রহিল। তাহার পর, ধীরে ধীরে মুখখানি তুলিতে তুলিতে কহিল—আমিই এর কারণ, মেঝ্ ?—তাহার স্বর কাঁদ কাঁদ।

সুনীলা সহজ স্বরেই কহিল—না, না তুই কেন কারণ হ'তে যাবি, নীলা! তুই না, তুই না!

প্রীতির

নিদর্শন

তবুও ফেণিলা শান্ত হইল না ; এবারে সে অশ্রুমুখী হইয়া বলিল—না মেঝ., তুমি আমাকে মিথ্যা সান্ত্বনা দিচ্ছ ! আমি বুঝ্‌তে পারছি —আমিই একমাত্র এর কারণ।

কেন—তুই ও কথা ভাবছিস্ নীলা ? বাবা কি সেই লোক আমাদের !

তুমি সত্যি বল্‌ছ মেঝ্‌ ?—বলিতে বলিতে সে দক্ষিণ হস্তদ্বারাই সুনীলার হাতটি চাপিয়া ধরিয়া, বাষ্পপূর্ণস্বরে কহিল—বল, মেঝ্‌, সত্যি করে বল ভাই।

সত্যিই বল্‌ছি নীলা।

কিন্তু আমাকে বললেন না কেন ?

কাল সকালেই বলবেন—নিশ্চয়। আজ যখন স্থির হ'য়েচে, তার পর তোর সঙ্গে তাঁর দেখা হ'ল কখন, তাই শুনি, যে বল্‌বেন !

ফেণিলা চুপ করিল। গভীর রাত্রে সে এই কথা কয়টি ভাবিয়াই জাগিয়া উঠিয়াছিল ; বিছানায় সুনীলাকে না পাইয়া আতঙ্কে সে শিহরিয়া, ক্ষিপ্রহস্তে সুইচটি নামাইয়া আলো জ্বালিয়া ফেলিল। সুনীলা ঘরে ছিল না। বিছানার যে অর্দ্ধাংশ স্থানটুকু সুনীলার জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল তাহা অস্পৃষ্টই বোধ হইল। ফেণিলা দু'মিনিট বিছানার কাছে দাঁড়াইয়া তাহাই লক্ষ্য করিতেছিল। হ্যাঁ, অস্পৃষ্টই বটে ! কোথাও এতটুকু ভাঁজ নাই, যেমন শুভ্র উপাধানটি—নিটোল, তেমনি রহিয়াছে।

তবে সে নিশ্চয়ই বাবার ঘরে আছে। কোন সন্দেহ নাই। আমিও যাই। যাইব ? বাবা—না, না মেঝ্‌ যে বলিয়াছে,—নিশ্চিন্ত।—সে অতি মৃদুগতিতে ঘর ছাড়িয়া বারান্দায় আসিয়া পড়িল। বারান্দার পাশেই

পড়িবার ঘরটি, তাহার পরের বৃহৎ কক্ষ পিতার শয়ন-মন্দির। সে পা বাড়াইয়াছে,—ও-কি পড়িবার ঘরে আলো জ্বলে কেন? জ্বলিতেছেই ত! কোণের আলোটাই জ্বলিতেছে। ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, সুনীলা নিবিষ্টচিত্তে কি একটা লিখিতেছে। তাহাকে বিশেষরূপ চমকিত করিয়া দিবার উদ্দেশ্যেই সে চরণের মৃদুগতি মৃদুতম ও নিঃশব্দ করিয়া লইয়া—আস্তে আস্তে চেয়ারের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল।

একখানা চিঠি লেখা হইয়া গেছে, সেখানা পাশেই পড়িয়া রহিয়াছে; সুনীলা একখানি চেক লিখিতেছিল।

চেক্‌টি কাটিয়া, পত্রের পিছনে গাঁথিয়া খামে মুড়িবে, ফেণিলা বলিয়া উঠিল, কাকে দিয়ে পাঠাবে মেঝ্?

সুনীলা পাংশুবিবর্ণ হইয়া, একবার মাত্র ছোট বোন্‌টির পানে চাহিয়া, আবার বসিয়া পড়িল। তখনই কণ্ঠে বল সংগ্রহ করিয়া কহিল—একটা চাকর বাকর কাউকে দিয়ে পাঠাতে হ'বে।

ফেণিলা বলিল—আমারও ত এলাহাবাদ ব্যাঙ্কেই টাকা রয়েছে, আমিও দেব একখানা?

সুনীলা বলিল—কেন তাঁর ত দু'শ টাকারই মোটে দরকার ছিল।

দু'শই ত চেয়েছিলেন। দরকার যে কত, তা ত আমরা জানি নে। তবে তোমার আমার দু'জনের এই যে ব্যাঙ্কের টাকা—এ ত তাঁর হাত দিয়েই পাওয়া! কাজেই তাঁর দরকারের সময় দিলুমই বা কিছু বেশী!

বোধ করি এইতেই তাঁর দরকার মিট্‌বে। আর এ'টা আমি ধার দিচ্ছি, নীলা, একেবারে নয়!

ফেণিলা অতিশয় বিস্ময় দমন করিতে না পারিয়া কহিল —ধার দিচ্ছ !

এই দেখ্ না—বলিয়া পত্রখানার একাংশে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া ফেণিলার সামনে ধরিল ।

সে পাঠ করিল ঃ—

আপনার, এই ঋণটি পরিশোধ করিবার কোন নির্দ্দিষ্ট সময় রহিল না । আপনার সুবিধামত……

ফেণিলা চক্ষু তুলিয়া লইয়া কহিল—তবু ভালো যে, এতখানি বদান্যতা দেখাতে পেরেছ !

সুনীলা বলিল—বদান্যতার কথা নয়, নীলা । আমি যদি এমনি একটা সর্ত্ত না করতুম, তুই কি ভাবছিস্, এ টাকা তিনি স্পর্শও করতেন ! কারো কাছে আর্থিক হিসাবে, উপকৃত হ'তে কিছুতেই তিনি রাজী হ'তেন না,—তাতে তাঁর মর্য্যাদার হানি হ'ত ।

একথার বিরুদ্ধে ফেণিলা আর কিছুই বলিল না । খগেনকে সে'ও জানে । সে এই পরিবারের কাছে অশেষ রকমে ঋণী, সে ত নিজের মুখেই তাহা স্বীকার করে—কিন্তু এখন সে উপার্জ্জন করিতে শিখিয়াছে, এখন কোন মতেই সে কাহারো দান গ্রহণ করিবে না । এই কথা কয়টি ভাবিতে ভাবিতে আর একটা ভাবনা একটুখানি মেঘের মত তাহার সুনির্ম্মল চিত্তাকাশে ভাসিয়া উঠিল, সে তৎপ্রতি লক্ষ্য না করিয়াই কহিল—তা ঠিক !

সুনীলা বলিল—নেহাৎ দরকার না হ'লে, তিনি কখনই আসতেন না, নীলা । তাই আমি মনে করছি, কাল খুব সকালেই এ'টা পাঠিয়ে দেব । বাস্তবিক টাকার অভাবে যদি কোন বিপদেই……

প্রীতির

নিদর্শন

এতক্ষণে মেঘটা বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল এবং সুনীলার কথার মাঝখানেই কাবলীওয়ালা-সংক্রান্ত কথাগুলি তাহার মনে পড়িতেই, সে চাপিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল—খগেন বাবু যে জলের জুয়ায় সর্ব্বস্ব হেরেছেন, তার আর সন্দেহ নেই, কি বল?

সুনীলা বলিল—ঘরে চল্ নীলা।

আমি যে যাচ্ছিলুম, বাবার সঙ্গে কথা কইতে।

এখন আর তাঁকে জাগাস্ নে, ভাই। চ' আমরাও শুইগে, কত বাজল?

তিনটে।

চ,' চ'—আর একটি মিনিটও নয়।—সুনীলা চিঠিখানি হাতে করিয়া অন্য হাতে ফেণিলার বাহু ধরিয়া ঘরে আসিয়া কহিল—শুয়ে পড়। বরঞ্চ মুখ, হাত, পা-গুলো ধুয়ে নে।

চিঠিখানা আর্শীর উপরে রাখিয়া যখন বাতিটা নিবাইয়া দিয়া তরুণী দুইটি শয্যাশ্রয় লইল, তখন ও-ঘরের ঘড়িটা ঢং করিয়া বাজিয়া উঠিল। সুনীলা পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়িল, কিন্তু ফেণিলা অন্ধকারে চোখ মেলিয়া কি যে দেখিতে ও ভাবিতে লাগিল তাহার কোন ঠিকানা সে-ই করিতে পারিল না।

গোটাকতক (বোধ হয়) থিয়েটার-ফেরৎ ছোকরা খুব উচ্চকণ্ঠে কোন এক নাটকের বীররসাত্মক একটি দৃশ্যের মহলা দিয়া, পাড়াটি সচকিত করিয়া চলিয়া গেল; ময়লাগাড়ী ঝন্ ঝন্ শব্দে একদিক হইতে অন্যদিকে দল বাঁধিয়া চলিয়া গেল এবং দেখিতে দেখিতে রহমন মিঞার খোলার ঘরে জালার মধ্যে জাগিয়া মোরগকুল প্রাতঃসঙ্গীতে কোথাকার

একদল কাককে ডাকিয়া আনিয়া পাড়ার মধ্যে ছাড়িয়া দিতেই, তাহাদের হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকিতে দিনমণিও জানালার ফাঁকে ফাঁকে নীলার চোখের পাতায় ফুটিয়া উঠিলেন। নীলা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। পাশেই একগাছা বেলফুলের গোড়ের মত শুভ্র বেশে সুনীলা বিছানায় পড়িয়া অকাতরে ঘুমাইতেছিল, নীলা বার বার তাহারই অনাবৃত সুন্দর গৌরতনুর পানে চাহিয়া, আর একবার শুইবে কি-না তাহাই ভাবিতেছিল, হঠাৎ আর্শির 'পরে চিঠিটায় নজর পড়ায়' সে আস্তে আস্তে খাট হইতে নামিয়া, দ্বার খুলিয়া, গোবিন্দকে ডাকিয়া, মুখে মুখে ঠিকানাটা কহিয়া ফিরিয়া আসিল। তখনও সুনীলা গাঢ় নিদ্রামগ্ন। ফেণিলার ইচ্ছা হইতেছিল, ঠেলিয়া ঠুলিয়া, জড়াইয়া, ডাকিয়া, তাহাকে তুলিয়া দেয়। সেই উদ্দেশ্যেই সে খাটের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু নিদ্রিতা যুবতীর মুখের অসামান্য তৃপ্তিটুকু, তাহার অচেতন দেহের স্বল্প স্পন্দনটুকু, সর্ব্বোপরি, সর্ব্বাঙ্গে বিরাজিত অসীম শান্তির সুকোমল সৌন্দর্য্যটুকু তাহাকে এতই বিমোহিত করিয়া ফেলিল যে, তাহাকে স্পর্শ করিতেও তাহার সাহস হইল না। কয়েক মুহূর্ত্ত ধরিয়া নিশ্চল পাষাণ মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া, আস্তে আস্তে পাখাটি ঈষৎ বেগে চালাইয়া, ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

প্রাতঃস্নান সারিয়া সে যখন কাশ্মিরী বারান্দায় পিতার সামনে একখানা চেয়ারে বসিয়া চা ও জলখাবারের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, ঠিক সেই সময়েই গোবিন্দ আসিয়া হেরম্বনাথের সম্মুখে দাঁড়াইতেই, তিনি জিজ্ঞাসিলেন—খগেন বাবু বাড়ীতে ছিলেন, গোবিন্দ?

বাবু ছিলেন, তাঁহার হাতেই দিয়া আসিয়াছে—বলিয়া গোবিন্দ চলিয়া

প্রীতির

নিদর্শন

যাইতেই, ফেণিলা অকস্মাৎ স্বেদসিক্ত হইয়া উঠিল। টেবিলের "পত্রিকা" খানা তুলিয়া, 'সম্পাদকীয়' পাতাটি চোখের সামনে খুলিয়া কোনমতে কপালের স্বেদ-বিন্দুগুলিই গোপন করিতে পারিল। কিন্তু শুধু ত তাই নয়, তাহার হাত দু'টি এমনই ঘন ঘন কাঁপিতে লাগিল যে, 'সম্পাদকীয়' পাতাটি ছাড়া অন্য কাগজগুলি ঝড়্ ঝড়্ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। হেরম্বনাথ হাত বাড়াইয়া সেগুলি তুলিয়া, পাঠোদ্যোগ করিতেই 'মেঝ্ কৈ'—বলিয়া ফেণিলা একেবারে পড়িবার ঘরের ভিতর দিয়াই শয়ন কক্ষে উপস্থিত হইল।

সুনীলাও স্নান করিয়া, ঘরেরই আসবাবপত্র নাড়ানাড়ি করিতেছিল, তাহাকে দেখিয়াই মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসিল—নীলা, চিঠিখানা কোথায় রেখে-ছিলুম দেখেছিলি?

ফেণিলা মৃদুকণ্ঠে কহিল—চিঠি পৌঁছে গেচে মেঝ্-দি, কিন্তু······

সুনীলা সবিস্ময়ে কহিল—তিনি নাই বাসায়?

তা নয়। চা কৈ – ক'টা বেজেছে—বাবা যে বসে।

সব তৈরী। পাঁচ মিনিট, তার পর 'হাজরী' একদম টেবিল পর।— সে একটুখানি হাসিয়া বাহির হইয়া গেল। কিন্তু পাঁচ, সাত, দশ মিনিট কাটিয়া গেল, ফেণিলা টেবিল'পর হাজির হইতে পারিল না। গোবিন্দ পিতাকে খবর দিয়া কোথায়-যে চলিয়া গেছে, ফেণিলা কোথাও তাহাকে খুঁজিয়া পাইল না।

ওদিকে সুনীলার ডাকাডাকিতে সে যখন পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া বসিল, তখন কাহারো মুখের পানে সে আর চোখ তুলিয়া চাহিতে পারিল না। সুশীলা একেবারে সামনের ছাদ দিয়া হারুদের বাড়ীর

পানে চাহিয়া চা পান করিতেছিল, পিতা অত্যন্ত গম্ভীর, কেবল-মাত্র সুনীলার মুখখানিই সূর্য্যোদয়ে সূর্য্যমুখীর মত হাস্য-প্রফুল্ল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

ফেণিলা প্রথমটা থতমত খাইয়া গিয়াছিল, তাহার পরই, সে ভাব দমন করিয়া, সুনীলাকে কহিল—চিনি বড় কম হ'য়েছে মেঝ্!

সুনীলা বলিল—কম হ'য়েছে! কেন, তোর বরাদ্দ যা, সেই তিন চামচই ত দিয়েছি।—বলিয়া সে আর দেড় চামচ চিনি পেয়ালার মধ্যে ফেলিয়া, চামচখানি তন্মধ্যে নিক্ষিপ্ত করিল।

বেশী চিনি-খাওয়াটা খারাপ নীলা,—বলিয়া সুশীলা, অকস্মাৎ মেঘমুক্ত শশধরের মত ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। সুনীলা-ও হাসিল।

একটু পরে, সুশীলা কাপড়ের মধ্য হইতে খামে ভরা একখানা চিঠি পিতার সম্মুখে ধরিল। হেরম্বনাথ পত্রটি খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন—এবং অকারণে ফেণিলা আবার ঘামিতে আরম্ভ করিল। হেরম্বনাথ পাঠ শেষে, পত্রটি টেবিলের উপর রাখিয়া কহিলেন—তা হ'লে তুমিও থাক্‌চ, সুশীলা, ভালোই হ'ল। আমি মনে কচ্চি দিনকতক লক্ষ্ণৌ ঘুরে আসি। আজই যাব।

সুশীলা বলিল—আজ-ই?

হ্যাঁ।—আর কিছুই বলিলেন না। দু' তিন মিনিট পরে সুশীলাকে সম্বোধন করিয়া পুনশ্চ কহিলেন—খুব সাবধানে থেকো সুশীলা; আর সদাসর্ব্বদা আমাকে সংবাদ দিও।……এ চিঠিটা কি ডাকে দেবে?

না, বাবা, রব্বানিকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেই ভালো হয়। সু, ওকে তুমি ছাড়তে পারবে, ঘণ্টা দুই?

কোথায় যাবে?

দেখ-ন।—বলিয়া সুশীলা পত্রখানি তাহার হাতে দিতেই, সে অনুচ্চ মৃদুকণ্ঠে পড়িল:—

মান্যবরেষু,

নানা কারণ বশতঃ রাঁচি অনাথ বালিকা বিদ্যালয়ের ভার বহন করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। এখন হইতে বিদ্যালয় যতদিন না খোলে, চেষ্টা করিলে, উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী মিলিবেই। আমাকে আপনি মার্জ্জনা করিবেন এবং এই পত্রে আপনার সাদর ও সস্নেহ ব্যবহারের জন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করিয়া আমাকে বাধিত করিবেন। ইতি ২৭শে আগষ্ট, শনিবার।

বশম্বদ—

শ্রীসুশীলা মিত্র

ফেণিলা সাশ্চর্য্যে বলিল - ছেড়ে দিলে?

হ্যাঁ!

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

অভাগা।

খগেন সত্য সত্যই কিঞ্চিৎ বিপদে পড়িয়াছিল। যেদিন জলের জুয়ায় সর্ব্বস্ব হারিয়া, সে অধিক রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া আসে, তাহার পরদিন প্রাতেই তাহার খুড়ীমার তার আসিয়া হাজির,—নিভার বিবাহ স্থির, ত্বরায় আসিবা।—পিওনকে সহি দিয়া, তারখানি পাঠ করিয়া সে মাটিতে বসিয়া পড়িল। পূর্ব্ব রাত্রে ঠিক এই কথাগুলি কল্পনা করিয়াই বারবার সে শিহরিয়া উঠিতেছিল। আজই সকালে যে এমন করিয়া তাহার অদৃষ্টদেবতা তাহাকে ব্যঙ্গ করিতে আসিবেন, ভয় করিলেও, একেবারেই সে আশা করে নাই। তখন সে অনন্যোপায় হইয়া সন্ধ্যার ট্রেনেই দিনাজপুরে গিয়া, পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে পাত্রের পিতা রাধামোহন নন্দী মহাশয়ের হাতে পায়ে ধরিয়া শ্রাবণ মাসের শেষ সপ্তাহে দিন স্থির রাখিতে বলিয়া আসে। চারিদিন পরে সে যখন কলিকাতায় ফিরিয়াছিল, হেরম্বনাথের গৃহে আমরা তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম। তাহার পরের বৃত্তান্তটা পাঠকের জানা নাই, তাহা এইরূপ।

রাধামোহন তাহাকে প্রায় একমাস সময় দিয়াছিলেন এবং অনেক কাঁদাকাটা করায় তিনশত টাকাও মকুব করিয়াছিলেন। স্থির ছিল, নগদে ও দানসামগ্রীতে সর্ব্বসমেত বারোশত টাকা দিতে হইবে। খগেন

জানিত, ইহা ছাড়া অন্যান্য ব্যয়ও আছে। তাহার হাতে অন্ততঃ আরো শ পাঁচেক থাকা চাই। হাজার টাকার সংস্থান সে করিয়া ফেলিয়াছে, পৈতৃক গৃহখানি মায় বাগান-পুষ্করিণী দিনাজপুরের শ্রীযুক্ত হরিচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বন্ধক রাখিতে সম্মত আছেন। বাকী এখনও সাতশত রজতমুদ্রা।

খগেন কলকাতায় আসিয়া স্থির করিল, এই টাকাটা সে অক্লেশে রেশ হইতে তুলিতে পারিবে। যদি ঈশ্বর প্রেরিত সেই বন্ধুটির সাক্ষাৎ লাভ হয়, তবে একদিনেই উঠিয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু তখনই তাহার মনে পড়িল আর সে সেকেণ্ড এন্‌ক্লোজারে ঢুকিতে পারিবে না। সেখানের প্রবেশ মূল্য দু'টাকা বলিয়া নয়, সেখানে প্রত্যেক বাজীতে পাঁচটাকা ধরিতে হয় বলিয়াও নয়—সেখানে ঘনশ্যাম আছেন, সুশীলা আছেন। সুনীলা ফেণিলা - হয় ত, ইহারাও আছে। শেষের নাম দু'টি সে মুখে উচ্চারণ করিতে পারিল না। হয় ত ইহারা নাই। নাই থাকুক, ঘনশ্যাম ত আছেন-ই! না, সেকেণ্ডে যাইবার পথটি বন্ধ, গ্র্যাণ্ডের পথ ত চিরদিনই ধুতি-পরা, অল্প মূলধনের বাঙ্গালীর সামনে পাথর দিয়াই আঁটা। বাকী রহিল, থার্ড! সেখানে ঢুকিতে খরচ— একটি টাকা মাত্র, বাজী ধরাও তিনটাকায় হয়। খগেন ইহাই সমীচান বোধ করিল। কিন্তু বীরদত্তের সন্ধান মিলিবে না ত! না মিলুক, বীরদৎ যে অশ্বে আরোহণ করিবে তাহাকে সে ব্যাক্ ত করিবেই উপরন্তু এখন হইতে সে নিজে বেশ মাথা ঠাণ্ডা করিয়া টিপ্ কসিয়া বাহির করিবে। কেন পারিবে না? এত লোকে করিতেছে না! পোর্ট-কমিশনারস্ আফিসের তাহার সেই বন্ধুটি কি করে? দুলাল ত নিজেই

টিপ্ কসে, নিজেই সব করে, তার ত বেশ মোটা জিৎই রহিয়াছে। সে'ও তাহাই করিবে। দুলালও একটাকার এন্‌ক্লোজোরে যায়, সে'ও যাইবে।

এই সমস্ত জল্পনা কল্পনা করিয়া, শনিবারে আফিসের একাউন্টেন্ট গিরিবাবুর নিকট নগদ পঞ্চাশটি মুদ্রা কর্জ্জ লইয়া, দেড়টার সময় এস্‌প্ল্যানাডের মোড়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। ট্রামে অসাধারণ জনতা,—দু'তিনখানা ট্রাম ছাড়িয়া, একখানায় সে উঠিয়া বসিল। এবং রেশ্ এন্‌ক্লোজারে পা দিবার পূর্ব্বমুহূর্ত্তে দুই কর জোড় করিয়া বার বার অনেক দেবতার চরণ স্মরণ করিয়া লইল।

কিন্তু অহো দুর্দ্দৈব! নিজের কাছে ছিল, ২৫, গিরিবাবুর কাছ হইতে ৫০—এই পঁচাত্তর টাকা চারের বাজীতেই শেষ হইয়া গেল। দুলাল পরামর্শ দিল, কাব্‌লীওয়ালারা টাকা ধার দিয়া থাকে। খগেন ভাবিল, তাইত, এখনও তিনটে রেশ্ বাকী, সে চুপ করিয়া থাকিবে? শেষের তিনটার মধ্যে তাহার যদি একটি অপ-সেট্ও মিলিয়া যায় দুলালের কথিত মত সে ত লাল হইয়া যাইবে। কিন্তু কাব্‌লীওয়ালা! তাহার মন সন্দেহদোলায় দুলিতে লাগিল। অবশেষে লোভই জয়লাভ করিল। তাহাদের মেসের ঠিক পাশেই একটা খোলার ঘরে কতকগুলি নর-নারীর উপর কাবুলীয়াওলার অত্যাচার সে অনেকবার দেখিয়াছে। প্রথম প্রথম যখন সে মোটা লাঠি হাতে, এক গাল দাড়ি সমেত দীর্ঘকায় কাবুলীদের দেখিত, তাহার মনে রবীবাবুর কাবুলীওয়ালাই একমাত্র জাগিয়াছিল। কিন্তু সেই খোলার ঘরের অধিবাসীদের প্রতি যখন তাহাদের অমানুষিক, নিষ্করুণ অত্যাচার দেখে, তখন

কাব্যের গন্ধ একদম তিরোহিত হইয়া, তাহার মনে আগুন জ্বলিয়া উঠে। একদিন তাহারা তেতালার ছাদ হইতে একখানা ১১ ইঞ্চি ফেলিয়া একটি "কাবুলীওয়ালা"র পিঠের শিরদাঁড়া ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। সে যাক্—খগেন দেখিল, সে-সবের কোনই সম্ভাবনা নাই। খেলায় যেমন টাকাটা উঠিবে, আগে সে সেই হতভাগাদের টাকাটা ফেলিয়া দিবে, তার পর অন্য কথা।

কাবুলীওয়ালা কিছুমাত্র দ্বিধা করিল না। একখানা খাতায় কেবলমাত্র একটি সহি করাইয়া দুইশত মুদ্রা দান করিল। খগেন বোর্ড খুঁজিয়া অপ-সেট্ দেখিয়া, কয়েকটা ঘোড়াকে বেশ মোটা মোটা বাজী ধরিয়া দিল। কিন্তু হায়! অভাগ্যের ভাগ্য অপ্রসন্নই রহিয়া গেল। একটা সেকেণ্ডক্লাস্ অশ্ব, পাঁচটি থার্ড ও ফোর্থ ক্লাস, অশ্বের সহিত দৌড়িতেছিল, খগেন খুঁজিয়া পাতিয়া তাহাকেই ব্যাক্ করিয়াছিল, এবং শেষ অবধি দৌড়িলে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর বাতগ্রস্থ পক্ষীরাজদের হারাইয়া, সকলের আগেই সে আসিতে পারিত, কিন্তু মধ্য পথেই জকি-কে উল্টাইয়া দিয়া, আপন মনেই সে অন্যদিকে ছুটিতে আরম্ভ করিয়া দিল। এই আসিলে-আসিতে-পারিত অশ্বটিতেই সে তাহার শেষ কপর্দ্দকটি পর্য্যন্ত 'রিস্ক' করিয়াছিল। হয় ত বেচারার জানা ছিল না, জীবন্ত অশ্ব ত দূরের কথা, মানুষের দুঃসময়ে পোড়া সোল মাছও জলে পলায়ণ করিয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দর্শাইয়া থাকে।

মাঠ ভাঙ্গিয়া হুড় হুড় শব্দে লোক যখন বাহির হইতেছে, চেষ্টা করিলে বা ইচ্ছা থাকিলে খগেন অনায়াসেই ভিড়ের মধ্যে 'নিশ্চেষ্ট' থাকিয়া বাহির হইয়া যাইতে পারিত কিন্তু সে নিরুদ্বেগে, একটি ধারে

চুপটি করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ভিড় শেষে সে কাবুলীদের হাতে আত্মসমর্পণ করিল।

কাবুলীরা জিদ্ করিতে লাগিল, খগেন তাহার বাসস্থানটি দেখাইয়া দিক্ আর একখানা ষ্ট্যাম্পের উপর সহি করিয়া দিলেই তাহারা নিশ্চিন্ত মনে চলিয়া যাইবে। কিন্তু খগেন কোনমতেই বাসস্থান দেখাইতে চাহিল না; সহি সে হাজার বার করিয়া দিতে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু কোনমতেই ইহাদের বাসায় লইয়া যাইতে রাজী হইল না। ইহা লইয়া রাস্তায় তাহাদের সঙ্গে যে তর্ক, কথাকাটাকাটি হইল, তাহাকে শুদ্ধ ভাষায় 'হাঙ্গামা' বলাও চলিতে পারে।

জোড়াসাঁকোয় তাহার এক ধনী সহধ্যায়ীর বাস ছিল। বহুদিন দেখা সাক্ষাৎ না থাকিলেও পূর্ব্বদিনের বন্ধুত্বের মহিমোজ্জ্বল চিত্রটি খগেনের চিত্তে জাগরুক ছিল। খগেন মোড়ের মাথায় কাবুলী দু'টাকে বসাইয়া রাখিয়া, ফটক পার হইয়া বন্ধুর গৃহে প্রবেশ করিয়া, শুনিল—প্রশান্ত গৃহে নাই, মোটরে চড়িয়া কাশীপুরে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গেছে,—কখন ফিরিবে তাহারও স্থিরতা নাই। খগেন পথে পড়িয়া ভাবিল, এখন উপায় কি? এত বড় সহরে, যেখানে লক্ষ লক্ষ দীপ জ্বলিতেছে, হাজার হাজার লোকের বাড়ী গাড়ী দেখা যাইতেছে, কে এমন বন্ধু তাহার আছে, যাহার কাছে সে হাত পাতিতে পারে! বন্ধু তাহার অনেক আছে কিন্তু বিপদের সময় সাহায্য করিবে এমন বন্ধু কে আছে?

হাঁ, একজন আছে। সেই পারে, করিবেও, কিন্তু—সে, সে যে রমণী, কেমন করিয়া তাহার আবেদন সেখানে পৌঁছিবে! হাঁ সুনীলা

আছে। যদি কোনরকমে একবার তাহার গোচর করিতে পারে, নিশ্চয় সে বিপন্মুক্ত হইবে। খগেন কাব্‌লী দু'টাকে সঙ্গে লইয়া সোজা হেরম্বনাথের গৃহের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। রামটহল তাহাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া উঠিয়া, সেলাম করিতেই খগেন জিজ্ঞাসিল —বাবু?

উপরমে হ্যায়, হুজুর। উ সিঙ্গী সাহাব ভি হ্যায়।—শুনিয়া আর খগেনের পা উঠিল না। আবি আতা—বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল। রামটহল পুনরায় হিন্দী বাংলা মিশাইয়া গান গাহিতে গাহিতে দ্বিগুণ বলে আটা পিষিতে মন দিল।

বাড়ীতে ঢুকিতে পা উঠিল না বটে, ফিরিতেও তাহার পা চলিল না। আর সে কোথায় যাইবে? এই বিস্তীর্ণ জনসমুদ্রে আপনার বলিতে তাহার আর যে কেহ নাই!

কাবলীওয়ালাদ্বয় দু'তিন ঘণ্টা অনর্থক ঘুরিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। আর কোনরূপেই ধৈর্য্য ধরিতে পারিতেছিল না। মোড়ের মাথাতেই খুব ক'টা কড়া কড়া কথা শুনাইয়া, মেজাজটা বেশ রুক্ষ করিয়া, কহিয়া দিল—কুঠী দেখলাও, নেহি ত লাঠ্যিসে শির তোড় দেঙ্গে।

খগেন কুঠীও বুঝিল, শির ভাঙিয়া দিবার কথাটাও বুঝিল, তাহাতে সে এমন দুঃখের সময়েও হাসিটা চাপিতে পারিল না। এই দু'টা কাবলীওয়ালাকে সে একাই একদম ঠাণ্ডা করিতে পারে, তাহাদের শির তাহাদেরই লাঠির আঘাতে ভূতলে বিলুণ্ঠিত করিবার মত ক্ষমতা খগেনের শরীরে ছিল, তাই সে শির বিনাশের সম্ভাবনাতে ভয় না পাইয়া,

একটু হাসিল মাত্র। কাবলীওয়ালা হাসি দেখিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া "হিং টিং ছট্" করিয়া কি যে কতকগুলা বলিয়া গেল, খগেন তাহার একটুও বুঝিল না। তবে যেটা নাকি সব চেয়ে সহজ, সব চেয়ে সুস্পষ্ট, সেটা তাহার অজ্ঞাত রহিল না। আফগানসন্তানগণ যে প্রীত হইয়া তাহাকে ব্রাহ্মণ ভোজনের নিমন্ত্রণ করিল না, এটা সে ঠিকই বুঝিতে পারিয়াছিল। তাহাদের স্বর ক্রমশঃই ধাপে ধাপে চড়িতেছে, পথচারী লোকও মাঝে মাঝে কুতুহলী হইয়া দেখিয়া দেখিয়া যাইতেছে, খগেন মৃদুস্বরে কহিল—দাঁড়াও সাহেব, শেষ চেষ্টা করে দেখি।

হেরম্বনাথের গৃহটি দুইটি বড় বড় রাস্তার ঠিক সংযোগস্থলে। সামনের দিকটা দিয়া একটা রাস্তা ট্রাম-রাস্তায় গিয়া মিশিয়াছে, আর একটা বাড়ীর পিছন দিক দিয়া কোথায় চলিয়া গেছে। খগেন এই পিছনের দিকটায় আসিয়া দেখিল, রান্নাঘরে বৈদ্যুতী বাতি জ্বলিতেছে, এবং অন্যদিকে মুখ করিয়া কে একজন বসিয়া আছে। সে যেই হোক, তরুণী, এবং সেই তরুণী সুশীলা নহে, ইহা সুনিশ্চিত। যেহেতু তাহার জানা ছিল, সুশীলার শরীর তেমন সুস্থ নহে, পাকশালায় তিনি কদাচিৎ প্রবেশ করেন। সাহসে ভর করিয়া, জানেলায় মুখ বাড়াইয়া দেখিল—ফেণিলা!

খগেন ডাকিল—ফেণিলা!

ফেণিলা চমকিয়া উঠিয়া কহিল, ভেতরে আসুন, খগেন বাবু, ওখানে কেন? আসুন…

খগেন হস্তেঙ্গিতে তাহাকে ডাকিয়া মৃদুস্বরে কহিল, আমি বড় বিপদে পড়েছি, নীলা!

ফেণিলা বলিল—ভেতরে আসুন আগে! তার পর কথা!

খগেন হতাশে ভরিয়া গিয়া বলিল—তাহ'লে শুন্‌বে না!

ফেণিলা তথাপি জোর করিয়া বলিল—ভেতরে আস্‌তে আপনার আপত্তি কিসের শুনি?

খগেনের মনে হইল, কে একটা লোক যেন তাহার অত্যন্ত কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। পিছনে ফিরিয়া দেখিল, মানুষ নহে, রোমন্থনরত একটি পুষ্টকায় গাভী ঠিক তাহার পিছনটিতে দাঁড়াইয়া আছে। এদিকে ফিরিয়া বলিল—চল্লুম নীলা! অভাগার প্রতি তুমিও বিরূপ?

সে নামিয়া পড়িয়াছিল, নীলা খপ্‌ করিয়া তাহার হাতটি চাপিয়া বলিল—বলুন।

আমার বড় বিপদ, নীলা। ছ'শো'টি টাকা যদি দিতে পার।

ছ'শো?

হ্যাঁ। পারবে?

কি দরকার—তা ত বল্লেন না এখনও।

খগেন কাতরস্বরে কহিল—আর একদিন বল্‌ব, নীলা।

তখনও খগেনের হাতের পরেই ফেণিলার হাতটি ছিল। সেটিতে একটু চাপ দিয়া কহিল—আজই বলুন, শুনি?

খগেনের অভিমান হইল। হারে জগৎ! স্নেহের এই বিনিময়! ভালোবাসার এই প্রতিদান। কারণই তাহাদের কাছে সর্ব্বপ্রথম, কাজটা কিছুই নয়! খগেন অভিমানক্ষুব্ধস্বরে কহিল—বিশ্বাস কর, নীলা। বলিতে বলিতে, তাহার কণ্ঠে যেন খানিকটা অশ্রু জমিয়া উঠিয়াছিল,

স্বর ভারী হইয়া গেল। সে বলিল—নীলা, তুমি আমাকে অবিশ্বাস করছ! তুমি...

নীলা!!!

মুখের কথাটা আর শেষ হইতে পারিল না। খগেন খচ্ করিয়া, হাতটা ছাড়াইয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুট্ দিল। অদূরে একটা গাছের তলায় ফুটপাতে বসিয়া দুইটা হিন্দুস্থানী গুণ্ডা টিপিতে টিপিতে মুল্লুকের খবরদারী করিতেছিল, অকস্মাৎ একটা লোককে ছুটিতে দেখিয়া, চোর ভাগতা, চোর ভাগতা রবে চীৎকার করিয়া উঠিল এবং কোথায় ছিল পাড়ার নিষ্কর্ম্মার দল, কোথা হইতে বাহির হইয়া পণ্ পণ্ শব্দে খগেনের পিছু লইল।

প্রাণের দায়ে, অথবা মানের দায়ে, ঠিক বলা যায় না, খগেন ছুটিতে ছুটিতে একটা অন্ধকার গলির মধ্যে ঢুকিয়া ঘণ্টাখানেক চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া, যখন কোথাও কোন সাড়াশব্দ পাইল না, বাহির হইয়া আবার সেই পথেই ফিরিয়া আসিল। কিন্তু কাবলীওয়ালার সন্ধান পাইল না। তাহারা যে তাহাকে পলাতক ভাবিয়াই টাকার আশায় জলাঞ্জলি দিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছে, ইহা জানিয়াই খগেনের মৃত্যুবাঞ্ছা জন্মিতে লাগিল। কিন্তু কি আর করিবে। অনেক রাত্রে, সে যখন বাসায় ফিরিয়া আসিল, হরিচরণ বাবু তাহাকে নিজের ঘরের মধ্যে বসাইয়া কহিলেন—ওহে খগেন বাবু! তোমাকে একটা কথা বল্‌ব, কিছু মনে করো না কিন্তু। অনেক দিন এক বাসায় আছি, এক চৌবাচ্ছায় স্নান করে,' একসঙ্গে আহার করে' আমরা সব একান্ন পরিবার হ'য়ে গেছি—কি বল?

নিদর্শন

খগেন হাঁ না কিছু বলিবার আগেই হরিচরণ বাবু কহিতে লাগিলেন—তুমি জান ত, আমি "নভোমণ্ডলের" সহকারী সম্পাদক ও প্রিণ্টার একই সঙ্গে। আমাদের কাগজের যখন এককড়ি বাবু সম্পাদক ছিলেন,—তুমি জান ত এককড়ি বাবুকে! যিনি এখন "স্বাধীন-স্রোতে"র কর্ণধার হ'য়েছেন, আর তাঁকে না জানেই বা কে—

খগেন বিরক্ত হইয়া বলিল—হরিচরণ বাবু।...

হরিচরণ ব্যস্ত হইয়া কহিলেন—সেই এককড়ি বাবুই আমাদের বল্‌তেন, 'বড়লোকের সঙ্গে ভাবও করো না, বাদও করো না। তাদের সঙ্গে ভাব রাখলেও বিপদ, ঝগড়া করলে ত কথাই নেই।'

হ্যাঁ। তা'তে হ'য়েছে কি, হরিচরণ বাবু?

কথায় বলে "বড়র পিরীতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ী, ক্ষণেকে চাঁদ।"—জান ত?

খগেন উত্তরোত্তর ধৈর্য্যহীন হইয়া পড়িতেছিল। রুদ্ধস্বরে কহিল—আমার এত সময় নেই, হরি......

হরিচরণ বাবু কহিলেন—ঝরিয়া কোল্ ফিল্ডের সিন্‌হ সাহেবের সঙ্গে তোমার আলাপ আছে?

খগেন একটি মুহূর্ত্ত ভাবিয়া লইয়া, কহিল—মিঃ জি, সিংহ?

হ্যাঁ গো হ্যাঁ। গঙ্গারামের ছেলে ঘনরাম।

ঘনরাম নয়, ঘনশ্যাম।

তাই তাই! সার্কুলার রোড, বালিগঞ্জের দিকে বাড়ী। জান?

জানি।

সদ্ভাব আছে?

খগেন উত্তর দিল না দেখিয়া, হরিচরণ আপন মনে মাথাটি চুলকাইতে চুলকাইতে কহিলেন—হুঁ হুঁ, ধরেছি ত ঠিক। আমাদের "নভোমণ্ডলের" সম্পাদক শিশির বাবুর কাছে এই খানিক আগে এসে একটা কাপি দিয়ে গেছেন, ছাপাতে। গত বৃহস্পতিবারের কাগজ দেখেছ? "নভোমণ্ডল"? অধঃপতনের চূড়ান্ত! সে ত তোমাকেই উদ্দেশ করে বোধ হ'চ্ছে যেন! তুমি কি যস্ সেফার্ডের বাড়ী একাউন্টেন্টের কাজ কর?

খগেন শেষের প্রশ্নের জবাবটি প্রথমে দিল, কহিল, করি। 'কাগজটা আছে—আপনার কাছে?

কাগজ! কাগজ ত নেই, খগেন বাবু! তবে আর্টিকেলটা আমার মনে আছে। তুমি গ্যাঁড়াতলার গুণ্ডাদের সঙ্গে জুয়া খেলে, দুহাজারটি টাকা হেরেছিলে?

খগেন বলিল—হ্যাঁ।

মদ খেয়ে মেসে ফিরেছিলে?

মদ খেয়ে!—খগেন কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া বলিয়া উঠিল—আপনার কাগজে ছাপা হ'য়েছে?

হরিচরণ বাবু ঘাড়টি নাড়িয়া কহিলেন—তা ত হ'য়েছেই। আবার এটাও কালকের কাগজে ছাপা হ'বে।—বলিয়া ভদ্রলোকটি এক টুকরা কাগজ খগেনের সামনে ফেলিয়া দিলেন। খগেন পড়িতে লাগিল:—

আমাদের দেশের যুবকদের নৈতিক চরিত্র যে কিরূপ ভয়াবহ হইয়া উঠিতেছে তাহা আমরা গত সপ্তাহের "নভোমণ্ডলে" প্রকাশ করিয়াছি। সমস্ত বঙ্গবাসী, যাঁহাদের হৃদয় স্বদেশের উন্নতি অবনতির প্রবাহে উল্লসিত

ও ব্যথিত হয় তাঁহারা শুনিয়া ব্যথা পাইবেন যে সেই অধঃপতিত যুবক কাবলীওয়ালার নিকট টাকা ধার লইয়া, পরিশোধ করিতে না পারিয়া পথে লাঞ্ছিত, অপমানিত হইয়াও বদভ্যাস ত্যাগ করিতে পারিল না। শুনিয়াছি, যুবকটি য়ুনিভার্সিটিতে লেখাপড়া করিয়া দু' 'একটা পাশও করিয়াছিল। শুধু তাহাই নহে, কোন একটি বিশেষ সম্ভ্রান্ত ভদ্র পরিবারের মধ্যে এই যুবকটির অবাধ গতায়াত ছিল। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম, দুশ্চরিত্র যুবক অসামান্য সাধুতার ভাণ করিয়া এখনও উক্ত পরিবারের মহিলা 'দ্বয়ের' (কাটিয়া) 'দের' সহিত মেলামেশা করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। আমরা সে পরিবারের দোষ দিতে পারি না,—তাঁহারা ত এ সমস্ত ব্যাপার অবগত নহেন, কিন্তু এই মূঢ়মতি যুবক তাঁহাদের সর্ব্বনাশ কামনায়......

খগেন আর পড়িতে পারিল না, তাহার চোখের সম্মুখে হরপ অস্পষ্ট হইয়া গেল এবং কাগজখানা ধরিয়া রাখিতে না পারিয়া সে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল।

হরিচরণ বাবু জিজ্ঞাসিলেন—কিছু বুঝলে?

খগেন বিশুষ্কস্বরে কহিল—আমিই। কিন্তু এ মিথ্যা।

তোমার সেই পিতৃবন্ধু রিটায়ার্ড পোষ্টল সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট হেরম্ব বাবুদের বাড়ীর কথা বোধ করি?

আজ্ঞে হ্যাঁ। হরিচরণ বাবু, এই মিথ্যা ছাপা হ'বে আপনার কাগজে?

ছাপা! তা হ'বে বৈ কি। শিশির বাবু হ'লেন সম্পাদক, সিনহ সাহেবের বন্ধু। ভোজটা আশ্‌টা পেয়ে থাকেন।

ভোজ পেয়ে থাকেন বলেই মিথ্যে অপবাদ, একজন নিরপরাধী ভদ্রলোকের নামে······

আমরা মিথ্যেও জানি নে, অপরাধ নিরপরাধ, ভদ্রলোকও জানি নে। প্রেরিত পত্র, ছাপা হবে বৈ কি! তবে হ্যাঁ, তোমার ইচ্ছে থাকে, প্রতিবাদ করো, সে'টিও ছাপবার চেষ্টা করব।

খগেন হাঁ করিয়া বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার মুখ দিয়া একটি শব্দও উচ্চারিত হইতে পারিল না। শেষে সে দুঃখবিজড়িতকণ্ঠে কহিল—কালই ছাপা হ'বে?

কাল সকালেই। নভোমণ্ডল বারোটায় বেরোয় কি-না।

খগেন নীরব। সে ভাবিতেছিল, সুনীলা, ফেণিলা, যখন পড়িবে, তাহাদের মনের অবস্থাটি কিরূপ হইবে? আর কি তাহারা এতটুকু শ্রদ্ধাও রাখিতে পারিবে? তার উপর আজই সন্ধ্যায় সে চোরের মত কার্য্যটি করিয়া আসিয়াছে! আর হেরম্বনাথ! আর কি আমার জন্য এতটুকু স্নেহ-ও তাঁহার সুনির্ম্মল হৃদয়ে থাকিবে! কখনই থাকিবে না। আমি মদ্যপ, আমি দুষ্কৃতাচারী!...

হরিচরণ বাবু নিম্নস্বরে কহিলেন—গোটা তিনেক টাকা দিতে পার খগেন বাবু?

খগেন বলিল—আমার কাছে একটি কপর্দ্দকও নেই, তবে, ধার ধোর করে দিতে পারি।

দেখ-দেখি যদি পাও। আর কটা বাজল, সেটাও দেখে এস।

খগেন পাঁচ মিনিট পরেই, তিনখানি এক টাকার নোট আনিয়া হরিচরণ বাবুর হাতে দিয়া বলিল—এগারোটা।

তা হোক। বেঙ্গল হোটেলে ঢুকলেই হবে। দাম একটু বেশী নেবে—তা আর কি করা যাবে বল? উপায় যখন নেই।

খগেন বিস্ময়পূর্ণকণ্ঠে কহিল—আপনি এখনও খান্ নি, হরিচরণ বাবু?

হরিচরণবাবু হাই তুলিয়া দু'টি তুড়ি দিয়া শ্লেষ্মাপূর্ণস্বরে কহিলেন—না, হে! আজকে একদম নিরম্বু কেটে গেছে।

বলেন কি! সমস্ত দিন! তা আমার ভাত ত, ঢাকা আছে নিশ্চয়ই—খাবেন?

হরিচরণ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন; হাসির বেগ কমিলে বলিলেন—তোমার নামেও লোকে আর্টিকেল লিখে অপবাদ দেয়। বেটাদের কালী কলমের দাম লাগে না? ছোঃ ছোঃ! একদম বে-রসিক! নিরম্বু মানে কি-হে?

খগেন উত্তর দিতে যাইতেছিল, হরিচরণ জামাটি গায়ে দিয়া, ছড়িটি হাতে লইয়া কহিলেন—নির্জলা, হে নির্জলা। একটি ফোঁটাও জোটে নি আজ। দিনটাই মাটী! চল্লুম।—গুড্ নাইট!

খগেন নির্ব্বাক বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। হরিচরণ হাসিতে হাসিতে বলিলেন—ছাপাখানার ভূত চেন? চেন না? এই দেখ…বলিয়া তিনি বিকটরবে হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন—ওটা তুমি রেখেই দাও—ছাপা হ'বে না, ভয় নেই। প্রিণ্টার্স ডেভিল বল্‌বে হারিয়ে গেছে! আবার যখন কাপি দেবে, আবার হারাবে! গুড্-নাইট্!

হরিচরণ বাবু শিস্ দিতে দিতে, ফুল্লমনে কলিকাতার রাজপথে পড়িয়া হন্ হন্ শব্দে পশ্চিমাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ভূতের দয়া।

মেসের যে ঘরটিতে খগেন বাস করিত, সেই ঘরে একটি নবীন যুবক ছিল—তাহার সহবাসী। যুবকটি সম্প্রতি সহরের বাহিরে বিবাহ করিয়াছিলেন, দু'চার শনিবার শ্বশুরালয় ঘুরিয়াও আসিয়াছেন।

বিগত কয়েকদিন খগেনের যে কেমন করিয়া কাটিয়াছে তাহা সেই জানে। ক'দিনই রাত্রে সে বিছানায় পড়িয়া, সারানিশি এ-পাশ ও-পাশ করিয়াই কাটাইয়া দিয়াছে, চোখের পাতাদু'টি বারেকের তরেও মুদিতে পারে নাই। কোথা হইতে, কতদিনের সুপরিচিত ক'খানা স্নেহ-স্নিগ্ধ, মুখ তাহার সামনে সাঁঝের আকাশে তারাগুলির মত টুক্ টুক্ করিয়া ফুটিয়া উঠিত, সারানিশি সে সেই ক'টা তারার পানে চাহিয়া উন্মত্ত দিশেহারা হইয়া কাটাইয়াছে।

আজ সে ঘরটিতে ঢুকিয়া, শয্যাটি বিছাইয়া লইয়া কালীবাবুকে কহিল—দয়া করে' যদি আলোটা নিবিয়ে দেন, উপকার হয়। আর রাতও ত বড় কম হয় নি।

এই দিই—বলিয়া যুবকটি আপন মনে লিখিয়া যাইতে লাগিলেন।

মিনিট পাঁচ সাত পরে খগেন পুনরায় কহিল, কালীবাবু, আলোটা…

হ্যাঁ, এই দিই।

খানিকটা চোখ্ বুজিয়া পড়িয়া থাকিয়া খগেন যখন চোখ খুলিল, আলো এবং কলম সমানভাবেই জ্বলিতে ও চলিতেছিল। খগেন সাড়া

দিতে খক্ খক্ করিয়া কাসিয়া উঠিতেই, ভদ্রলোকটি বলিয়া উঠিলেন—এই দিই।

কিন্তু আলো নিবিল না। খগেন ভদ্রলোককে বারবার বিরক্ত করিতে নিজেই লজ্জানুভব করিতেছিল, কিন্তু আলো তাহার সহ্য হইতেছিল না। আলো থাকিতে সে-যেন কোন জিনিষটা বেশ করিয়া ভাবিয়া লইতে বাধা পাইতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল, অন্ধকারে কেবলমাত্র সেই হৃদয়াকাশের নক্ষত্রের আলো-কটাই তাহার হৃদয় আলোকিত করিয়া রহিবে; বাহিরের আলো একান্ত অসহ্য।

তাহার পক্ষে অসহ্য হইলেও কালীবাবুর অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। গত রবিবারে শ্বশুরালয় হইতে ফিরিবার সময় কি-একটা কারণে তাঁহার নবীনা বধূটি তাঁহার সহিত মন খুলিয়া কথা কহে নাই—তাহারই প্রতিশোধ লইতে, শ্বশুরপক্ষীয় অনেক লোকের অনুরোধ উপরোধ অগ্রাহ্য করিয়াও, আজ কলিকাতাতেই থাকিয়া গেছেন এবং এখন কিছুকাল যে তাঁহার যাইবার ইচ্ছা নাই, ছয়পৃষ্ঠাব্যাপী পত্রে মাত্র সেই কথা কয়টি জানাইয়া দিতেছিলেন।

খগেন আবার ডাকিল, কালীবাবু, ম'শায়...

হ'য়ে গেছে।—বলিয়া কালীবাবু সিটি অব্ গ্লাস-গো আফিসের প্যাডটী (এইখানেই জীবন বীমা করিবেন, এজেন্ট বিহারীলাল বাবুকে এ আশা দেওয়াতেই প্যাডখানি সংগ্রহ হইয়াছে) ঝপাৎ করিয়া মুড়িয়া আলোটি কমাইয়া দিলেন। অল্পক্ষণ পরেই, খগেনকে নিদ্রিত জ্ঞানে কালীবাবু পুনরায় আলোটি তুলিবার উপক্রম করিতেই, খগেন কাসিয়া উঠিল। কালীবাবু শুইয়া পড়িলেন। এবং মনে মনে খগেনের

মস্তকটি চর্ব্বন করিতে করিতে রাতটা যে কি রকমে কাটাইলেন তাহা আর আমরা প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে উপহাসাস্পদ করিতে চাহি না।

ছাপাখানার ভূত সত্য কথাই বলিয়াছিল, বড়র পীরিতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ী, ক্ষণেকে চাঁদ! কিন্তু খগেন কিছুতেই ভাবিয়া পাইল না, যে এই বড় লোক কেন, কি কারণে, এই বিপুল বিশ্বে এত লোক থাকিতে তাহার 'পরেই এত অসন্তুষ্ট হইল? সে ত জ্ঞানে, অজ্ঞানে তাহার কাছে এতটুকু অপরাধও করে নাই। তাঁহার প্রাপ্য সম্মান, সম্বর্দ্ধনা সকলের মত সে'ও ত দিয়াছে, তবে কেন তাঁহার এই রোষ! সিংহ সাহেবের তুলনায় সে ত অতিশয় ক্ষুদ্র, মশক বলিলেও চলে—তাহাকেই মারিয়া হাত কালো করিবার কি এমন পার্থিব অপার্থিব হেতু ঘটিয়াছিল, এ আর সে কোন মতেই ভাবিয়া পাইল না।

আজ তাহার তূণে পাশুপত অস্ত্র রহিয়াছে। ছাপাখানার ভূত সত্যই যথেষ্ট উপকার করিয়াছে, এই অস্ত্র নিক্ষেপে সে সিংহ বিদ্ধ, এমন কি বধ করিতেও পারে।

আজ সে ভাবিতে ভাবিতে ইহাই স্থির করিল, সে হেরম্বনাথের কাছে যাইয়া সমস্ত অপরাধ স্বীকার করিয়া আসিবে এবং যাহা অপরাধ নয় তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষী প্রমাণ দিয়া আসিবে। তখনও কি হেরম্বনাথ তাহাকে বিশ্বাস করিবেন না? কেন করিবেন না? নিশ্চয়ই করিবেন। তাঁহার মত উন্নত উদার চরিত্রের কাছে যদি সত্যের সম্মান না থাকে, কোথায় থাকিবে আর! তিনি বিশ্বাস করিবেন-ই। সুনীলা ফেণিলা ইহারাও বিশ্বাস করিবে বোধ হয়। করাই সম্ভব। বাকি সুশীলা!

তাঁহার পক্ষে কথাটা বিশ্বাস করা শক্ত বটে! খগেন যেরূপ শুনিয়াছে ও দেখিয়াছে, সুশীলা যে সিংহ সাহেবের ত্রুটি ধরিবে, এমন ত বিশ্বাসই হয় না।

আচ্ছা, এই সিংহ সাহেবের মতলবটা কি? আমি না-হয় দরিদ্র, পথের ধূলা, আস্তাকুড়ের ময়লাই হইলাম, আমার না-হয় ওঁদের সঙ্গে মেলা-মেশা করাটা অন্যায় অশোভনই হইয়াছে, সিংহ সাহেব সে'টি বরদাস্ত করিতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহার কি উদ্দেশ্য? তিনি যে কলিয়ারী ফেলিয়া, বড় লোক, নিজের বিষয়-আশয় ছাড়িয়া ওখানে মাতিয়া উঠিলেন—কি কারণ?

সিংহ সাহেবের বয়স কত অনুমান হয়? পঞ্চাশ? না, না অত হবে না! চল্লিশ, হাঁ, চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ্ হইতে পারে? তিনি কৃতদার না অকৃতদার? এত বয়স অবধি অকৃতদার? কে জানে? আচ্ছা ওঁর স্কুল, উনি প্রোপাইটার, সুশীলা শিক্ষয়িত্রী—তাহাতেই কি এতটা হৃদ্যতা?—ইহা ছাড়া আর যে কি হইতে পারে, অনেক ভাবিয়াও খগেন তাহা নির্ণয় করিতে পারিল না। কিন্তু তাহার মন হইতে সংশয় দূর হইল না।

তখনি মনে হইল, আচ্ছা যদি সুশীলা রাগ করিয়া বসেন? আবার ভাবিল, না রাগ করিবার কি হেতু আছে? সে ত আর মিথ্যা অপবাদের বোঝা বাড়ী বহিয়া সিংহ সাহেবের স্কন্ধে তুলিয়া দিতে যাইতেছে না যে, সে রাগ করিবে? তবুও, যদি, সুশীলা বিমুখ হ'ন, নাচার।

খগেন অপনাকে মুক্ত করিবে এবং তাহারই মূল্যস্বরূপ যদি আবাল্যের সুপরিচিত স্নেহ প্রীতি-শান্তিময় এই পূণ্য নিকেতনই তাহাকে জন্মের

মত ত্যাগ করিতে হয়, সে তাহাও করিবে।—এই ভাবিয়া সে মনের মধ্যে আশা, আকাঙ্ক্ষা, উদ্বেগ, শঙ্কা লইয়া রাত্রিটুকু প্রভাতের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

ভোরের দিকে 'ছাপাখানার ভূত' হৈ চৈ করিয়া, মেসের বৃদ্ধ ভৃত্য সনাতনের পূর্ব্বপুরুষগণের গুণগান গাহিতে গাহিতে, বিছানায় আসিয়া পড়িলেন। সনাতন 'ভূতকে' ঘরে পূরিয়া, নীচে নামিয়া সুদ-সমেত সেগুলি ফিরাইয়া দিতে বিন্দুমাত্র অবহেলা করিল না। খগেন সেইমাত্র শয্যাত্যাগ করিয়াছে, গোবিন্দ তাহার হাতে চিঠিটা দিয়া বলিল—ছোট দি-মণি পাঠিয়েছেন।

ফেণিলা?—বলিয়া সে পত্রটি উন্মোচন করিতেই সবুজ রঙের চেক-খানা প্রথমেই তাহার নজরে পড়িল। প্রফুল্লমনে, ঘরে ঢুকিয়া পত্রপাঠ শেষ করিয়া যখন সে বাহিরে আসিল, তখন গোবিন্দ চলিয়া গেছে!

আবার ঘরে ঢুকিয়া চেক্‌খানা নাড়িয়া চাড়িয়া, অতি যত্নে সেখানিকে হাত বাক্সে রাখিয়া আপনমনে কহিল—না সু, এ আমি ভাঙাব না। যত কষ্টই আসুক আমার, তোমার হাতের লেখাটি চিরদিন এমনি রুদ্ধ হ'য়ে থাক্—আমার বাক্সে। আমার হৃদয়ে, আমার প্রাণে, আমার মনের গোপন কোণে!

কাল সারারাত ধরিয়া সে যতরকমের সম্ভব অসম্ভবের চিন্তা করিয়া মরিয়াছে, তাহার মাঝে থাকে-থাকে, সেই সন্ধ্যারাত্রের ঘটনা তাহাকে বিদ্ধ করিয়া ফেলিতেছিল। কাহার আহ্বানে সচকিত হইয়া ফেণিলা মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিল, সেও পলায়ন করিয়াছিল, সে-জানে না। কিন্তু সারারাত এই ভাবনা তাহার ছিল যে, ইহা লইয়া কোন গণ্ডগোল না

হইলেই বাঁচে। এখন এই পত্র ও চেক্ প্রাপ্তিতে সে আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। কিন্তু গোবিন্দ কেন বলিল—ছোট-দিদিমণি পাঠিয়েছে! পত্র এবং চেক্ দুই-ই-ত তাহার—সুনীলার। যাক্—ইহা লইয়া সে মাথা ঘামাইল না।

মেসের বাসায় সাতটার মধ্যে প্রাতঃরাশ শেষ হইয়া যায়—সাড়ে আটটা নটার সময় সকলকেই স্নানাহার সারিতে হয়। সাতটা বাজিতেই হৈ চৈ সুরু হইয়া গেল। কেহ হাঁকিতে লাগিলেন—কি চা করেছ ঠাকুর? না-চিনি, না দুধ! কেহ—নিম পাতা সিদ্ধ করেছ বুঝি! কেহ—উড়ে ম্যাড়া, আর কত হ'বে। কেহ-বা, একেবারে সপ্তমে চড়িয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন—বুড়ো হ'য়ে মরতে চলেছ, চা করতে শিখ্‌লে না?—ইত্যাদি। ঠাকুরটিকে খুব ভালই বলিতে হইবে, সে সেই যে রান্নাঘরে ঢুকিয়া পড়িল, না দিল একটু সাড়া, না করিল, একটা তর্ক।

খগেন নামিয়া আসিয়া বলিল—আমার চা কৈ ঠাকুর।

ঠাকুরমহাশয় মস্ত একটা এনামেলের বাটিতে 'ফুঁ ফুঁ' করিয়া চুমুক দিতেছিলেন, খগেনের ডাক শুনিয়া, সসব্যস্তে নিজের পাত্র হইতেই খানিকটা চা একটা কাপে ঢালিয়া বাহিরে, খগেনের সামনে ধরিয়া দিল। চা খাইতে খাইতে খগেন মহীনবাবুর সঙ্গে রেসের গল্প জুড়িয়া দিল।

এই সময়ে গোবিন্দ ডাকিল—বাবু!

খগেন চা'য়ের কাপ্ রাখিয়া, উঠিয়া আসিয়া কহিল—কি-রে?

আর একটা চিঠি—বাবু দিয়েছেন।

দে—বলিয়া চিঠিটা লইয়া শিরোনামা পাঠ করিয়া সে মহীনবাবুর

কাছে ফিরিয়া আসিল। চিঠিখানা বগলে চাপিয়া ফিরিরা আসিতেই, অমরবাবু মহীনকে কহিল—আপনি যাচ্ছেন ত ভাইস্‌রয় কাপের দিন, মহীনবাবু?

সে ত ফি বৃছরই যাই--বলিয়া মহীনবাবু, সদ্যঃপ্রাপ্ত হুঁকাটিতে খুব জোরে টান দিতে লাগিলেন।

এবছর ভাইস্‌রয়েস কাপে স্বয়ং প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ থাকবেন।

তাই নাকি? কিন্তু তা কি করে হ'বে? তিনি ত আসছেন······

বাধা দিয়া হেমবাবু কহিলেন—হ্যাঁ হ্যাঁ তাঁর টুর প্রোগ্রাম আছে আমার কাছে। এক্সমাসের সময়টা তিনি এখানেই থাকবেন—আমি জানি। ইহা শুনিয়া আর কেহই কোন কথা কহিল না। যেহেতু সকলেই জ্ঞাত ছিল, ফুটবল ম্যাচের ফিক্সচার, থিয়েটর বায়স্কোপের হ্যাণ্ডবিল, স্বদেশী বিদেশী সভার বিজ্ঞাপন, রাজ্যের যত-কিছুর যা-কিছুর সংগ্রহ হেমবাবুর কাছে রাশি-প্রমান আছে। মেসে কখনও কোনও তর্ক উঠিলে. সকলে তাঁহাকে 'রেফার' করিত। তিনিই ছিলেন, ইহাদের 'অথরিটি'-বিশেষ।

রাধানাথ বলিলেন—আপনার বগলে ওটা কি খগেন বাবু?

একখানা চিঠি আছে।

কালীবাবু ব্যগ্র হইয়া, দক্ষিণ হস্তটি প্রসারিত করিয়া কহিলেন—সাতটার ডাক্ এসে গেছে?

তাঁহার উৎকণ্ঠায়, সকলেই মুচকি হাসিতে লাগিলেন; খগেনও হাসিয়া কহিল—এ'টা ডাকের চিঠি নয়—হাতে এসেছে।

ওঃ—বলিয়া কালীবাবু অন্যদিকে মুখ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

নিদর্শন

সভাভঙ্গে খগেন নিজ কক্ষে ফিরিয়া আসিল। চিঠিখানা খুলিয়া, পড়িতে পড়িতে তাহার মুখখানি প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। পত্রের অবিকল নকল আমরা উদ্ধার করিয়া দিলাম :—

কলিকাতা
২৮—৮—২১

প্রিয় খগেন,

কিছুদিন হইতে আমি লক্ষ্য করিতেছি, আমার পরিবার মধ্যে কেমন একটা বিশৃঙ্খলা আসিয়া পড়িয়াছে। এই পরিবারবর্গের পবিত্রতা, শান্তি রক্ষা করিবার যে-যে উপায় বর্ত্তমান ছিল, যে কারণেই হোক্ এখন আর তাহা কার্য্যকরী হইতেছে না। আমার মত তুমিও স্বীকার করিবে, আমাদের বঙ্গ-সংসারে পবিত্রতার বড় কোন সম্পদই নাই এবং যেখানে পবিত্রতা নাই, সেখানে মানুষ—মানুষই নহে।

আমি বিশ্বস্তসূত্রে জানিয়াছি, তুমি আমার কনিষ্ঠ কন্যা ফেণিলার প্রতি অনুরক্ত। ইহা প্রথমে আমি বিশ্বাস করিতে পারি নাই, কিন্তু এখনই হাতে হাতে প্রমাণ পাইয়া তোমাকে এই পত্র লিখিতেছি। তোমাকে আমরা স্নেহ করিয়া থাকি, তাহা হইতেই তুমি বুঝিতে পারিবে—আমি কিরূপ নিরুপায় হইয়াই ইহা তোমাকে লিখিতেছি। তোমাকে আমি যথেষ্ট বিশ্বাস করি, তোমার বিরুদ্ধে যে সব রটনা লোকে রটাইতেছে, যাহা কাগজেও ছাপা হইয়া গেছে, তাহা আমি সত্য বলিয়া বিবেচনা করি না।”

খগেন মুখটি তুলিয়া কেবলমাত্র বলিল —ফেণিলা!

পরে লিখিত ছিল :—

"কিন্তু সব দিক বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে এবং তোমার পিতৃবন্ধুর কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে হইলে, তোমার সহিত নীলার দেখা সাক্ষাৎ না হওয়াই মঙ্গল। আমি বুঝিতে পারিতেছি, ইহাতে তুমি কষ্ট পাইবে, কিন্তু কি করিব? তোমাদের মঙ্গল কামনা করিয়া, আমি এই পথই অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলাম। তোমাকে আমার গৃহে আসিতে নিষেধ করিলাম, তাই বলিয়া, তোমার সহিত আমাদের স্নেহের সম্পর্ক ত ঘুচিল না। সকল সময়েই তোমাকে সাহায্য করিতে, স্নেহের উপদেশ দিতে আমি ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ বাধ্য। যখনই প্রয়োজন বোধ করিবে পত্র ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হইও না। ইতি—

তোমার স্নেহবদ্ধ
হেরম্বনাথ মিত্র।"

খগেন পত্রটি হাতে করিয়া, কাঁদিয়া ফেলিল। সারা বুকের মধ্যে কে যেন দুড় দাড় করিয়া লাথি মারিতেছিল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সে উবুড় হইয়া পড়িয়া রহিল।

বেলা হইয়া গেছে, আফিসের বাবুরা স্নানাহার শেষ করিয়া লইয়াছেন। কালীবাবু জামা কাপড় পরিতে পরিতে কহিলেন—খগেন বাবু, শুয়ে যে! বেরুবেন না?

খগেন মুখ না তুলিয়াই কহিল—না।

বারোটার সময় ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিতে আসিল—বাবু, ভাত খাবার কি দেরী আছে?

আমি খাবনা ঠাকুর, তোমরা যাও।

ঠাকুর দুঃখ প্রকাশ করিয়া গেল—শরীল খারাপ থাকে ত কাজ

নেই আর খেয়ে। ভালো থাকেন, ওবেলা দু'চারখানা রুটী খেলেই চল্‌বে।

হরিচরণ বাবু ছাপাখানা হইতে ফিরিয়া খগেনের কক্ষদ্বার উন্মুক্ত দেখিয়া কহিলেন—কি-হে খগেন বাবু, বেরোও নি?

না। হরিচরণ বাবু, আপনি এ চিঠি ছাপাতে পারেন। আমারই ভুল হ'য়েছিল, ওটা গোপন করবার কোনই কারণ নেই।

ছাপাখানার ভূত ছাতির কাপড়ে মুখখানা মুছিয়া কহিলেন—তাই ত! কিন্তু টাকাটা ত মাসকাবারের আগে দিতে পারব না ম'শায়!

খগেন বলিল—টাকা আপনাকে দিতে হ'বে না, হরিচরণ বাবু!

না, না—ওটা আপনাকে দিয়ে দেব মাসকাবারে। আপনার যখন কোনই উপকার হ'ল না, মিছে কেন……

খগেন বলিল—উপকার আমার যথেষ্ট করেছেন, হরিচরণ বাবু! তার জন্যে আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।

ছাপাখানার ভূত কিছুই বুঝিতে না পারিয়া কহিল—ওটা ছাপলেও উপকার হ'বে?

উপকার না হ'ক, অপকার হ'বে না। আপনি ছাপবেন।

না, ম'শায় ছাপা আর ওটা হ'বে না—হ'ত ত আজই হ'ত। আজই শিশির বাবুকে বলেছি, ওটা হারিয়ে গেছে—বলিয়া তিনি স্লিপটি ছিঁড়িতে উদ্যত হইয়াছিলেন, খগেন সসব্যস্তে হাত বাড়াইয়া বলিল—তবে ওটা আমার কাছেই থাক, দাদা।

থাক্—বলিয়া ভূত অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

'সুখের ঘরে'।

যে সময়ে খগেন ছাপাখানার ভূতকে লইয়া মেসের বাসার সেই প্রায়ান্ধকার ধূমমলিন কক্ষে আপন অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতেছিল, ঠিক্ সেই সময়ে এ বাড়ীতে ভুত দেখার মতই, সুনীলা ও ফেণিলা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতেছিল।

জিনিষপত্র সব গাড়ীতে উঠিয়াছে, হেরম্বনাথ সিঁড়িতে নামিতে নামিতে কহিলেন—তোমরা তিনটি স্ত্রীলোক থাক্‌ছ, খুব সাবধানে থেকো, আবশ্যক বুঝলেই আমাকে জরুরী টেলিগ্রাফ করতেও বিলম্ব করো না।

সুশীলা মাথাটি ডানদিকে হেলাইয়া মৃদুস্বরে কহিল—দরকার আর কি-ই বা হ'বে, তবে অসুখ-বিসুখ হ'লে, এই যা।

হেরম্বনাথ হাসিলেন। হাসিয়া বলিলেন—অসুখ-বিসুখটা বড় দরকার নয়, সুশীলা। ওটার জন্যে আমি ভাবি নে। তার চেয়ে স্বাভাবিক ঘটনা সংসারে কিছুই নেই।······বলিয়া তিনি কয়েকমুহূর্ত্ত থামিলেন। একটু পরে, নামিতে নামিতে কহিলেন—সুশীলা, হয় ত খগেন থাক্‌লে এ সময়ে তোমাদের কিছু উপকার হ'তে পারত, কিন্তু তাকে এখানে আসতে আমি মানা করে দিয়েছি।

সুশীলা পরিতৃপ্তির কোমলকণ্ঠে পিতার কথাটাই পুণরুচ্চারণ করিল, মানা করে দিয়েছ, বাবা?

প্রীতির নিদর্শন

হ্যাঁ সুশীলা। যে কারণেই হ'ক এই সংসারে একটা অশুভ আলোচনা যখন জন্মাতে সুরু করেছে, তখন মূলেই তার অঙ্কুর ছেদ করাই মঙ্গল। এই কারণেই আমি আজই সকালে গোবিন্দকে দিয়ে তা'কে লিখে পাঠিয়ে দিয়েছি।

সুশীলা, ফেণিলার পানে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল। ফেণিলা যেন ক্রমাগত অধীর হইয়া উঠিতেছিল। পাছে কোন কথা বলিয়া পিতার বিদায়ের সময়টা বিশ্রী করিয়া দেয়, সকলের অসাক্ষাতে সুনীলা বাম হাত দিয়া তাহাকে বেশ শক্ত করিয়া ধরিয়া রহিল।

পিতা আর কিছুই বলিলেন না। এবং কোন দিকে না চাহিয়াই ফটকের সামনে গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। কন্যাত্রয় পিতার পদধূলি লইতেই ক্যোচম্যান গাড়ী হাঁকাইয়া দিল। পূর্ব্বে কথা ছিল, ইহারা ষ্টেশন অবধি যাইবে, হঠাৎ হেরম্বনাথ কেন-যে মতটা পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন, বলা যায় না।

ফেণিলা ঘরে ঢুকিয়া সশব্দে, দ্বারটি বন্ধ করিয়া দিয়া, শয্যায় আসিয়া শুইয়া পড়িল।

সুনীলা, সুশীলার সঙ্গে তাহার ঘরেই গিয়াছিল। অন্য দু'চারটি কথার পর সুশীলা বলিল—বাবা এটি খুব সুবিবেচনার কাজ করে গেছেন, সু? কি-বলিস্? আচ্ছা—কি সাহস ভাই ওদের?

সুনীলা কথা কহিল না। সুশীলা বলিয়া চলিল—আমি কিন্তু এইটে ভেবেই আশ্চর্য্য হ'চ্ছি যে, ছোকরা অমন ভালমানুষটির মত থাকৃত, যেন কিছুই জানে না, একেবারে কচি খোকাটি!—ও-মা, তলে তলে এত!

করিস ত, বাপু, কেরাণীগিরি—একশ' টাকা মুরদ ত তোর! আবার 'লাভ্' করা। দেখে আর বাঁচি নে।

সুনীলা বলিল—নীলা কোথায় গেল-দেখি?—বলিয়া সে বাহির হইতে যাইতেছিল, সুশীলা বলিল—রঝানি ফিরল না-কেন সু?

কি জানি দিদি। দাঁড়াও আমি নীলাকে দেখি।—বাহিরে আসিয়া, সে যাহা আশঙ্কা করিয়াছিল, দেখিল, তাহাই সত্য! অনেকক্ষণ খুটখুট করিয়া করতাড়না করিয়াও যখন দ্বার খোলা পাইল না, তখন অতি মৃদুস্বরে ডাকিতে লাগিল—নীলা, ও নীলা, নীলা, লক্ষ্মী বোন্‌টি আমার! দোরটা খুলে দে ভাই।

ফেণিলা বোধ করি এই মৃদুস্বর শুনিতে পায় নাই। না পাইবারই কথা। সুনীলা জোরেও ডাকিতে পারিতেছিল না। তাহার ইচ্ছা নয় যে, সেই শব্দে সুশীলা আসিয়া পড়ে।

ও দিকে একটা জানেলা, যেটা বারান্দার দিকে খুলিয়াছে, সেইদিকে গিয়া ডাকিল - নীলা, দোরটি খুলে দে-না ভাই, আমিও একটু শুই।

প্রথমে কোন সাড়া আসিল না, পুনঃ পুনঃ ডাকাডাকি করার পর খুট্ করিয়া একটু শব্দ হইল। সঙ্গে সঙ্গেই ফেণিলা আরক্ত চক্ষুতে চাহিয়া কহিল—এখানে কেন, খবরের কাগজ নিয়ে যাও-না বড়লোকদের কাছে।

সুনীলা বুঝিতে না পারিয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল। ফেণিলা তীক্ষ্ণস্বরে কহিল—আসবে ত এস, নইলে দোর বন্ধ করব। আমার কাজ আছে।

প্রীতির

নিদর্শন

সুনীলা ভিতরে ঢুকিয়া দেখিল, রাশি রাশি খাতা, পত্র, বহি, পেন্সিল, ছবি, কলম চারিদিকে ছড়ানো রহিয়াছে। একধারে কতকগুলি জামা কাপড়ও পড়িয়া। সবিস্ময়ে কহিল—এসব কি?

ফেণিলা কথা কহিল না। আপন মনে কাগজ-পত্রগুলি গুছাইয়া তুলিতে লাগিল। সুনীলা পুনশ্চ ঐ প্রশ্ন করিতে, ফেণিলা নতমুখে জবাব দিল—আমার জিনিষপত্র ঠিক করে নিচ্চি।

সুনীলা অত্যন্ত কৌতুহলী হইয়া উঠিয়াছিল। তাহা সত্বেও সে কোন কথাই কহিল না। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, তার পর আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গেল।

সুশীলা নিজের ঘরে। সুনীলা একলা একবার একতলে, একবার পড়িবার ঘরে, উদ্দেশ্যহীন হইয়া এধারে ওধারে ঘুরিয়া কিছুক্ষণ পরে আবার শয়নকক্ষেই ঢুকিল। দ্বারটি ভেজান ছিল, ফেণিলা তাহাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিল—তোমার কতকগুলো জিনিষ আমার ড্রেসিং কেসে রয়েছে, সেগুলো বের করে নাও মেজ দি।

কেন?

একবার ত তোমায় বল্লুম, মেজ-দি। আমি যাচ্ছি।

সুনীলা অর্দ্ধমুহূর্ত্ত বোন্‌টির পানে চাহিয়া স্নেহস্বরে কহিল—কোথায় যাবি নীলা?

তার কৈফিয়ৎ তোমায় কি দেব, বল? তবে থাকৃব না আমি, কক্ষোনো থাকৃব না।—বলিয়া সে আর্দ্রস্বর গোপন করিতে থামিয়া গেল। কিন্তু পারিল না, অন্যদিকে মুখ করিয়া সজল কণ্ঠেই কহিতে লাগিল—আমি ত কোনদিনই তোমাদের সংসারে ছিলুম না মেজদি।

হঠাৎ একদিন এসেছিলুম, হঠাৎ একদিন চলে যাচ্ছি। তা'তে কারই বা ক্ষতি, কারই বা দুঃখ?

সুনীলা বলিল—কারই দুঃখ নেই, নীলা?

না।

সুনীলা কথা কহিল না।

ফেণিলা তাহাকে নীরব জানিয়া বলিল—যত দোষ আমার! আমার জন্যে বাবা দেশ ছেড়ে গেলেন, আমার জন্যে দিদির মনঃকষ্ট, আমারই জন্যে······বলিতে বলিতে সে চুপ করিল।

সুনীলা বলিল—এর একটাও সত্যি নয়, নীলা।

ফেণিলা অকস্মাৎ এ দিকে মুখ ফিরাইতেই দু'টি মুখের চারটি সজল আঁখি মিলিত হইল। সুনীলার চোখে জল দেখিয়া, ফেণিলা যেন বিস্মিত হইল—তুমি কেন কাল আমাকে মিথ্যে বোঝালে মেঝ্ যে, বাবা বিদেশ যাচ্ছেন, আমিই তার কারণ নই।

সুনীলা বলিল—আমি মিথ্যে বলি নি সু। আমি যা জানতুম, তাই বলেছি।

ফেণিলা জিজ্ঞাসিল—তবে কারণটা কি তাই শুনি?

তা জানি নে, নীলা। তবে আমার মনে হ'য়েছিল তোর সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধ নেই।

তাই যদি না থাক্‌বে, তুমিই বল, খগেন বাবুকে নিষেধ করবার কারণ কি হ'য়েছিল?

সুনীলা নিজেই তাহা বুঝিতে পারিতেছিল না। কিন্তু কাল রাত্রের ঘটনা যা ঘটিয়াছে, তাহা হইতে ইহা অনুমান করাও শক্ত নয় যে, দিদির

মনস্তুষ্টি করিতে এবং সকল দিক বাঁচাইয়া চলিতে পিতা অগত্যা এই পথই অবলম্বন করিয়াছেন। এ কথা সে মুখে প্রকাশ করিতে পারিল না। কেবল ভগ্নীর হাতটি তুলিয়া ধরিয়া কহিল—না, নীলা, বাবা এ ভালই করেছেন। দেখ, দোষ তোরও নয়, খগেন বাবুরও নয়, তবুও ক'দিন ধরেই কেমন একটা অশান্তি কেবলই জেগে জেগে উঠ্‌ছিল। ভদ্র পরিবারে সে'টা আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়। নাই-বা এলেন তিনি! আর এসে, অপমান হওয়ার চেয়ে, লোকের বিরাগভাজন হ'য়ে থাকার চেয়ে, না আসা যে ঢের ভাল।

ফেণিলা কি বলিতে যাইতেছিল, সুনীলা আবার বলিল—আজ যদি আমাদের দাদা থাক্‌তেন নীলা!—বলিতে বলিতে তাহার মুখখানি আবার জলে ভাসিয়া গেল।

অনেকক্ষণ কেহই আর কথা কহিল না। শেষে ফেণিলা বলিল—আমি যে মিস্ টডকে চিঠি লিখেছি মেজ্‌দি?

কৈ দেখি।

ফেণিলা রাইটিং কেস্‌টি বাহির করিয়া তন্মধ্য হইতে চিঠিখানা সুনীলার হাতে দিতেই, সুনীলা সেখানা কুচি কুচি করিয়া ছিড়িয়া জানেলা গলাইয়া বাহিরে ফেলিয়া দিয়া, কহিল—ছিঃ, পাগলামী করে?

পাগলামী?

নয়? বাবা শুনে কি ভাববেন? দিদি কি মনে করবেন? সিঙ্গী-সাহেব······

সে জান্‌বে কোত্থেকে?

তিনি এলেই ত টের পাবেন।

আর কেন আস্‌বে? দিদি ত আর রাঁচি যাচ্ছে না।

সুনীলা মৃদু হাসিয়া বলিল—তাইতেই ত আরও আসবেন তিনি; দিদিকে না হলে তাঁর অনাথ বিদ্যালয় টেঁকবে না।

কেন?

তুই দেখিস্‌, নীলা। তিনি আস্‌বেন-ই। এবং দিদি……

ফেণিলা উৎকণ্ঠ হইয়া রহিল, কিন্তু সুনীলা কথা কহে না। শেষে সে অসহিষ্ণু হইয়া বলিয়া উঠিল,—তা'তে বাবা কিছু বল্‌বেন না? যতদোষ এই গরীব বেচারী খগেন বাবুর,—নয়?

গরীবের অপরাধ ত আজ নতুন নয়, নীলা, সৃষ্টির আদিকাল থেকেই এমনি চলে আস্‌ছে। কিন্তু এ তা নয় বোন্‌। বোধ করি, বাবা তাঁদের অভিপ্রায় জানেন।

কি অভিপ্রায়?

সুনীলা একমিনিট চুপ করিয়া রহিয়া, অতি মৃদুকণ্ঠে ফেণিলার কাণে কাণে কি কহিল। শুনিয়া ফেণিলা স্তব্ধ হইয়া গেল। অনেকক্ষণ পরে কহিল—সত্যি?

বোধ হয়।

বুড়ো যে!

চুপ—চুপ—দিদি এই দিকে আস্‌ছেন বোধ হয়। বলিয়া উভয়ে দ্বারের পানে চাহিয়া রহিল।

পদশব্দ অর্দ্ধপথেই থামিয়া গেল। সুনীলার অনুমানই ঠিক, সুশীলাই আসিতেছিলেন, ইহাদের কক্ষদ্বার রুদ্ধ দেখিয়া, তিনি সেখান হইতেই ডাকিলেন—সু!

প্রীতির
নিদর্শন

সুনীলা দ্বারটি খুলিয়া বলিল—কি দিদি ?

মিঃ সিংহ এসেছেন।

আসছি দিদি—বলিয়া সে দ্বারটি ভেজাইয়া ফেণিলাকে ইঙ্গিত করিয়া কহিল—দেখ্‌লি ?

ফেণিলা জিজ্ঞাসিল—যাবে ?

না।—বলিয়া সে একখানা বহি টানিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

সিংহের কাতরতা।

সুশীলা পাথাটা খুলিয়া দিয়া, একখানা চেয়ার টানিয়া, বসিয়া পড়িতেই মিঃ সিংহ বলিলেন—তা হঠাৎ উনি লক্ষ্ণৌ গেলেন যে? সেখানে তোমা-দের আত্মীয় বন্ধু কেউ আছেন না-কি?

সুশীলা অত্যন্ত অন্যমনস্কের মত কহিল—আত্মীয়—হ্যাঁ তা আছেন বৈ-কি!

বেশ যায়গা এই লক্ষ্ণৌ। আমি অনেকদিন ছিলাম, বুঝলে সুশীলা। সেখানেও বেশ্ আছে কি-না।

সিংহ সাহেব অনর্গল বকিয়া যাইতেছিলেন, হঠাৎ এক সময়ে তাঁহার মনে হইল, শ্রোতাটি কেমন অন্যমনস্ক। সে টেবিলে হাত রাখিয়া বসিয়া আছে বটে, কিন্তু তাহার মন বা দৃষ্টি এদিকে বা এখানে নাই। তাই সিংহ সাহেব একটু বিচলিত হইয়া কহিলেন—তোমার মনটা আজ ভালো নেই সুশীলা! আর মন না ভালো থাক্‌লে যা হয়, চেহারাটাও……

সুশীলা দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল—আসছি আমি।—সুনীলাকে ডাকিয়া সে যখন ফিরিয়া আসিল, সিংহ জিজ্ঞাসিলেন, তোমাদের খগেন বাবুর খবর কি? আস্‌ছেন?

তাঁহার মুখের হাসিটা সুশীলার আদৌ ভাল লাগিল না। সে আস্তে আস্তে বলিল—না, আর আসেন না।

কেমন—আমি সেদিনই তোমাকে বলিনি, সুশীলা, যে, আমি থাকৃতে সে আর এ পথ মাড়াবে না। হা হা হা হা।

এবারের হাসিটা আরও বিশ্রী বোধ হইল। সুশীলা সাড়া দিল না। শুষ্ক মুখখানি নত করিয়া বসিয়া রহিল।

সিংহ বলিলেন—না সুশীলা, তুমি ক'দিনেই একেবারে শুকিয়ে আধখানা হ'য়ে গেছ। কলকাতা তোমার সহ্য হ'চ্ছে না। কি-বল?

সুশীলা এবারেও সাড়া দিল না। কিন্তু সে মনের মধ্যে চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল। প্রতিমুহূর্ত্তেই সে আশা করিতেছিল, সুনীলা আসিয়া পড়িবে, কিন্তু কোথায় সুনীলা, কোথায় কে?

সিংহ দুঃখপূর্ণস্বরে কহিলেন—তুমি না বল্লেও আমি বেশ বুঝতে পারছি সুশীলা। তোমাকে ত আমি অনেকদিন থেকেই দেখ্‌ছি, এমন শুষ্ক, পাণ্ডুর চেহারা ত কোনদিন দেখি নি, তোমার।

সুশীলা নতমুখেই বলিল—আমি বেশ আছি।

বল্লেই হ'বে—বেশ আছি! তুমি ত আর সর্ব্বক্ষণ আয়না নিয়ে দেখ্‌ছ না; যে দেখ্‌ছে সে বল্‌ছে······

না, না, ও কিছু না।······আপনার চা করতে বলি?

চা! এখনই—কেন? মোটে ত তিনটে বেজেছে।

তবে থাক্।

কিন্তু সিংহ থাকিতে দিলেন না। তিনি উদ্বেগাকুল কণ্ঠে কহিলেন—চল সুশীলা, আমরাও রাঁচী যাই?

সুশীলা চুপ করিয়া রহিল। একটু পরে সিংহ আবার বলিলেন—আমারও এখানকার কাজ হ'য়ে গেছে। চল, কি বল, যাবে কাল?

সুশীলা বলিল—আমাদের চাকর গেছে আপনার বাড়ী—তার সঙ্গে আপনার দেখা হ'য়েছিল?

প্রীতির

নিদর্শন

সিংহ সাশ্চর্য্যে কহিলেন—আমার বাড়ী—তোমার চাকর? কখন গেছে, বল ত?

বেলা ৯ টার সময় গেছে। এখনও ফেরে নি।

তাহ'লে সে বসে আছে। আমি ত সেই আটটার সময় বেরিয়েছি—নিশ্চয়ই বসে আছে। তুমি পাঠিয়েছ?

হ্যাঁ!—সুশীলা বলি বলি করিয়াও আর কিছু বলিতে পারিল না। সিংহ সাহেবও সে কথা আর তুলিলেন না। পূর্ব্ব প্রসঙ্গই উত্থাপিত হইল। সিংহ কহিলেন—কিন্তু আর দু'টি দিনও নয়, সুশীলা! ক'দিনেই তুমি যে রকম হ'য়ে গেছ, আর এখানে থাক্‌লে শক্ত ব্যামোতে পড়বে যে, কালই যাওয়া যাক্‌।

তখনও সুশীলা বলি বলি করিতেছিল, কেন যে পারিল না কে জানে! দুর্জ্জেয় নারীচরিত্র—চিরদিনই দুর্জ্জেয়।

সিংহ বলিতে লাগিলেন—স্কুলটি ত আমার নতুন নয়। কিন্তু যেদিন থেকে তোমার হাতে ওর ভার পড়েছে, সেইদিন থেকেই নতুন শ্রীতে ভরে উঠেছে। পাড়া গাঁয় তুমি দেখেছ কি সুশীলা, ভাদ্র মাসে চাষীরা ক্ষেতে ক্ষেতে একদিন করে, নৈবিদ্যি নিয়ে গিয়ে, কাঁসার ঘণ্টা বাজিয়ে লক্ষ্মীর পূজা করে আসে, তার পর থেকেই ধানে ধানে ক্ষেত একেবারে ভরে ওঠে, সবুজ রঙ গিয়ে সে কি রঙ যে ফুটে ওঠে, যে দেখেছে, সেই ধন্য হ'য়ে গেছে। আমার স্কুলটিতে যেদিন তুমি সহাস-আননে প্রবেশ করে' সরস্বতীর আরাধনা প্রথম করলে সেই দিনই আমি দেখেছিলাম সুশীলা, তার কি শোভাই না বেড়ে গেল।

একমুহূর্ত্ত থামিয়া আবার বলিলেন—বাস্তবিক সেই অনাথ, পিতৃ-

প্রীতির

নিদর্শন

মাতৃহীন শিশুদের যে তুমি মা হ'য়েছ, তারা সব সময়েই তোমার মুখের দিকে চেয়ে দুঃখে সান্ত্বনা পাচ্ছে, রোগে আরাম পাচ্ছে, তোমাকে পেয়েই তাদের সব সুখ একেবারে কাণায় কাণায় উথলে উঠেছে,—সে ত আমি নিজের চোখেই দেখেছি, নিজেই মনের মধ্যে গাঢ় করে অনুভব করেছি, সুশীলা! তাই এক এক সময়, আমার মনে হয় কি শুভক্ষণেই এই প্রবৃত্তি আমার জেগেছিল, তার চেয়েও কি শুভক্ষণেই তোমাকে পেয়েছিলাম।

সুশীলার পাণ্ডুর মুখখানি রক্তে রাঙা হইয়া উঠিয়াছিল। প্রবল লজ্জা আসিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া তুলিতেছিল, কিন্তু সুশীলার কণ্ঠে এমন শক্তি ছিল না যে সিংহ সাহেবকে থামাইয়া স্থায়।

সিংহ বলিতে লাগিলেন—জিনিষটা গড়েছিলাম আমি, কিন্তু সে'টি আমার চেয়েও তোমার বেশী প্রিয়। সেদিন তুমি বলেছিলে না, সুশীলা, কলেরা হ'চ্ছে বলে যখন আমি স্কুল বন্ধ রাখ্‌তে বলি, যে—আমাদের প্রাণের মূল্য কি এতই বেশী? আজ আমি স্বীকার করছি সুশীলা, সেই অনাথ শিশুদের প্রাণের মূল্য তোমার কাছে, তোমার নিজের প্রাণের চেয়েও বেশী! তুমি যে তা'দের ভালোবেসেছ সুশীলা! তুমি যে তাদের ভালোবেসেছ, এ ত ভালোবাসারই ধর্ম্ম, কাব্যেই রয়েছে—

"Love has no thought of self :
Love sacrifices all things to bless the thing it loves."

——————বাংলাতেও রয়েছে——————

সুশীলা নতনেত্রে চাহিয়া কেবলই ঐ কথাগুলি ভাবিতেছিল; সিংহ সাহেব সাড়া না পাইয়া, সুশীলার ডান হাতটায় টান দিয়া বলিলেন

—তা'দের কথাই তোমার মনে পড়ছে—আমি বুঝতে পারছি। বেশ, চল, সুশীলা। সে'খানেই যাই।

সুশীলা মুখখানা তুলিয়াই জিজ্ঞাসিল—এপিডেমিক কমেছে এখন?

সিংহ সাহেব একটু ভাবিয়া বলিলেন—পশু' পর্য্যন্ত খবর পেয়েছিলাম·········

তাঁহাকে ইতঃস্তত করিতে দেখিয়া সুশীলা বলিল—তখনও ছিল?

হ্যাঁ, তাই, সেই রকমই ত—মনে হয়, হ্যাঁ।

তবে কি করে আপনি যাবেন সেখানে?

তুমি যেতে পার, আর আমি পারি নে। আমার প্রাণের মূল্য কি এতই বেশী সুশীলা? না, সুশীলা, এ প্রাণ এত অমূল্য নয়! অন্ততঃ লর্ড লেটনের ঐ দু'ছত্র কবিতাটা আমার পক্ষেও খাটে।

সুশীলা অন্যদিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। সে-যেন কিছুই শুনে নাই, এমনি ভাবটা।

সিংহ রমণীজনসূচক মৃদু অথচ বেশ ভাবপূর্ণ স্বরে কহিলেন—তাদের কথা ভেবে ভেবেই তোমার শরীর খারাপ হ'য়েছে, সুশীলা। আর কিছু নয়। তোমাকে ত জানি আমি—আজ ত আর নূতন নয়। ঠিক তাই, ঠিক তাই।

সুশীলা আচম্বিতে দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল—রব্বানির দেখা হয় নি আপনার সঙ্গে?

নাঃ।—বলিয়া মিঃ সিংহ পকেট হইতে 'এন্‌গেজমেণ্ট বুক-'টি বাহির করিয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত দেখিতে লাগিলেন। প্রায় দু' মিনিট পরে হড় হড় শব্দে চেয়ারটা সরাইয়া, দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন

প্রীতির

নিদর্শন

—তাই ঠিক রইল, সুশীলা, কাল রাত্রের গাড়ীতে আমি রিজার্ভ করিয়ে রাখব'খন।

ছড়িটা মাটিতে ঠুকিতে ঠুকিতে কহিলেন—আমি এসে তুলে নিয়ে যাব তোমাকে, না নিজেই যাবে তুমি? আমিই নিয়ে যাব—কি বল? এই সাড়ে আট্-টা, এমনি সময়—কেমন?……বেশ্। আমি চলি তাহ'লে?

এই সময় সুনীলা আসিয়া বলিল—চা তৈরী যে, মিঃ সিংহ!

তৈরী নাকি!

বলিতে বলিতে বেয়ারা ট্রে লইয়া দেখা দিল। সুনীলা চা ঢালিয়া সিংহ সাহেবের সামনে ধরিতেই, সিংহ কহিলেন—আমরা কালই রাঁচী যাচ্ছি।

সুশীলা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বলিয়া উঠিল—বাবা নাই………

তা'তে আর হ'য়েছে কি! তুমি ত আর রাঁচী নূতন যাচ্ছ না।—দাও সু, আর এক পেয়ালা খাই।

সুনীলা চা ঢালিয়া দিয়া, সুশীলার জন্যও এক পেয়ালা তৈরী করিতেছিল, সুশীলা বলিল—এখন আমি খাব না, সু।

সুনীলা চলিয়া যাইতেছিল, সুশীলা বাম-হাতে তাহার বস্ত্রপ্রান্ত চাপিয়া ধরিয়া, বলিল—এখন যাওয়া আমার সুবিধে হ'বে না।

মিঃ সিংহ শুনিতে পাইলেন কি-না বলা যায় না, কোন কথাই বলিলেন না। চা'য়ের পেয়ালা নামাইয়া বলিলেন—পাণ কৈ সু?

আপনি পাণ খান, মিঃ সিংহ?—বলিয়া সে বাহিরে যাইতেছিল, সুশীলা তাহাকে বাধা দিয়া কহিল—আমি আনছি সু, তুমি দাঁড়াও।

সিংহ সাহেব নীরবে বসিয়া রহিলেন। সুনীলা অল্পক্ষণ দাঁড়াইয়া

যখন অত্যন্ত অশোভন বোধ করিল, সিংহ সাহেবের অলক্ষিতেই অন্য একটা দ্বার দিয়া ও-পাশের ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

সুশীলা পাণ আনিতেই, সিংহ দাঁড়াইয়া উঠিলেন। টুপিটা তুলিয়া মাথায় পরাইতে পরাইতে কহিলেন—তা' হ'লে চলি?

সুশীলা বলিল—মিঃ সিংহ, আমাকে আপনি মাফ্ করুণ। রাঁচী যাওয়া আমার হ'য়ে উঠ্‌বে না।

সিংহ বলিলেন—কাল হ'য়ে উঠ্‌বে না। তা মঙ্গলবারেই, I mean, পর্শু'ই যাওয়া যাবে।

সুশীলা জড়িতকণ্ঠে কহিল—শুধু কাল পর্শু-ই নয়। রাঁচী যাওয়াই আমার হ'য়ে উঠ্‌বে না।

সিংহ বসিয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ হতভম্বের মত চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন—কি বল্‌ছ সুশীলা?

সুশীলা কম্পিত মৃদুস্বরে কহিল—আমি রব্বানিকে দিয়ে যে চিঠি পাঠিয়েছি, সেইটি আমার কর্ম্মত্যাগ পত্র।

কর্ম্মত্যাগ পত্র? Resignation! তুমি পাঠিয়েছ, সুশীলা?

হ্যাঁ।

সিংহ অনেকক্ষণ কথা কহিলেন না। অবশেষে নিদারুণ দুঃখভার-পীড়িতকণ্ঠে কহিলেন—তুমি যাবে না সুশীলা? তুমি পারবে তোমার সেই অনাথ মেয়েগুলিকে ত্যাগ করতে? উত্তর দাও, সুশীলা, পারবে? আর আমি কোন কথা কইব না। তোমার মুখের এ কথাটি শুনে আমিও চলে যাব। ঐ স্কুল-ফিস্কুল সব উঠিয়ে দিয়ে—যা খুসী তাই করব। বল পারবে? বল হ্যাঁ, কৈ,—বল?

প্রীতির

নিদর্শন

মিঃ সিংহ······

কোন কথা না। তুমি বল, কঠিন, পাষাণ হ'য়ে বল যে, পারব, আমি রাঁচীর সম্পর্ক তুলে দিয়ে, মা-হারা-মরাদের নতুন করে মেরে থাক্‌তে পারব। বল, তারা বাঁচুক, তারা মরুক, আমার কি ? বল সুশীলা বল, চুপ করে রইলে কেন ?—বল, তোমার স্কুল থাক্‌ না থাক্‌, তুমি বাঁচ মর, তোমার মেয়েরা চুলোয় যাক্‌—আমার কি ?

সুশীলা কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল—না, না, ওকি বল্‌ছেন আপনি ?

সিংহ অভিমানভরে কহিলেন—যা বলবার, যা তোমার মনের কথা তাই বলছি। যা তুমি চাও······

ঐ আমার মনের কথা! ঐ আমি চাই?—সুশীলা উন্নত গ্রীবা হংসীর মত ঘাড়টি তুলিতেই, মিঃ সিংহ চেয়ার ছাড়িয়া, সুশীলার পাশটিতে আসিয়া, তাহার পিঠে হাত রাখিয়া বলিলেন—তাই ত বলি সুশীলা! এত কঠিন কি তুমি হ'তে পার? আমি আর জানি না আমার—সুশীলাকে! ও-কি! মুছে ফেল, মুছে ফেল।—বলিয়া স্বয়ং পাৎলুনের পকেট হইতে সুগন্ধযুক্ত রুমালখানি বাহির করিয়া সুশীলার মুখখানি মুছাইয়া দিতে অগ্রসর হইবামাত্র, সুশীলা নিজেই বস্ত্রপ্রান্ত তুলিয়া মুখ চোখ ঢাকিয়া ফেলিল।

ও-কি, আবার কাঁদছ তুমি!—বলিতে বলিতে মিঃ সিংহ জোর করিয়াই দু' হাতে সুশীলার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন—জান সুশীলা, এতে আমার কষ্ট হয়? তোমার এই শুষ্ক সজল মুখ দেখ্‌ছি, আর আমি, আমার ভিতরে কি হ'চ্ছে জান, সুশীলা?

সুশীলা মুখখানি মুক্ত করিয়া লইবার চেষ্টা করিতেই, সিংহ পুনশ্চ

কহিলেন—আবার কাঁদবে! না সুশীলা! তোমার চোখে জল আমি দেখ্‌তে পারব না। যাক্‌—আমি ত জান্তে পেরেছি, তুমি যাবে না, আর সেই প্রস্তাবেই তুমি এত দুঃখ পেয়েছ—আমি চল্লাম সুশীলা। তুমি সুস্থ হও, কেঁদো না। আর আমি তোমাকে অনুরোধ করব না।—গভীর হতাশার সহিত এই কথা কয়টা বলিয়া মিঃ সিংহ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

সুশীলা মুখখানি নামাইয়া লইতেছিল, সিংহ সাহেব স্বরটা আরও খানিক আর্দ্র করিয়া কহিলেন—আমিও যাব না, সুশীলা। আমিও রাঁচী ত্যাগ করব। এর পরে রাঁচী গিয়ে থাকা আমার পক্ষে অসাধ্য হ'য়ে উঠ্‌বে। দুঃখ তা নয় সুশীলা, যে এ'টিকে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে পারলাম না। দুঃখ এই, যে-শিশু অকালেই মরবে, সেই অপটু অক্ষম শিশুকে নিয়েই তার বাপ-মা কত আকাশ কুসুমই না গড়ে। হা রে!

সুশীলা নীরবে বসিয়া রহিল, আর একজন অপলক দৃষ্টিতে, একাগ্র-চিত্তে তাহারই মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া বলিতে লাগিলেন—আমি এইখান থেকেই রাঁচীর হাঙ্গামা সব মিটিয়ে দেব। সেখানে আর আমি যেতে পারব না। প্রথম, বেহার গবর্ণমেন্টকে লিখ্‌ব তারা ভার নেয়, মঙ্গল। না-নেয় যা হ'বার হোক্‌, আমি আর সে ভার বইতে পারব না।

আপনি যাবেন না-কেন, মিঃ সিংহ?

কোন্‌ মুখে যাব সুশীলা? কোন্‌ মুখে আবার আমি সেখানে ঢুকব? যখন সেই সব মাতৃহীন শিশু আমার মুখের পানে চেয়ে করুণস্বরে জিজ্ঞাসা করবে, আমাদের মা কৈ, আমাদের সুশীলা কৈ?—তখন কি বলব আমি তা'দের? কি ব'লে তা'দের সান্ত্বনা দেব? আমি কি পাষাণ হ'য়ে

তাদের বলতে পারব—ওরে অভাগীরা, ওরে মা-হারা বেচারীরা, তোদের মরা মা স্বপ্নে দেখা দিয়ে আবার লুকিয়েছে, আবার তোরা মাতৃহীন হ'য়েছিস! শুনে তারা কি-করবে জান, সুশীলা! তোমারও ত একদিন মা ছিলেন সুশীলা······

সুশীলা দু'হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল—আমি যাব, মিঃ সিংহ। আর—যদি আপনার ইচ্ছা হয়,—কালই যাব।

সিংহ অসীম উল্লাসে স্ফীত হইয়া উঠিলেন, সে ভাবটি গোপন করিয়া তদগত স্বরে কহিলেন—সে আমি জানি, সুশীলা। কোন কারণেই এত বড় দুঃখের বোঝা সে অনাথাদের শিরে তুমি হান্‌তে পার না।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

নীলার 'কব্‌রেজী'।

সিংহ চুপচাপ বসিয়া রহিলেন, আর তাঁহার কোন ব্যস্ততাই দেখা গেল না। সিংহ রাঁচীর প্রসঙ্গও আর উত্থাপন করিলেন না। কৃষ্ণবর্ণের একটি চুরুটে অগ্নিসংযোগ করিয়া জোরে জোরে টানিতে, এবং আস্তে আস্তে ফু ফু করিয়া ধূম ছাড়িতে লাগিলেন।

সুনীলা আসিয়া জিজ্ঞাসিল—আর পাণ দেব, মিঃ সিংহ?

তিনি চুরুট্-টা দেখাইয়া সহাস্যে কহিলেন—না, এর সঙ্গে পাণ চলে না।

সুনীলাও হাসিয়া জিজ্ঞাসিল—চলে না বুঝি?

উহুঁ, একদম অচল!

এই সময়ে সিঁড়িতে পদশব্দ শ্রুত হইল এবং কয়েকমুহূর্ত্তের মধ্যেই ফেণিলার পশ্চাৎ পশ্চাৎ একটি সুদর্শন যুবক আসিয়া বলিয়া উঠিলেন—খগেন বাবু আসেন না, বল্লেন বুঝি? তাঁর বাড়ী এটা নয়? নমস্কার, নমস্কার!

সুনীলা প্রতিনমস্কার করিয়া কহিল—আপনাকে আমরা চিন্তেই পারি নি, মিঃ দত্ত!

যুবক হাসিয়া কহিলেন—এখনও পারলেন না, আমি মিঃ দৎ নই, আমি, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত। বাঙ্গালী—বাঙ্গালী! সে আবার মিষ্টার!

হাঃ হাঃ—তাঁহার উচ্চহাস্যে বারান্দার রেলিং, কড়ি বরগা অবধি যেন কাঁপিয়া উঠিল।

ফেণিলা একখানা চেয়ার অগ্রসর করিয়া দিয়া কহিল—বসুন।

বীরদৎ হাসিয়া বলিলেন—ধন্যবাদ। বসব না। হ্যাঁ কি বল্লেন, খগেন বাবুর খবরটা? ক'দিন মাঠেও ত তাঁকে দেখলুম না!

বীরদৎ ফেণিলাকেই প্রশ্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু ফেণিলা উত্তর দিল না; দিলেন মিঃ সিংহ। বলিলেন—তিনি এখন থার্ড এন্‌ক্লোজারে যান,—কাবলীওয়ালার কাছে টাকা ধার করে' খেলেন।

বীরদৎ ফেণিলার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই বলিলেন—কেন? তাঁর ত বেশ্ মোটা-মুটি জিতই ছিল। হঠাৎ...

সিংহ বলিয়া উঠিলেন—বলেন কেন আর!

কিন্তু তিনি অধিকদূর অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই, সুশীলা কহিল—আমরা তাঁর খবর ঠিক জানি-না মিঃ,—বীরেন বাবু।

বীরদৎ বলিলেন—ও। আচ্ছা,—থার্ড এন্‌ক্লোজারে যান ত তিনি। খোঁজ করে নেব'খন আমি।...আপনাদের বড় বিরক্ত করলুম বোধ হয়, মাফ্ করবেন। এইখান দিয়েই যাচ্ছিলুম—আমার এক বন্ধুর বাড়ী, হঠাৎ রাস্তাটা আর নম্বরটা মনে পড়ে গেল। আমিও জানতুম না, খগেন বাবুর বাড়ী এটা নয়—তিনি আমায় সে কথা বলেন নি।

সুনীলা কহিল—আপনি আসায় আমরা আনন্দিতই হয়েছি বীরেন বাবু!

ধন্যবাদ!—নমস্কার!—বীরদৎ চলিতে আরম্ভ করিলেন। মিঃ সিংহ দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিলেন—একটু বসবেন না?

না—বলিয়া বীরদৎ নামিয়া গেলেন। সিংহ সঙ্গে সঙ্গে রাস্তা পর্য্যন্ত আসিয়া কহিলেন আপনি একটু বসলেন না, ওঁরা বড়ই দুঃখিত হ'য়েছেন। আপনার সঙ্গে বসে ওঁরা একটু গল্পগুজব করতে চান।

বীরদৎ হাসিয়া বলিলেন—কিন্তু আমি যে তা পারি না। বাঙ্গালীর বাড়ীতে, বাঙ্গালীর মেয়েরা চেয়ার টেব্‌ল সাজিয়ে বসে 'মিটিং করার' মত গল্প গুজব করবে, এ'ও যেমন অসহ্য, বাঙ্গালীর বাড়ীতে বাঙ্গালী কোট্ প্যাৎলুন এঁটে, সাহেবীয়ানা করবে, এ'ও তেমনি আমি দেখ্‌তে পারি না। ন'বছর আমি বিলেতে ছিলুম, এই ন'বছরের মধ্যে এমন একটা রাতও কাটে নি আমার, যেদিন-না-আমি, নিজের ঘরটি বাংলা মনে ক'রে', বাঙ্গালী কাপড় পরে' পুরোমাত্রায় বাঙ্গালী হ'য়ে, বাংলার কথাই না ভেবেছি। আমি পারি না ঐ সব এঁটে সেঁটে, টুপি চড়িয়ে, বাঙ্গালীর চৌকাঠ পার হ'তে! মাথা কাটা যায় আমার।—থাক্—নমস্কার!

তাঁহার মিনার্ভা কারখানি ফটকের পার্শ্বেই ছিল, তাহাতে উঠিয়া বসিতেই, সিংহ জিজ্ঞাসিলেন--নতুন মডেল দেখ্‌ছি। কতদিন হ'ল?

মাস ছ'য়েক।

আমারও ঐ রোলস্ রয়েস খানা মাস আষ্টেক কিন্‌লাম—ঐ যে, আগের চেয়ে অনেক ইম্প্রুভ্ করেছে।

বীরদৎ হাসিয়া সোফেয়ারকে ষ্টার্ট দিতে কহিলেন।

সিংহ উপরে উঠিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—ন'বছর বিলেতে ছিলেন! তবে আর কি, মাথাটা কিনে বসে আছেন! এই জন্যেই বিলেত ফেরতদের আমি দু'চক্ষে দেখ্‌তে পারি না। গুমোরে

মাটিতে আর ওঁদের পা পড়তেই চায় না। এক একটি লর্ড-ক্রু আর কি! হুঁ!

হঠাৎ সিংহ সাহেবের এ-হেন বিরক্তির কারণ কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না, সকলেই সবিস্ময়ে চাহিয়া আছে দেখিয়া, সিংহ বিকৃতস্বরে বলিতে লাগিলেন—কাজ ত জকি, তার আবার এত গর্ব্ব কিসের! ওঃ—কাপড় পরে এসেছেন, তারই গর্ব্ব কত। আমরা ইংরেজী কাপড় পরি, টেব্‌ল, চেয়ারে বসে গল্প গুজব করি—এ আর ওঁর সহ্য হ'ল না। ভারী গর্ব্বের জিনিষ কি-না! আরে বাপু, কাপড় পরবি নে ত পরবি কি! টাই কিন্‌তে আর প্যান্ট ইস্তিরী করাতেই যে ফেল্ হ'য়ে যাবি।

ফেণিলা জিজ্ঞাসিল—তাই বুঝি আপনার টাই টুপি দেখিয়ে বলছিলেন, উনি?

হ্যাঁগো! সে গুমোর কি! বল্লে, বাঙ্গালীর বাড়ীতে ইংরেজী কাপড় পরে ঢুক্‌তে মাথা কাটা যায়! আরে, তা ত যাবেই! ঐ ত জকির মাথা, কাটা যাবে না ত, হবে কি!

না মিষ্টার সিংহ! সে গর্ব্ব করবার অধিকার একমাত্র ওঁরই আছে, খদ্দর কাপড়, খদ্দরের জামা, খদ্দরের চাদর পরে নিজের মিনার্ভা কার থেকে নেমে ভদ্রলোকের বাড়ী ঢুক্‌তে উনিই পারেন, আপনি পারবেন না,—তা'তে আপনার মাথা কাটা যাবে।

যাবেই ত নীলা! ভদ্রলোকের বাড়ী যাওয়া কি বল্‌ছ—আমার চাকর বাকর খদ্দর পরলে, আমার সামনে তা'দের আস্‌তে দেব না আমি। ও ত ভিখিরীতে পরে।

ফেণিলা উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল—ঠিক বলেছেন আপনি ভিখিরীতেই

পরে। এ যে ভিখিরীর দেশ ঘনশ্যাম বাবু, এ-দেশে ভিখিরী নয় কে? সবাই ভিখিরী, তবে তফাৎ এই, কতক ভিখিরীর আত্মসম্মান টুকু আছে, অনেকেরই যা নেই।

সিংহও উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু সাধারণতঃ, স্থূলতা হেতু তাঁহার উত্তেজনা সকল সময়ে প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বে তিনি নিজেই গলদঘর্ম্ম হইয়া পড়িতেন। কোন মতে, হাঁফাইতে হাঁফাইতে কহিলেন বেশ, সবাই না-হয় ভিখিরীই হো'ল, আত্মসম্মান ফম্মান যা বলছেন তা'ও যেন নেই, কিন্তু এই যে আপনারা বসে গল্পগুজব করছেন—কি অপরাধ হ'য়েছে এতে—শুনি? উনি যে নাক সিঁটকে, সিকেয় তুলে বল্লেন—অসহ্য, অসহ্য, কেন অসহ্য, কি-সে অসহ্য?—বলুন-না?

আমি আর কি বলব ঘনশ্যাম বাবু! যে প্রশ্ন আমাকে করলেন, তার উত্তর আপনি ত নিজেই এই মাত্র দিলেন।

কি আবার উত্তর দিলাম আমি?

আমরা যে ভিখিরী, এ-ত আপনি স্বীকার করেছেন?

হ্যাঁ, তার হ'য়েছে কি?

ভিখিরীর মেয়ে, ভিখিরীর বোন্, ভিখিরীর স্ত্রী—টেবল্ চেয়ার সাজিয়ে বসলে, কার চোখে এ অশোভন না ঠেকবে, ঘনশ্যাম বাবু!

সিংহ সাহেব বিরক্তিসূচকস্বরে কহিলেন—নীলা, আমি মিঃ সিংহ বলেই সর্ব্বত্র পরিচিত।

তা জানি ঘনশ্যাম বাবু! কিন্তু কেন? কি অপরাধ করেছে বেচারা-বাঙ্গালীর নামটুকু—বলুন ত! আপনি বিলেতও যান নি, দশবিশ বছর বিলেতে বাস ক'রে সাহেব হ'য়েও আসেন নি—কি ক্ষতি

হ'য়েছে ঐ বাঙ্গালীর নামটিতে !—ফেণিলা একমুহূর্ত্ত থামিয়া, সহাসনেত্রে চাহিয়া কহিল—আর দেখলেন ত, আপনার সামনেই উনি, বিলাত ফেরৎ ত বটেই, সাহেব মহলে সুপরিচিত, সে'ও—নিশ্চয়ই—নিজের নামটি কেমন বল্লেন।

সিংহ গর্জ্জন করিয়া বলিলেন—সাহেব মহলে পরিচিত? কে বল্লেছে তোমাদের? অশ্বডিম্ব পরিচিত! কে চেনে ও'কে? আর বিলেত যাওয়া, বিলেত বাস বাস—করছ, অমন কত চাঁটগেঁয়ে মুসলমান মাঝি মোল্লা জাহাজের নোঙর টেনে বিলেত যায়, বাস ক'রে আসে। ঐ ঘোড়দৌড়ের মাঠেই খাতির, তা'ও যদি বাজী জেতায়, নইলে সাহেব মহলে, ঐ আস্তাবলের সহিস ও-যা, রেশের জকিও তাই!

ফেণিলা বঙ্কিম দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল—ঠিক তা নয়, ঘনশ্যাম বাবু! তার উপুরে! দেখ্‌বেন—বলিয়া সে উঠিয়া গেল, দশ'সেকেণ্ডের মধ্যেই বাঁধান উইণ্ডসর-খানি আনিয়া, পাতা উল্টাইয়া একটা স্থান খুলিয়া বলিল—দেখেছেন, হিজ্ ম্যাজেষ্টী দি কিং এণ্ড মিঃ বীরদৎ, এ্যাট এন্ ইভনিঙ পার্টি ইন্ দি ক্যাস্‌ল।—দেখুন দেখি, চিন্তে পারেন কাউকে?

সুশীলা জিজ্ঞাসিল—'উইণ্ডসর' কার?

ফেণিলা বলিল—খগেন বাবু এনেছিলেন, বয়েজ ওন্ লাইব্রেরী থেকে।—সিংহের দিকে ফিরিয়া কহিল—কিছু বুঝলেন? ইনি আমাদের সম্রাট, আর সম্রাট যাঁর সঙ্গে সেকৃহ্যাণ্ড করছেন—তিনি এই অল্পকালপূর্ব্বে দৃষ্ট শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত। আর এঁরা হ'লেন, আর সব বড় বড় খেলোয়াড়। বুঝেছেন কি, ঠিক আস্তাবলের সহিস নয়?

সিংহ সাহেব হটিবার পাত্র নন। কহিলেন—এই যে বিলেত দেশটা,

প্রীতি নিদর্শন

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রীতি সম্মিলন।

শনিবার। কলকাতার গড়ের মাঠে ঘোড়দৌড় চলিতেছে। দু'নম্বর [illegible]ক্লোজারের গ্যালারীর নিম্নে দাঁড়াইয়া বীরদৎ রেশ্‌ দেখিতেছিল। [illegible]র পরিধানে ইংরাজী বেশ, মুখে হাভানা চুরুট, হাতে অপেরা গ্লা[illegible]। নাসিকা-নিবদ্ধ চশমার ল্যাজটি বুকের সামনে বটের ঝুরির মত [illegible]লিতেছিল।

[illegible]হারা নিয়মিত ঘোড়দৌড়ে যান এবং হোম্‌-রেকর্ডস্‌ যাঁহারা অবগত আছেন, বীরদৎ তাঁহাদের নিকট অত্যন্ত সুপরিচিত, অতিশয় প্রিয়। ইনি বিলাতে থাকিতে বড় বড় ঘোড়দৌড়ে 'জকির' কাজ করিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি দেশে ফিরিয়াছেন, ইচ্ছাটা এখন স্বদেশেই বসবাস করেন। ইঁহার পুরানামটি বীরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, কিন্তু বিলাতে সাহেব-মেমেরা তাঁহার নামকরণ করিয়াছিল, বীরদৎ! বীরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত বলিলে কলকাতার কাঠখোলার দত্তমহাশয়গণ তাঁহাকে চিনিতে পারিতেন সন্দেহ নাই, কিন্তু বীরদৎ না বলিলে আসল লোকটিকে

চিনিবার কোনও উপায় ছিল না। বীরদৎ নয় বৎসর বিলাতে ছিলেন। উনিশ বৎসর বয়সে তাঁহার জনক (এখন স্বর্গীয়) বটকৃষ্ণ দত্ত মহাশয় ছেলেকে ব্যারিষ্টারী পড়িতে বিলাতে পাঠাইয়াছিলেন। বীরদৎ ব্যারিষ্টারী পড়িবার জন্য অনেক টাকা আনিয়াছিলেন কিন্তু কোথাও ভর্তি হইবার পূর্ব্বেই দেখা গেল যে কয়েকটা ঘোড়া কিনিয়া ফেলায় ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকা প্রায় নিঃশেষ হইয়াছে এবং আস্তাবল ভাড়া ও সাজসরঞ্জাম কিনিতে তখনও অনেক টাকার দরকার। বটকৃষ্ণ দত্তমহাশয় নিরীহ গোছের জমিদার। একটু আধটু লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন, কিন্তু বিলাত দেশটা তাঁহার চোখে প্রায় মেঘ আর গিরির মতই ছিল। ছেলে যখন লিখিল, ব্যারিষ্টারী করিবার সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত, কেবলমাত্র 'ইনে' ভর্ত্তি হইবার ও একটা বিরাট গোছের ভোজ দিবার অর্থের জন্যই হইতেছে না. তখন বটকৃষ্ণ দত্তমহাশয় বেশ ভারী রকমের একটা চেক কাটিয়া পত্র লিখিলেন, ভোজটা খুব ভালো করিয়া দিবে। শুনিয়াছি সে দেশের লোক, আমাদের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের অনুরূপ। তাঁহারা ভোজনে সন্তুষ্ট হইয়া বর প্রদান করিলে তুমি খুব বড় কৌঁসুলী হইয়া আসিতে পারিবে। যথাসময়ে ড্রাফ্‌ট ও পিতার লিখিত পত্র বীরদত্তের হস্তগত হইল। এবং বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেল যে 'ইনের' পথেই টাকাটা কয়েকজন আস্তাবলওয়ালা খুব জোরে করমর্দ্দন করিয়া একরকম কাড়িয়া কুড়িয়া লইয়াছে। কাজেই কৌঁসুলী পথের একমাত্র লৌহদ্বার যেমন বন্ধ ছিল, তেমনি রহিল ; কেবলমাত্র বটকৃষ্ণ দত্ত সংবাদ পাইলেন পুত্রের শারীরিক মানসিক উভয়তঃ মঙ্গল। কৌঁসুলী কলেজের পড়া- পড়া উত্তমরূপেই চলিতেছে। তবে এবছর এখানে ফসল উৎপন্ন না

হওয়ায় (যুদ্ধে পুরুষ চাষী সব মরিয়াছে এখন স্ত্রীলোকেই চাষবাস করে, কাজেই শস্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় নাই) সমস্ত জিনিষই মহার্ঘ্য ! একটা সাবানের দাম, দুই পৌণ্ড ; একটা টুথ্ পেস্ট কিনিতে হয়, দেড় পৌণ্ডে ; সেদিন একটা গার্লকে উপহার দিতে একছড়া পার্ল নেক্‌লেট্ কিনিতে বত্রিশ পৌণ্ড পড়িয়া গেল। অথচ না দিলেও উপায় ছিল না—গার্লটি আমার এক প্রোফেসর (শিক্ষক) এর ওন্‌লি চাইল্ড ! কাজেই মাসে মাসে যে টাকা আসে তাহার দুইগুণ না পাঠাইলে চলিবার উপায় নাই।......টুথ্ পেস্ট কি দামে বিকায় জানি না, তবে পার্ল নেকলেটটা সত্যই বত্রিশ পৌণ্ডে ক্রয় করিতে হইয়াছিল, এবং সত্য সত্যই সে'টি থমাস্ নামক জনৈক অশ্বশিক্ষকের একমাত্র কন্যা লীলার কণ্ঠে পরাইয়া দিয়া বীরদৎ মেয়েটির লজ্জাজড়িত গণ্ডে একটা চুম্বন করিয়া ফেলিয়াছিল।

দেশ হইতে ক্রমাগত তাগিদ আসে—বীরদৎ উত্তর দেয়, গতবারে ফেল্ করিয়া বড়ই মনস্তাপ পাইয়াছি। এ বৎসর অত্যন্ত পরিশ্রম করিতে হইতেছে। আপনাদের সময় মত পত্রাদি দিতে পারি না, মাপ করিবেন। বটকৃষ্ণ দত্ত সর্ব্বান্তঃকরণে মার্জ্জনা ত করিলেনই ; পুত্রটি যাহাতে অত্যধিক পরিশ্রম করিয়া শরীরপাত না করে সে বিষয়ে নানা উপদেশ দিয়া পত্র লিখিলেন। উপর্য্যুপরি আট বৎসর এই রকমেই কাটিল, নবম বৎসরের মাঝামাঝি সময়ে মিঃ জে, এন্ রায়ের পুত্র জ্যোৎস্না রায় বিলাত হইতে আসিয়া বিলাতে ডারবী খেলায় বাঙ্গালী যুবকের অসাধারণ কৃতীত্ব দেখাইয়া ক্রমাগত 'ষ্টেট্‌স্ম্যানে' দীর্ঘ পত্র লিখিতে লাগিল। এবং বাঙ্গালা সংবাদপত্রের মাননীয় সম্পাদকগণ স্বদেশ-প্রেম-বিগলিত লেখনীমুখে স্বদেশ-প্রেমের কালিতে সেই বঙ্গীয় যুবক জকিকে একেবারে ষোড়শোপচারে

পূজা করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলেন। দত্তজা বৈকালিক নিদ্রাভঙ্গে গুড়গুড়ি টানিতে টানিতে নিত্য নিয়মিত বাঙ্গালা সংবাদপত্র পাঠ করিতেন। তাঁহার চশমার কাঁচ ঝাপসা হইয়া গেল—চশমা খুলিয়া কাগজখানা নাসিকা সন্নিকটে ধরিয়া দত্তজা পাঠ করিলেন।......বীরদৎ আমাদের কাঠখোলার জমিদার শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ দত্ত-মহাশয়ের একমাত্র পুত্র বীরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত। আমরা শুনিয়াছি......দত্তজা কাগজখানা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন—শুনিয়াছি! গোষ্টীর মাথা শুনিয়াছি! চীৎকার শুনিয়া ভৃত্য ফেলারাম সসব্যস্তে আসিয়া কাগজখানা তুলিয়া দিতে গিয়া এমন চপেটাঘাত প্রাপ্ত হইল যে বেচারা সেখানেই মাটিতে পড়িয়া, আধঘণ্টা গোঁয়াইয়া, অতিকষ্টে বারবার সরকার মহাশয়কে কটিদেশ দেখাইয়া, মাহিনাপত্র চুকাইয়া লইয়া, সেই রাত্রের গাড়ীতে জন্মভূমি বাঁকুড়াভিমুখে প্রস্থান করিল।

দত্তজা বিপত্নীক, গৃহে বিধবা কন্যা নীরজা ছাড়া আর কেহই নাই। দত্তজা নীরজাকে অনেক ভৎসনা করিলেন; পাড়ার ছোকরার দল গো-রক্ষা সমিতির চাঁদা আদায় করিতে আসিয়া, অখাদ্য খাইয়া পলায়ন করিল; মোটরগাড়ী-চালক কৃষ্ণরাম বন্দ্যোপাধ্যায় পেট্রল চুরীর অপরাধে জোড়াবাগানের থানায় প্রেরিত হইল, ইত্যাদি ইত্যাদি। এবং এতগুলি সাধু ভদ্রমণ্ডলীর কল্যাণ কামনার প্রাবল্যে সেই রাত্রেই দত্তজার প্রবল জ্বর আসিল, সাতদিনের দিন ভোরে দত্তজা ইহলোক ত্যাগ করিলেন।

বীরদৎ টেলিগ্রাম পাইয়াছিল, দেরীতে। সে তখন ইংলণ্ডে ছিল না—সহরতলীতে কিছুদিনের জন্য থমাস্ পরিবারের মধ্যে বাস

করিতেছিল। লণ্ডনে তাহার বাসার লোক থমাসের ঠিকানা জানিত না। বীরদৎ কাহাকেও বলিয়া যায় নাই, কেবলমাত্র তাহার ব্যাঙ্কার্সদের উপর হুকুম দেওয়া ছিল, চিঠিপত্র আসিলে, জমা রাখিতে এবং যখন যেখান হইতে চাহিব সেখানেই পাঠাইয়া দিতে। পোষ্টাফিসের কর্ত্তাদের জানাইয়া রাখিয়াছিল, অমুক ব্যাঙ্কে আমার পত্রাদি পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। পিতার মৃত্যু সংবাদ-বহ তারখানিও কর্ত্তারা ব্যাঙ্কে পাঠাইয়া বাধিত করিলেন; বীরদত্তের হাজার চিঠিপত্রের মধ্যে এখানিও জমা রাখিয়া ব্যাঙ্ক সুদ কষিতে মন দিল।

মাস দেড়েক পরে টাকার দরকার হওয়ায় ব্যাঙ্কে ঠিকানা পৌঁছিল। ব্যাঙ্ক রেজেষ্টি করিয়া টাকা আর রাশীকৃত কাগজপত্র পাঠাইয়া দিল। বীরদৎ তার খুলিয়াই পিতার মৃত্যু সংবাদে স্তম্ভিত হইয়া গেল।

বীরদৎ আস্তাবল তুলিয়া, অনেকগুলি ঘোড়া বেচিয়া, কেবলমাত্র দু'একটি ভারতের পথে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, সে দেশের চালচুলা উঠাইয়া, 'নর্ম্মদা' জাহাজে উঠিয়া বসিল।

মাস তিনেক আগে সে কলিকাতায় আসিয়াছে!

বীরদত্তের ঠিক পাশেই তিনটি বঙ্গীয় যুবতী এক কৃশকায় যুবকের সমভিব্যাহারে দাঁড়াইয়া ঘোড়দৌড় দেখিতেছিল। বীরদৎ এতক্ষণ যুবতীদের কাহাকেও দেখে নাই—ভালো করিয়া দেখে নাই। হঠাৎ বামাকণ্ঠে সে যেই শুনিল, আর আমি খেলব না। আমার প্রাইজের টাকাগুলো পর্য্যন্ত গেল—বীরদৎ মুখ ফিরাইয়া সর্ব্বপ্রথম তাহাকেই দেখিয়া লইল। মেয়েটি কাঁদ কাঁদ মুখে, ছলছল চোখে মাঠের দিকে

চাহিয়া আছে। এক মিনিট, তাহার পরেই বীরদৎ অপেরাগ্লাস্ চোখে দিয়া দূরের জিনিষ দেখিতে লাগিল।

পুনরায় শুনিল, আমি ত আস্তে চাইনি—সকলে মিলে, হ্যাঁ……

আর একজন কে বলিল—তুই ত আর একলা হারিস নি নীলা? আমার চারশো টাকা গেচে, দিদির ত কথাই নেই, গরীব খগেন বাবুর সত্তর আশি টাকা গেচে, সিঙ্গীসাহেবের কম করে হাজার খানেক ত গেচেই,—এখনও তিনটে রেশ বাকী। এইবারটি ধর, হার উঠে যাবে।

বীরদৎ হাসিল। এদিকে চাহিয়া নয়,—অন্যদিকে মুখ করিয়া। এমনি হার তুলিতে গিয়াই লোকে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যায়, সে এই কথা কয়টিই ভাবিতেছিল।

এই সময়ে খুব মোটা সোটা একটি জালা-বিশেষ ভদ্রলোক হাঁফাইতে হাঁফাইতে আসিয়া অতি নিম্নস্বরে বলিলেন—শুন্ছেন, এত হারে কি আর বাড়ী ফেরা যায়? দেখ্লেন ত, থার্ড রেশটায় সেই লোকটা সারউড্ বেল ধরে তিনটি হাজার টাকা গুনে নিলে। আমাদেরও একটা মিললে……

মেয়েটি বলিল—হেরে হেরে কি ভালো লাগে? আমি আর খেল্তে চাইনে, খেলব না।

অন্য মেয়েটি বলিল—তুই না খেল্লে……

অপরা সমর্থন করিয়া কহিল—আমরাও……

কৃশকায় যুবকটি কহিল—আমি ত নিশ্চয়ই না!

মোটা লোকটি বলিলেন—এই বাজীটা খেলুন। আপনার জন্যে এঁরা সবাই খেল্তে পাচ্ছেন না।

কেন, আমি কি খেল্‌তে বারণ করছি ওঁদের? আমি শুধু খেলব না—তাই বল্‌ছি।

মোটা লোকটি কহিলেন—ক্যাপ্টেন লি-র খবর! আমি ত হাজার টাকা দিলাম ধরে। আপনারা?

বীরদৎ মুখ ফিরাইয়া একবারমাত্র লোকটিকে দেখিয়া লইল। মনে মনে কহিল, কথা কহিল কে? আমি ত মাটির উপরেই একটি ঢুপি দেখছি।

বড় মেয়েটি রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসিলেন—কত নম্বর ধরলেন?

বীরদৎ আর একটু হাসিল,—"১২নং"—অশ্বের নাম, জন্ট!

মোটা লোকটি বলিতেছিলেন, অপ্‌ সেট নিশ্চয়! আমি ওদিকে আছি, আপনারা কিন্তু দেরী করবেন না।—তিনি প্রস্থানোদ্যত হইবামাত্র বড় মেয়েটি বলিলেন—মিঃ সিংহ আমাদের কিছু টাকা দিতে পারেন?

নিশ্চয়ই পারি। কত?

তিন বোনে—তিনশ হ'লেই হ'বে।

ভদ্রলোক তিনখানি নোট্‌ যুবতীর হাতে দিয়া অন্যদিকে চলিয়া যাইতেই ছোট মেয়েটি খগেনকে জিজ্ঞাসিল—আপনি?

খগেন নিম্নকণ্ঠে কহিল—আমার টাকা নেই।

নিলেন না কেন? ডাক্‌ব?

না—না—থাক্‌।

মিঃ সিংহ! মিঃ......

সিংহ সাহেব ফিরিলেন, প্রস্তাব শুনিয়া বলিলেন -আমার কাছে খুচরো টাকা ত নেই, নীলা!

খগেন কুণ্ঠায় এতটুকু হইয়া বলিল—থাক্—থাক্।

ফেণিলা বলিল—আমার থেকে আপনি দশ টাকা নিন্, খগেন বাবু!

তাহার আগ্রহাতিশয্যে খগেন সম্মত হইল। তখন বারো নম্বরটিতে তিন বোনের পঞ্চান্নখানা উইন-প্লেস্, এবং খগেনের জন্য দুইখানি কেবল-মাত্র প্লেস্ খেলিবার টাকা সুশীলা খগেনের হাতে দিয়া কহিলেন—দেরী ক'রনা খগেন, ক্লোজিং বেল্ বাজচে!

খগেন ছুটিয়া যাইবে, বীরদৎ তাহার হাতটা ধরিয়া বলিল—দেখুন, আপনার অনেক টাকা হার হ'য়েচে, আপনি জণ্টকে না ধরে' মেরীকে উইনে দশটাকা লাগিয়ে দিয়ে আসুন।—বলিয়া সে বোর্ডের দিকে চাহিয়া মনে মনে হিসাব করিয়া পুনরায় বলিল—ওয়ান-টু টোয়েণ্টি ত বটেই, বেশীও হ'তে পারে।

খগেন মেয়েদের দিকে চাহিতেই সুশীলা বলিলেন—লুক সার্প, খগেন।

খগেন চলিয়া গেল।

জণ্ট কোথায় যে পড়িয়া রহিল, তাহার ঠিকানা-ও নাই। খগেন দশমিনিটের মধ্যে তিনশো ছ' টাকা পেমেণ্ট লইয়া ফিরিয়া আসিল। বীরদৎ ধন্যবাদ পাইয়া বলিল—আপনার হার উঠেছে?

খগেন্দ্র আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়া যেন শেষ করিতে পারিতেছিল না. বীরদৎ বলিল—এবার ঐ তিনশ লাগিয়ে দিন্—পাঁচে। ওয়ান্-টু—ফরটি! পাঁচ ফারলঙের ঘোড়া এভ্রী চান্স—একমাইল দু' ফারলঙে ছুটবে, কেউ ধরচে না।

খগেন জিজ্ঞাসিল—তিনশ' ধরব?

বেশী পারেন, আরো ভালো। আমরা বিশহাজার ধরেছি।—বলিয়া

বীরদৎ তাহার পার্শের লোকটিকে বায়নাকুলার ও খাতাপেন্সিল যাহা ছিল দিয়া, খগেনকে বলিল—আধঘণ্টা পরে আস্‌চি আমি।

ফেণিলা বলিল—খগেন বাবু, আপনার বেশ বরাত।

খগেন বলিল—ঐ ভদ্রলোক!

বিশুষ্কমুখে মোটা লোকটি আসিয়া কহিলেন—সব জুচ্চুরী, সব জুচ্চুরী! মেরী আবার একটা ঘোড়া, হুঁ!

ফেণিলা বলিল—আপনার কাপ্তেন কি বল্লে?

সিংহ সে কথার জবাব না দিয়াই জিজ্ঞাসিলেন—তুমি পে-মেণ্ট আন্‌তে যাচ্ছিলে—কার হে?

ফেণিলা বলিল—উনি ত মেরী ধরেছিলেন; তিনশ ছ' টাকা পেয়েছেন।

সিংহের থাবা মাটিতে বসিয়া গেল, কহিলেন—বল কি! অ্যাঁ!

ফেণিলা বলিল—এবারে কি খেল্‌বেন মিঃ সিংহ?

অপ্রসন্নমুখে মিঃ সিংহ—দেখি—বলিয়া বোর্ডে জকিদের নাম নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

ইতোমধ্যে খগেন ফেণিলাকে এভ্‌রী চান্সের কথা বলিয়াছিল। ফেণিলা মেজ বোনকে বলিল,—মেঝ, এবার এভ্‌রী চান্সকে ধরি আয়।

সুনীলা ইতঃস্তত করিয়া বলিল—আবার ধার নেব?

খগেন বলিল—এই তিনশ' টাকায় চারজনের খেলা চল্‌তে পারে।

বড় মেয়েটি নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন—তার মানে?

খগেন আর কথা কহিল না। মেজ মেয়েটি বলিল—নীলা, আপনি আর আমি—তিনশ' টাকায় তিনজনের সমান ভাগ রইল। যান্ খগেন

বাবু, আপনি টিকিট আসুন। ফেণিলা বলিল—দিদির ভাবনা কি?—বাড়ার ভাগ একটি ইঙ্গিতও করিল।

মিঃ সিংহ জিজ্ঞাসিলেন—কি ধরছ, নীলা?

ফেণিলা কটাক্ষ করিয়া কহিল—আমাদের ত আর কাপ্তেন-মেজর-লেফেটনাণ্টএর টিপ্ নয়, শুনে কি করবেন বলুন মিঃ সিংহ! বরঞ্চ আপনি কি খেল্ছেন—বলুন—শুনে নিই।

বড় মেয়েটির দিকে চাহিয়া মিঃ সিংহ কহিলেন—সুশীলা, আমি কুইন্ অ্যানিকে ব্যাক্ করব।

সুশীলা বলিলেন—আমার জন্যেও পাঁচটা উইন, পাঁচটা প্লেস ধরবেন।

আচ্ছা, বলিয়া মিঃ সিংহ চলিয়া যাইতেই সুশীলা সুনীলাকে কহিল—এভ্রী চান্স পাঁচ ফার্লঙের ঘোড়া, আর একটি দিন মোটে হোম-রেকর্ডসে উইণ করেছিল—বুঝলি সু? এখানে এই একমাইলের ওপরে তা'কে কিছু করতে হ'চ্ছে না। এ তুই দেখে নিস। গরীব ছোঁড়াটার কতকগুলো টাকার শ্রাদ্ধ হ'বে'খন।

ফেণিলা একটুখানি শ্লেষের সহিত কহিল—গরীব ছোঁড়া ত পরের টাকায় খেলেনি দিদি!

মেজমেয়ে সুনীলা নীলার হাতটি ধরিয়া ঈষৎ টান মারিয়া বলিল—আঃ নীলা, ঝগড়া করিস কেন?

মিঃ সিংহ আর খগেন আর্সুলো কাঁচপোকার মত ফিরিয়া আসিলেন। মিঃ সিংহ সুশীলাকে সাক্ষী রাখিয়া কহিলেন—এইবার আপনাদের খগেন বাবু কাৎ! তিনশ' টাকা ব্যাক্ করেছেন—পাঁচ ফার্লঙের ঘোড়া এভ্রী চান্সকে। ছ্যোঃ ছ্যোঃ!

সুশীলা সহাস্যে কহিলেন—কে ওঁকে টিপ্‌ বলে দিয়েছে। মেরীর টিপ্‌-ও নাকি সেই বলে দিয়েছিল!

সিংহ খগেনের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসিলেন—কে-হে?

তা জানিনে।

আকাশবাণী শুন্তে পেয়েছ?

তাই হ'বে বোধ হয়—বলিয়া সুশীলা তাহার কনিষ্ঠা দুইটি বোনের দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিতে লাগিলেন।

সিংহ পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন—বলই না-হে! মক্কেলটা কে—শুনি?

বল্লুম ত—জানিনে!

সিংহ সাহেব ভ্রুকুটি করিয়া কহিলেন—বল্‌বে না—তাই বল!

সুশীলা মাঠের পানে চাহিয়া বলিল—সু, ঐ দেখ ঘোড়া বেরিয়েচে।

ফেণিলা সোৎসাহে বলিল—দেখনা-দিদি, ড্রেসটা কি পাঁচের?

সুশীলা বহি দেখিয়া বলিল—ব্ল্যাক, রেড স্লিভ্‌স, ও ক্যাপ্‌। ঐ, ঐ, পাঁচ। জকি হচ্চে বীরদৎ। হিন্দুস্থানী হ'বে বোধ করি, না-রে?

সত্য কথা বলিতে কি খগেন্দ্রকে বিদ্রূপ করিলেও তাহার মনে একটা সন্দেহ জন্মিয়াছিল।

খগেন সকলকে ছাড়িয়া রেলিঙের ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। খানিক পরে ঘোড়াগুলিকে আর দেখা গেল না; তখনি ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজিতেই ঘোড়ার দল অতি দূরে গর গর শব্দ করিয়া ছুটিতে লাগিল। গ্যালারীর উপর হইতে ঘন ঘন চীৎকার উঠিতেছে। কত লোকে যে

কত নাম করিতেছে, কত উৎসাহ দিতেছে—তাহার ঠিক নাই। হঠাৎ সব উল্লাস-চীৎকার নীরব হইয়া নম্বর উঠিল—পাঁচ।

খগেন ডাকিল—নীলা!

ফেণিলা সোল্লাসে বোর্ডটার দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসিল—কত পাব খগেন বাবু?

পঞ্চাশ-টি বিক্রী—বলিয়া খগেন কাউণ্টারের নিকট চলিয়া গেল। ফেণিলা সুশীলার কাছে আসিয়া বলিল—ছোঁড়া অনেক টাকা মেরে দিয়েছে, দিদি!

সুশীলা মুখ ভার করিয়া বলিল - বেশ ত!

ফেণিলা আর একটু খোঁচা তুলিয়া বলিল—সিঙ্গীসাহেব পে-মেণ্ট নিতে গেছেন বুঝি?

সিংহ সাহেব শেষের বাজার জকির নাম প্রোগ্রামে মিলাইয়া লইতেছিলেন, ফেণিলাও যে দেখিতে পায় নাই, তাহা নহে।

খগেন প্রাপ্ত টাকা তিন অংশে ভাগ করিতেছে, বীরদৎ আসিয়া হাসিমুখে জিজ্ঞাসিল—কত দিলে?

ছ' হাজার তিনশো কুড়ী।

বীরদৎ ঠিক সামনে ফেণিলাকে দেখিয়া বলিল—আপনার হার উঠে গেছে ত?—সে তিনটা ভাগ দেখিতে পাইয়াছিল। ফেণিলা কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই বীরদৎ মাথার টুপিটা তুলিয়া বলিল—আচ্ছা, নমস্কার!

খগেনের সঙ্গে সঙ্গেই ফেণিলা ও সুনীলা হাত তুলিয়া বলিল,—নমস্কার।

শেষের বাজী আর তাহারা খেলিল না। খেলিল না বটে, তবে

মাঠেই রহিয়া গেল। সুশীলা সিংহ সাহেবের সহিত একযোগে ভেরী লিট্লকে বেট্ করিয়াছে, কি হয়—না দেখিয়া যাওয়া যায় না।

৬৭ মিনিটে খেলা শেষ হইয়া গেল। ফেণিলা সিংহ সাহেবকে বলিল —আজকে ত আর হ'বে না, চলুন আস্চে দিন দেখা যাবে - হারটা তোলবার চেষ্টা।

সিংহের কেশর ফুলিয়া উঠিল, কেবলমাত্র সুশীলা তাঁহার পাশেই ছিল বলিয়া সুশীলার বোন্টি এ-যাত্রা প্রাণে বাঁচিয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রেশ।

আসিবার সময় খগেন ট্রামে চড়িয়া আসিয়াছিল, এখন আর ভিড় ঠেলিয়া, কষ্ট সহিয়া, ট্রাম ধরিতে ইচ্ছা হইল না। সে একটু পূর্ব্বে বাহির হইয়া একখানা ট্যাক্সি লইয়া ঠিক গেটের সামনে দাঁড়াইয়া রহিল। ফেণিলা বাহিরে আসিয়াই বলিল—ট্যাক্সি করেছেন খগেন বাবু?

ফেণিলা, সুনীলা ট্যাক্সিতে উঠিয়া সুশীলার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। যদিচ সকলেই জানিত, সুশীলা সিংহ সাহেবের মোটরেই যাইবে, তবুও ফেণিলার কি ঝোঁক পড়িয়া গেল, দিদির সঙ্গে দেখা না করিলে চলিতেছে না।

খগেন নীচেই দাঁড়াইয়াছিল, হঠাৎ কাহার করস্পর্শে ফিরিয়া চাহিতেই দেখিল, সেই সুদর্শন যুবকটি, মাঠে যিনি তাহাকে অযাচিত, আশাতীত সাহায্য করিয়াছিলেন।

যুবক তাঁহার মোটরখানিকে বাহির করিবার পথ খুঁজিতেছিলেন। খগেনের ট্যাক্সি একটু নাড়িয়া বাহির হইয়া গেলেই তিনিও বাহির হইতে পারেন। খগেনের পৃষ্ঠে মৃদু করাঘাত করিয়া এই নবপরিচিত ব্যক্তি কহিলেন—আপনাদের কি দেরী আছে?

এই যে আপনি—বলিয়া ফেণিলা কলকণ্ঠে তাহার সম্বর্দ্ধনা করিল। যুবক মোটরের ষ্টিয়ারিং হুইলটকে ধরিয়া বসিয়াছিল, টুপিটা খুলিয়া তাহার উত্তর দিল। খগেন কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে ফেণিলাকে জিজ্ঞাসিল—

আমাদের গাড়ী না বেরুলে উনি বেরুতে পাচ্ছেন না। দেরী করার দরকার কি ?

তাই না-কি—বলিয়া ফেণিলা ড্রাইভারকে চালাইতে বলিল। খগেন জিজ্ঞাসিল—আপনি—আবার শনিবারে আপনাকে—আপনি থাকবেন ?

থাকব, সেকেণ্ড থার্ড রেশের সময় ঐখানেই দেখতে পাবেন, তার আগে আমি গ্রাণ্ডে থাকি।—বলিয়া সে নিজের গাড়ীর ষ্টার্ট দিল। এবং ইঁহাদের ট্যাক্সিকে ফেলিয়া বিশালকায়া মিনার্ভা নিমেষমধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

এসপ্ল্যানেডের মোড়ে আসিয়া একখণ্ড এম্পায়ার কিনিয়া সকলে বাড়ী ফিরিয়া আসিল। তখনও সুশীলা আসেন নাই। হেরম্বনাথ বলিলেন—বস-হে খগেন, গল্প করতে করতে চা-টা জম্‌বে ভালো।

হেরম্বনাথ সুশীলা, সুনীলা ও ফেণিলার জনক।

ফেণিলা বলিল—আচ্ছা খগেন বাবু, ভদ্রলোকের নামটা কেন জিজ্ঞাসা করলেন না আপনি ?

খগেন স্বীকার করিতে বাধ্য হইল, তাহার অত্যন্ত অন্যায় হইয়া গেছে। আগামী দিন সর্ব্বপ্রথম সেইটি জানিয়া লইবে। শুনিয়া ফেণিলা হাসিয়া উঠিল।

সুনীলা ঘরের মধ্যে আলোর সামনে দাঁড়াইয়া এম্পায়ার পড়িয়া লইতেছিল, হাসির শব্দে চমকিয়া বারান্দার দিকে চাহিয়া ডাকিল— নীলা !

ফেণিলা ঘরে আসিলে, জিজ্ঞাসিল—কি-রে ?

তুমি এত নিবিষ্টচিত্তে কি দেখছ তাই শুনি ?

প্রীতির

নিদর্শন

সিক্‌স্‌ত রেশে বাঙ্গালী জকি চড়েছিল বীরদত্ত—জানিস্‌ ?

ফেণিলা বলিল—দূর! বাঙ্গালী আবার জকি !

এই দেখ—বলিয়া সুনীলা কাগজখানা কনিষ্ঠার সামনে ধরিল। খগেন আস্তে আস্তে আসিয়া জিজ্ঞাসিল—কি, নীলা ?

তখন কাগজখানা লইয়া তিনজনেই বারান্দায়, অন্ধকারে যেখানে হেরম্বনাথ শুইয়া আকাশের নক্ষত্র গণনার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছিলেন সেইখানেই আসিয়া উপস্থিত হইল। সুইচ টিপিয়া বারান্দার বাতি জ্বালিয়া দিয়া নীলা পড়িতে লাগিল—

একজন বাঙ্গালী জকির অভাবনীয় সাফল্য !

মিঃ বীরদৎ! (ওরফে বীরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত)

কাগজ পড়া শেষ হইলে ফেণিলা জিজ্ঞাসিল—হ্যাঁ বাবা, বাঙ্গালী জকি হয় ?

হেরম্বনাথ বলিলেন—কাগজেই ত দেখ্‌লে মা।—একটু থামিয়া পুনরায় কহিলেন—বাঙালী কি হয় না নীলা ? এমন একটা কাজের নাম কর ত মা যা বাঙালী পারে নি,—অন্যে করেছে ?

প্রতিবাদ করিতে, অন্ততঃ তর্কের খাতিরে, ফেণিলা অনেক কথাই বলিতে পারিত, কিন্তু তর্কের প্রবৃত্তি তাহার ছিল না। সে জানিত, স্বজাতীয়ের কথা একবার আরম্ভ হইলে তাহার বৃদ্ধ পিতার উৎসাহ শতগুণ বাড়িয়া যায়। সে সময়ে প্রতিবাদ করিয়া তর্ক জয় ত হয়-ই না, কেবল তাঁহাকে উত্তেজিত করা। ফেণিলা পাঁচ সাত ভাবিয়া বলিল—না বাবা, আমি বল্‌ছি কি, জকির কাজটা অতি ছোট কাজ নয় কি ?

হেরম্বনাথ বলিলেন—রেশ খেলা যে তার চেয়ে ছোট কাজ নীলা !

জকি ত ঢের ভালো। সে ঘোড়াকে শেখাচ্ছে, তৈরী করছে, চড়ে দৌড়াচ্ছে, আর এই ঘোড়দৌড়ের বাজী যারা খেলে, তাদের উঞ্ছবৃত্তিগুলি একবার দেখ-দেখি……

ফেণিলা বলিল—উঞ্ছবৃত্তি কি-সে ?

হেরম্বনাথ বলিলেন—নয় ? প্রথম ধর কি ভয়ানক নেশা ! রবিবার থেকেই আঙ্গুল গোণা আরম্ভ হ'ল, বৃহস্পতিবারে রাত্রি জেগে ঘোড়ার বয়স, জাত নির্ণয়, পিতা-মাতার নাম ধাম, জ্ঞাতি-গোত্রের তল্লাস, শুক্রবারে পাথর মেলানো, শনিবারে ত একেবারে অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারত ! যার যা সঞ্চয় নিয়ে গিয়ে ঢাল্‌লে, ফেরবার সময় মুখে কালী মেখে কাঁদতে কাঁদতে এল ! তার ওপর, হিংসা দ্বেষ ত আছেই।

হিংসা দ্বেষ কেন ?

কেন ? মনে কর তু'জনে খেল্‌ছ, তুমি তোমার টিপে, ও ওর টিপে খেলা চল্‌ছে। ধর, তোমার ভাগ্যে একটা এল, বেশ মোটা টাকাও দিলে, আর তোমার সঙ্গীর অবস্থা তখন……

স্নীলা বলিল—ঠিক বলেছ বাবা ! আজই মাঠে আমি দেখেছি।

হেরম্বনাথ, শুধু তিনি কেন, খগেন, নীলা সকলেই স্নীলার মুখের পানে চাহিল। স্নীলা তাহা বুঝিয়াই কাগজখানার পানে চোখ রাখিয়া বসিয়া রহিল।

ভৃত্য ট্রে সাজাইয়া চায়ের পেয়ালাগুলি আনিয়া টিপয়টার উপর রাখিয়া বাহির হইয়া গেল। স্নীলা সকলের সামনে এক এক পেয়ালা চা নামাইয়া দিয়া বলিল—তুমি কি বিস্কুট খাবে বাবা ?

না-মা, রাত্রে কোনদিনই ত আমি বিস্কুট খাই নে। তোমরা খাও,

কৈ-হে খগেন, খাও না! যাই হোক্—বেশ লোকটি জোগাড় করেছিলে মোদ্দা! আবার শনিবারে দেখা শুনো হ'বে ত?

খগেন বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ, বলেছেন ত!

তা হ'লে এখন চল্ল—কি বল!

খগেন বিস্মিত হইয়া বারেকমাত্র তাঁহার দিকে চাহিয়া চোখ নামাইয়া লইল। হেরম্বনাথ পেয়ালায় মুখ দিয়া চুক্ চুক্ করিয়া চা খাইতেছিলেন।

এই সময়ে মোটরের হর্ণ বাজিতেই হেরম্বনাথ কহিলেন—সুশীলা এসেছে!

ফেণিলা রাস্তায় মুখ বাড়াইয়া বলিল—সিংহ সাহেবও আস্ছেন।

বেয়ারা আগে হইতেই দু'খানা চেয়ার বারান্দায় বাহির করিয়া দিল। সিংহ সাহেব আসিয়াই খগেনকে জিজ্ঞাসিলেন—কি-হে ছোক্রা, কত হ'ল?

ফেণিলা বলিল- পাঁচ টাকায় ১০৫ দিয়েছে। হিসেব করেই দেখুন না!—একটু হাসিয়া বলিল—কাগজ পেন্সিল চাই?

এই শেষের কথাটায় সিংহ সাহেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন কিন্তু সাহস করিয়া ধমক দিতেও পারিলেন না। ঐ খর্ব্বাকৃতি ক্ষুদ্র মেয়েটি বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন তিনটা পাস্ করিয়া ফেলিয়াছে; তাহার শয়ন-কক্ষের আলমারিটা, কেবল তাহারই পাওয়া প্রাইজের বহিতে, সোণা রূপার মেডেলে ভর্ত্তি!

খগেন দাঁড়াইয়া উঠিয়া হেরম্ববাবুকে নমস্কার করিল। একযোগে সকলের দিকে চাহিয়া হাত দু'টি জোড় করিয়া বলিল—আমি যাই।

ফেণিলা পরিহাসের স্বরে কহিল—পালান কেন খগেন বাবু? আপনার টাকা ত আর কেউ কেড়ে নিচ্ছে না।

সিংহ সাহেব ফেণিলার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—বোধ হয় বাঙ্গালটা সেই ভয়েই পালাচ্ছে।

ফেণিলা সহাস্যে কহিল—আশ্চর্য্য নয়! সিংহ দেখ্‌লে বাঙ্গালী কেন, অনেক সাহেবেরও পিলে চমকায়।

হেরম্বনাথ বলিলেন—নীলা, তুমি অনেকদিন সন্ধ্যায় গান কর নি। সিংহ সাহেব, নীলার গান আপনার কেমন লাগে?

সিংহ সাহেব বিস্কুট চিবাইতে চিবাইতে অতি কষ্টে কহিলেন—বেশ।

কিন্তু বাবা, আজকে ত আমি গাইতে পারব না।

সিংহ সাহেব পেয়ালা নামাইয়া রাখিয়া কহিলেন—পাশ করা লোকের সামনে ছাড়া গাইবেন না-বুঝি?

ফেণিলা তৎক্ষণাৎ কহিল—পাশের জন্যে নয়, বাঙ্গালীর সামনে ছাড়া বাঙ্গালা গান আমি গাইনে!—পিতার মুখের কাছে মুখ লইয়া কহিল—বড্ড শ্রান্ত, বাবা।

তবে থাক্‌, মা—বলিয়া হেরম্বনাথ নিজেই উঠিয়া ঘরের মধ্যে অর্গ্যানটা খুলিয়া গাহিলেন—

"নীল আকাশের অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো।
আবার কেন ঘরের ভেতর,—আবার কেন প্রদীপ জ্বালো॥"

গানের মাঝখানেই ফেণিলা আসিয়া খুট্‌ করিয়া বাতি নিবাইয়া, কণ্ঠ মিলাইয়া দিল—

আবার কেন ঘরের ভেতর, আবার কেন প্রদীপ জ্বালো।

প্রীতির

নিদর্শন

এবং গানের শেষে পিতার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—আর একটা গাও বাবা, তোমার নিজের গান-টা। আমিও গাইব। হেরম্বনাথ গাহিলেন। এত যে বয়স হইয়াছে, কণ্ঠের তেজ যদি এতটুকু কমিয়া থাকে! বাহির হইতে কেহ শুনিলে কখনই ধারণা করিতে পারিত না, এ-কোন যাট্‌বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধের কণ্ঠোচ্চারিত সঙ্গীত ধ্বনি। তখনও ফেণিলা মুখের পাশে মুখ রাখিয়া পিতার সঙ্গেই গাহিতেছিল, গান শেষ হইলে হেরম্বনাথ তাহার হাতটি টানিয়া লইয়া সাদরে একটি চুম্বন করিয়া বলিলেন—চল মা, বাইরে যাই।

বাহিরে আসিতেই সিংহ সাহেব নিম্নস্বরে বলিলেন—শ্রোতা জুটল না নীলা।

ফেণিলা সহজভাবেই জবাব দিল—তা জানেন না বুঝি? এ যে মৃগনাভি! নিজের দেহের সুবাসে নিজেই মেতে ওঠে। আমার গানের আমিই গায়িকা, আমিই শ্রোত্রী।

সুনীলা, গান শেষ হইতেই, নীচে পাকশালার তত্ত্বাবধানে গিয়াছিল। হেরম্ব বাবুর তিন মেয়ে, সংসারের তিনটি বড় বড় ভার গ্রহণ করিয়াছিল। জ্যেষ্ঠ সুশীলার উপরে ভার ছিল, অতিথি সেবার। মধ্যম সুনীলা পাক-শালার একছত্রী ছিল। কনিষ্ঠ, ফেনিলা গৃহের আসবাব পত্র, বেশ-ভূষা চাকর বাকর, গরু বাছুরের ভার লইয়াছিল।

সুনীলা ও ফেণিলা, পিঠোপিঠি। এদের বয়সের পার্থক্য ছিল, দেড় বৎসরের, আর মনের মিলে ছিল দু'টিতে যেন একটি জোড়া। সুশীলা ইহাদের চেয়ে বছর আষ্টেক বড়, মাঝে একটি ভাই, হিতেন্দ্র, বছর তিন মারা গিয়াছে।

প্রীতির

নিদর্শন

ফেণিলা দেখিল, সুনীলা নাই, বুঝিল, সে নীচে। একবার সিংহ সাহেবের, একবার পিতার দিকে চাহিয়া বলিল—বাবা, মেজদির কাছে যাই। যদি দরকার পড়ে, ডেকো। কেমন?

হেরম্বনাথ সম্মতি জ্ঞাপন করিতেই ফেণিলা মন্থরগতিতে নামিয়া গেল।

নীচে আসিয়া সুনীলাকে চাপিয়া ধরিয়া বলিল—আমার সঙ্গে লাগা! খুব শুনিযে দিয়েছি, বুঝলে মেজদি! কেন—কিসের জন্যে—শুনি তাই। বড় লোক আছেন বড় লোক আছেন, আমাদের কি? ওঃ যাকে যা খুসী তাই বল্‌বেন, আর আমি থাক্‌ব চুপ করে? ভারী দায় পড়ে গেছে কি না আমার!

সুনীলা ছোট বোন্‌টিকে আদর করিয়া বলিল, ছিঃ নীলা, ওরকম করে' বল্‌তে আছে কি? দিদি মনে মনে কষ্ট পান্।—কথাটার শেষটা সুনীলা যেন অতি কষ্টে বলিতে পারিল। ফেণিলা তাহা বুঝিল না, সে প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া কহিল বয়েই গেল, বয়েই গেল। ওঃ মনে মনে কষ্ট পান। কষ্টই যদি পান, সাহেবটিকে একটু সভ্য করবার চেষ্টা করেন না কেন, শুনি।

আঃ নীলা—বলিয়া তাহাকে টানিতে টানিতে রান্নাঘরে ঢুকিয়া বলিল—বোস্—একটা নতুন রকমের রান্না করিয়েছি—খাবি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(ক)

আসল কথা।

গ্রন্থবর্ণিত পরিবারটির পরিচয় এইরূপ :—

হেরম্বনাথ পোষ্টাফিসে উঁচুদরের একটা কাজ করিতেন, দশবৎসর পেন্সন লইয়া কলিকাতায় বাস করিতেছেন। এখন মাসে চারিশত চুয়াল্লিশ চোদ্-দো আনা চার পাই করিয়া পেন্সন আসে। শুনিতে পাওয়া যায়, হাতে পয়সাও প্রচুর পরিমানে আছে—সংসারটি বেশ সুখের ও স্বচ্ছন্দের ছিল। হেরম্বনাথের স্ত্রী হেমাঙ্গিনী ফেণিলাকে প্রসব করিয়া কি একটা উৎকট রোগে মারা যান—ফেণিলাকে মিস্ টড্ নাম্নী জনৈক ধাত্রী লইয়া যায় এবং ফেণিলার চতুর্দ্দশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে হেরম্বনাথ বেশ মোটা অঙ্কের একখানি চেক্ ও বহুল ধন্যবাদ প্রদান করিয়া মিস্ টডের আশ্রয় হইতে তাহাকে লইয়া আসেন। হেমাঙ্গিনীর মৃত্যু ছেলেমেয়েদের কারুও প্রায় মনেই পড়ে না, যদিও বা ছিল, একমাত্র সুশীলাই জানিত। সুশীলা জিতেন্দ্র তখন শিশু। নীলা ঘরে ফিরিয়া আসিলে, প্রথম প্রথম তাহাকে লইয়া মহাবিপদ উপস্থিত হইল। ফেণিলা—ডাকনাম—নীলা, একটা মেয়ে স্কুলে তখন সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে পড়িলেও কিন্তু বাংলা শিক্ষাটা তাহার আদৌ হয় নাই। বাড়ীর লোকে যা বলে, প্রায়ই সে বুঝিতে পারে না। নীলা হেরম্বনাথের কাছে বাংলা পড়া সুরু করিয়া দিল। তাহার মত মেধাবী বালিকার পক্ষে বিদেশীয় ভাষা শিক্ষা করাই যখন কষ্টকর হয় নাই,

স্বদেশের ভাষা অতি শীঘ্রই সে আয়ত্ত করিয়া ফেলিল। তাহার বড় বোন রাঁচীতে একটা অনাথ বিদ্যালয়ে অবৈতনিক শিক্ষকতা করে, সুনীলা বড় একটা কিছু করে না—তবে রাশি রাশি কাব্য আর উপন্যাস হজম করিয়া একদম নীলকণ্ঠ হইয়া গেছে। হিতেন্দ্র ছিল, তাহাদের একটি মাত্র ভাই। বেচারা ছিল যেমন রোগা তেমনি অপটু। রোগে ভুগিয়া ভুগিয়া লেখাপড়া করা ত তাহার হইলই না, কাশির সঙ্গে কবে একটু রক্ত উঠিয়াছিল, সেই ভাবিয়া ভাবিয়া যক্ষা টানিয়া আনিল এবং দ্বাবিংশতি বর্ষ পূর্ণ হইবার পরদিনই সকল ভাবনা শেষ করিয়া দিল। হেরম্বনাথ বলিলেন—যাক্। ভগবান একটি দায় হইতে নিষ্কৃতি দিলেন, —এখনও তিনটি।

যে পাড়াটায় তাঁহার বাস ছিল, সেখানকার আর যাহারা ভদ্রগৃহস্থ ছিল, তাহারা বলিত ঐ বাড়ীটায় বেহ্ম থাকে। নিরক্ষর দরিদ্রগণ বলিত—থাক্, তাদের কথা আর লিখিয়া কাজ নাই। কলেজগামী ছেলেরা বলিত, এনলাইটেণ্ড ফ্যামিলি! কলেজগামী মেয়েরা গাড়ীর মধ্যে থাকিয়া বলাবলি করিত, কোথায় পড়ে কে জানে। পাশাপাশি বাড়ীর লোক গান শুনিয়া মোহিত হইত, আড়ালে আবডালে থাকিয়া ইহাদের রূপ যৌবনেরও প্রশংসাও করিত, প্রকাশ্যে বেহ্মদত্যি-রূপ উপদেবতার ঘাড়ে সব দোষ চাপাইয়া দিয়া ছোটছোট ছেলেপিলে সাবধান করিত।

তা করুক্, না করিলেও যদিচ বিন্দুমাত্র ক্ষতিও হইত না—আমরা ত আসল কথা জানি, হেরম্ব বেহ্ম ও নন, দত্যিও নন্, এমন কি ব্রাহ্মও নন্। তাঁর মেয়েদের স্বাধীনতা আছে সত্য, কিন্তু সেই স্বাধীনতা কি হিন্দুঘরের মেয়েদের কুত্রাপিও নাই? পাড়ার লোকে পরখ্ করিতে

. প্রীতির .

নিদর্শন

একবার রাতারাতি ঘাড়ে করিয়া কার্ত্তিকঠাকুর বহিয়া দরজায় ফেলিয়া, ঢাক ঢোল বাজাইয়া দিল; হেরম্বনাথ সকালে নগদ ছ'আনা পয়সা ব্যয় করিয়া, মুটে ডাকাইয়া স-ময়ুর ঠাকুরটিকে বিডন-বাগানে পাঠাইয়া দিলেন। লোকে বলিল—উঃ—ভীষণ বেহ্ম! আমরা বলি, ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বীর চরম ও পরম প্রমাণ না হইতে পারে। পরম হিন্দু, মালা তিলকধারী ধনবান যতীন ঘোষকে এবম্বিধ কার্য্য করিতে অনেক লোকেই দেখিয়াছে। তবে কি তিনি হিন্দু? এ কথার উত্তর আমরা সঠিক দিতে পারি না। যেহেতু তাঁহাদের পাকশালায় এক অনাথ খৃষ্টানী পাকের কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। হেরম্ববাবুর চাকরীর আমলের মুসলমান পেয়াদা রব্বানি মিঞা এখনও চা-কেক্‌পুডিং তৈয়ার করিয়া থাকে। এমন সব অহিন্দুর হাতে খাওয়া দাওয়া করিলে কি হিন্দুত্ব বজায় থাকে? তবে তিনি কি?

আমরা বুঝিতে পারিতেছি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলে অনেক জটিল সমস্যার সমাধান হইতে পারিত, এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আলোচনা অত্যন্ত উপাদেয় হইলেও, আমাদের এই পথ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছে। হেরম্বনাথ প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিয়া থাকেন, উড়িষ্যাসম্ভূত জনৈক পাণ্ডা রোজই তাঁহার ললাটটি চন্দন চর্চ্চিত করিয়া দেয়, দু'একটা পিত্তলের ছাপও বুকে বাহুতে আঁটিয়া দিয়া 'বড় বাবু'র মঙ্গল কামনা করিয়া থাকে। হেরম্বনাথ গৃহে ফিরিয়া পুনরায় স্নান করিয়া থাকেন. (গঙ্গার জলে অত্যন্ত ময়লা, বালি, গায়ে লেপিয়া থাকে বলিয়া) কাজেই গোসল শেষ করিয়া হেরম্বনাথ যখন সকলের সাক্ষাতে বাহির হ'ন, তখন না থাকে ছাপ, না থাকে ধূলাবালির চিহ্নটুক্। রব্বানি মিঞা তখন

সাদা উর্দ্দি আঁটিয়া, মাথায় এম্‌-লেখা তকমা পরিয়া, চা সাজাইয়া আনে।
—কাজেই, পাঠক মহাশয় আমাদের মাপ করিবেন।)

দিনাজপুর ডিভিজনের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট থাকিতে হেরম্বনাথের সহিত খগেনের পিতা হরিহর বাবুর পরিচয় হয়। পরিচয়টা একটু অদ্ভুত রকমের। হরিহর বেতন পাইতেন, ৪৫৲ টাকা, পোষ্টাপিসেরই একজন কেরাণী ছিলেন। আপিসের সব কেরাণীই দোকানে গিয়া খাবার টাবার খাইয়া আসিত, হরিহরকে সাহেবের খানসামা রব্বানি মিঞা চার পয়সার মুসলমানের দোকানের বিস্কুট, আর এক পয়সার একটি রসগোল্লা আনিয়া দিত। সাহেব প্রায়ই লক্ষ্য করিতেন, রব্বানি সাহেবের চা'য়ের সঙ্গে এক পেয়ালা চা গোপনে হরিহরকে রোজই যোগান দিত। অবশ্য সাহেবের খানসামায় ও সাহেবের কেরাণীতে একটা বন্দোবস্ত ছিল-ই (গোপনে), সাহেব সব জানিয়াও জানিতেন না। কিন্তু লোকটির সঙ্গে আলাপ করা তাঁহার অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল। হরিহর বলিলেন —হুজুর অনেকদিন জাত্‌ জাত্‌ করিয়া, বুড়ো আঙ্গুলে ভর দিয়া হিন্দুত্ব বাঁচাইয়া ছিলাম, মেয়েটা ছিল আইবুড়। সেই একটি মাত্র মেয়ে— বুঝ্‌তেই পারছেন, হুজুর! অনেক পূজা, মানসিক দিয়া মেয়ের বিবাহ ঠিক করিলাম। বিয়ের আগের দিন, অনেক খরচ পত্র হইয়া গেছে— একটা রাউ উঠ্‌ল—আমার দিদি শাশুড়ীর কি একটা দোষ ছিল। বিয়ে ভাঙল, হুজুর, বাপের লাঞ্ছনা দেখে মেয়েটা কোত্থেকে আপিং খেয়ে—রাতারাতি সাবাড়! আমারও জাত মানা উঠে গেছে, হুজুর!

লোকটি স্পষ্ট কথা বলিতে পারে, আর অন্যে অপকর্ম্ম বলিলেও সেই কাজটি সে সকলের সাক্ষাতে করিবার সাহস রাখে—হেরম্বনাথ লোকটিকে

বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তিনিই তাঁহার পুত্র খগেনকে চিঠিপত্র দিয়া কলকাতায় পাঠাইয়াছিলেন; ফ্রি পড়িয়া, হেরম্বনাথের বন্ধুবান্ধবের নিকট আশাতীত সাহায্য পাইয়া খগেন্দ্র বি-এ পাশ করিয়াও ফেলিয়াছে। যস্ সেপার্ডের আফিসে হেরম্বনাথ তাঁহার ভগ্নীপতিকে বলিয়া কহিয়া এপ্রেন্টিসিতে ঢুকাইয়া দিয়াছেন। এখন খগেন্দ্র ১০০৲ টাকা হাত খরচা হিসাবে পায়, পার্মানেন্ট হইলে ২, ৩শ অবধি হইবে।

হেরম্বনাথ দিনাজপুর হইতে ঢাকায় বদলি হ'ন, ঢাকা হইতে চব্বিশ পরগণায়—সেখান হইতেই অবসর লইয়াছিলেন। কলকাতার বাড়ীটা তখন ভাড়া দেওয়া ছিল, ভাড়াটেদের নোটিশ দিয়া, তিন মাসের সময় দিয়া, উঠাইয়া, হেরম্বনাথ বাস করিতেছেন।

সংবাদ পাইয়া খগেন্দ্র আসিয়া জুটিল। দু'বেলা এখানে চা খাইয়া, মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ আস্‌টা পাইয়া তাহার দিনটি বেশ কাটিতেছিল। হঠাৎ কোথা হইতে ঘোড় দৌড়ের নেশা যে তাহাকে পাইয়া বসিল, বেচারা অগাধ জলে হাবুডুবু খাইতে লাগিল। না উঠিবার পথ পাইল, না পাইল নিস্তার। কিন্তু কেমন করিয়া এই ভূত তাহাকে পাইয়া বসিয়াছিল, তাহা বলিতে হইলে মিঃ ঘনশ্যাম সিংহের আগমনটা পূর্ব্বেই বিবৃত করিতে হয়।

মিঃ সিংহ (ঘনশ্যাম নামটি তাঁহার স্বর্গীয় পিতা গঙ্গারাম সিংহ মহাশয় দান করিয়া গঙ্গালাভ করিয়াছিলেন। ঘনশ্যাম, নামটি পরিমার্জ্জিত করিয়া রাখিলেন, জি, সিংহ! অনেক ভাবাপন্ন সাহেবের মতই তিনি দেশী নামটা লোককে একদম জানাইতেও চাহিতেন না।) রাঁচীর অনাথ বালিকা বিদ্যালয়ের অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার ধনৈশ্বর্য্যের অভাব

হেতু ক্ষুদ্র বিদ্যালয়টির আসবাব-পত্র, বহি আলমারী অনেক বড় বড় স্কুলেকেও হার মানাইয়া দিত। ঝরিয়া অঞ্চলে অনেকগুলি কয়লার খনির তিনি একমাত্র অধিকারী, তাহা হইতে প্রচুর আয়। মিঃ সিংহের বাড়ী কলিকাতাতেই, নয় মাস তিনি সেখানেই থাকিতেন, তিনমাস রাঁচীতে বাস করেন।" রাঁচীতে "শান্তি নিকেতনের" নিকটেই তাঁহার সুবৃহৎ অট্টালিকা। ফটকের গায়ে প্রস্তর ফলকে লেখা—জি, সিন্‌হ এস্কোয়ার। সিংহের বয়স অনুমান ত্রিশ—চল্লিশের মধ্যে। ব্যবধানটি বড় 'অল্প' হইল, কিন্তু কি করিব, বলুন, সাহেবী-মেজাজের, গোঁফ দাড়ী কামানো, টুপি মাথায় লোকেদের বয়স নির্ণয় করা অন্তর্য্যামী লেখকের পক্ষেও দুঃসাধ্য। সিংহ কৃতদার কিনা তাহাও আমরা অবগত নহি। সুশীলার সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয় হয়, সেই অনাথ বালিকা বিদ্যালয়ে। প্রায় দেড় সপ্তাহ পূর্ব্বে সুশীলা কলিকাতায় আসিতেছে,—বিদ্যালয় কি একটা কারণে হঠাৎ দিন দশেকের জন্য বন্ধ হইয়াছে—ষ্টেশনে মিঃ সিংহের সহিত সাক্ষাৎ। তিনিও কলিকাতায় আসিতেছেন। সুশীলা সেকেণ্ড ক্লাশের মেয়ে গাড়ীতে উঠিল, সিংহ সাহেব ফার্ষ্ট ক্লাশে থাকিয়াও রাত্রে দু'তিনবার হেড মিষ্ট্রেশ মিস্ মিত্রের সংবাদ লইতে ভুলিলেন না। প্রত্যুষে হাওড়ায় নামিয়া সুশীলাকে নিজের গাড়ীতে তুলিয়া তাঁহাদের বাড়ীতে আসিলেন। সুশীলা নবম দিবসের রাত্রের গাড়ীতেই রওনা হইবে, অষ্টম দিবসের মধ্যাহ্নে হঠাৎ হর্ণ বাজাইয়া বিকট ধ্বনি করিয়া মস্ত একটা হাড্‌সন্ গাড়ী বাড়ীটার নীচে আসিয়া থামিতেই সুশীলা মুখটি বাড়াইয়া দেখিল—মিঃ সিংহ তাঁহার সুবিশাল বপুখানি টানিয়া টানিয়া গাড়ীর মধ্য হইতে বাহির করিতেছেন। সুনীলা, ফেণিলা—ইহারাও সিংহ সাহেবের কথা

শুনিয়াছিল - সুশীলার সঙ্গে সঙ্গেই জানালায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহারা ত হাসিয়াই অস্থির। ফেণিলা বলিল—দিদি ভাই তোমাদের সম্পাদক সাহেবের গায়ের জামা আর খানিকটা চামড়া ছিঁড়িয়া গেছে। —সুশীলাও হাসিল।

সম্পাদক মহাশয় কহিলেন—রাঁচীতে অত্যন্ত কলেরা দেখা দিয়াছে, সে কারণে মাসখানেক ছুটি বাড়াইয়া দেওয়া দরকার। এবং সেই বিষয়ে পরামর্শ করিতেই তাঁহার আগমন।

সুশীলা ম্লানমুখে কহিল—ছুটি না-হয় বাড়ানো গেল; কিন্তু মেয়েরা ত সব বোর্ডিংএই রয়েচে। তাদের কি হবে?

সিংহ সাহেব বোধ করি ইহা ভাবেন নাই; এখন ভাবিতে লাগিলেন। সুশীলা বলিল—দেখুন, ছুটি বাড়াবার দরকার নেই—আমি আজই যাব। কলেরা যখন দেখা গেছে - তখন আমাদের মেয়েগুলির একটা ব্যবস্থা না করে' কোনমতেই আমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারছি না। —সিংহ সাহেব ভাবিতে লাগিলেন; হেরম্বনাথ সুশীলার প্রস্তাবই সমর্থন করিলেন।

শেষে সিংহের মস্তকে বুদ্ধি খেলিল, বলিলেন—নার্স টার্স ত আমদের বোডিংয়ে সবই আছে—আপনি না গেলেও চল্‌তে পারবে। আমি বরঞ্চ……

এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই সুশীলা বলিল আমাদের প্রাণের মূল্য কি এতই বেশী মিঃ সিংহ?

না, না আমি তা বলি নাই—আমি বল্‌ছি কি, সেখানকার এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনকে আমি তার করে দিই—তিনি যাতে সমস্তক্ষণই বোডিংয়ে

থাকেন। আর দরকার বুঝলে আমাদের টেলিগ্রাফ্ করবেন, টাকা কড়ির দরকার হ'লে আমার রাঁচীর বাড়ীর থেকেই যথেষ্ট পাবেন।—কি বলেন ?

হেরম্বনাথ বলিলেন—এ মতলব মন্দ নয়।

তাহাই স্থির হইল। তখন সিংহ সাহেব উঠিলেন। সকলেই তাঁহাকে আর কিছুকাল বসিবার অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে এখনই মাঠে যাইতে হইবে নতুবা ঘোড়দৌড় আরম্ভ হইয়া যাইবে, তাঁহার অনেক টাকা লোকসান হইবার সম্ভাবনা—শুনিয়া কেহই আর কিছু বলিলেন না। কেবল ফেণিলা জিজ্ঞাসিল—আচ্ছা, ঘোড় দৌড়ের মাঠে মেয়েদের যেতে দেয় ?

কেন—দেবে না ? কত লক্ষ লক্ষ মেয়ে যায়। যাবেন—আপনারা ?—ত চলুন, আমার গাড়ী ত রয়েছেই।

হেরম্বনাথ কন্যাত্রয়ের মনোগত অভিপ্রায় বুঝিলেন। যখন মেয়েরা তাঁহার মুখের দিকে চাহিল, তিনি বলিলেন—তা দেখ্‌তে যাবার ইচ্ছে হ'য়েছে—দেখে এস।

কিন্তু তবুও সেদিন হইয়া উঠিল না। আধঘণ্টা মাত্র সময় ছিল, তাহার মধ্যে প্রস্তুত হইয়া ওঠা অসম্ভব। সুশীলা বলিল—আর একদিন যাব—আজ আর হ'য়ে উঠ্‌ল না।

সিংহ সাহেব আগামী শনিবারে আসিয়া ইঁহাদের লইয়া যাইবেন, এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া, পুনরায় কষ্টে-সৃষ্টে দেহখানি গাড়ীর মধ্যে পুরিয়া প্রস্থান করিলেন।

আফিস্ ফেরৎ খগেন আসিতেই ফেণিলা সর্ব্বাগ্রে তাহাকে খবরটি

দিল। সে কিন্তু কিছুতেই সম্মত হইল না। সে যত বলে মিঃ সিংহ আমাদের দেখাইবেন বলিয়াছেন, পিতাও সম্মত, কোনই দোষ নাই. খগেন ক্রমাগত ঘাড় নাড়ে, বলে—রেশে যাওয়া হ'তেই পারে না।

এতদিন ছিল, খগেনের সরল, অনাড়ম্বর ব্যবহারটি, তাহার মতটি সকলেরই ভালো লাগিত, সকলেই বিনাবাক্যব্যয়ে গ্রহণ করিত। সেদিন প্রথম তাহার ব্যতিক্রম দেখা গেল। সুশীলা উষ্ণ হইয়া বলিল—হ্যাঁ, না - না করে ঘাড়ই ত নাড়ছ, কারণটা কি-তাই বল-না?

খগেন একমুহূর্ত্ত তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, উত্তর দিল না। সুশীলা বঙ্কিম-দৃষ্টিতে ফেণিলাকে বিদ্ধ করিয়া কহিল—বাবার পর আবার কার' মত নিতে হয় নাকি রে নীলা?

ফেণিলা টুক্ করিয়া কহিল—বাবার পর আবার কার মত নিলুম দিদি? আমি কি খগেন বাবুর কাছে মত চাচ্ছিলুম না কি? ওঁকে যেতে বলছিলুম—আমাদের সঙ্গে।

সুশীলা বলিল—কেন? ওঁর যাবার দরকার কিসের?

এই জিনিষটা নিশ্চয়ই গড়াইত অনেকদূর, শুধু পারিল না, হেরম্বনাথ আসিয়া মধ্যস্থ করিয়া ফেলিলেন বলিয়া! হেরম্বনাথ বলিলেন—খগেনের দেখবার ইচ্ছা না থাকে—ও থাক্। তবে এইটুকু আমি বল্‌তে পারি কি দেখবার, কি খেলবার—কোন দরকারেই যে না যেতে পারে সেই সব চেয়ে বাহাদুর। হাজার হোক্—জিনিষটা ত জুয়া! কি বল হে খগেন্?

আজ্ঞে হ্যাঁ—বলিয়া খগেন নিঃশ্বাস ফেলিল। সুনীলা এই সময়ে ঘরে ঢুকিয়া পিতার পাশে দাঁড়াইয়া বলিল—বাবা, জলখাবার আন্‌ব?

অকস্মাৎ হেরম্বনাথের মনে পড়িয়া গেল—আজ শনিবার; খগেন

শনিবারে আফিসে নিয়মিত আট পয়সার টিফিন খায় না, একেবারে এখানে আসিয়া গৃহ-প্রস্তুত মিষ্টান্ন প্রভৃতি খাইয়া থাকে। বলিলেন—নিয়ে আস্‌বে বৈ কি মা! সাড়ে তিনটে বেজে গেছে যে!

সুশীলা বলিল—কোথায় আবার সাড়ে তিনটে বাজ্‌ল বাবা? মোটে ত পৌনে তিনটে। সাড়ে তিনটের এখন ঢের দেরী।

সাড়ে তিনটার সময় ইহাঁরা জলযোগ করিতেন; অন্য শনিবারে খগেনও গল্প গুজব করিয়া সাড়ে তিনটার সময়ই খাইত, আজ হেরম্বনাথের মনে হইল, খগেনের মুখখানি অত্যন্ত শুষ্ক হইয়া গেছে, ক্ষুধাতৃষ্ণায় সে অতিশয় কাতর। বলিলেন—তা হোক্ পৌনে তিনটে, তুমি আন মা, আমার আজ এখনই ক্ষুধা বোধ হচ্ছে।

সুশীলা বলিল—আমার এখন এনো না, সু!

ফেণিলা বলিল—আমার কিন্তু এখনি চাই ভাই মেঝ্‌!

ফেণিলা প্রায়ই সুনীলাকে 'মেঝ্‌' বলিয়া ডাকিত। দু'জনের মাখামাখিটা একটু বেশী ছিল বলিয়াই বোধ করি—সব সময়ে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের ভেদাভেদ তাহারা রাখিতে পারিত না।

সে যাই হোক, শুক্রবার সন্ধ্যা হইতে ঘোড়দৌড়ে যাইবার কল্পনা চলিতে লাগিল। খগেন ক'দিন আসে নাই, ফেণিলা ঝগড়া করিবে বলিয়া প্রস্তুত হইয়াছিল, কিন্তু বিপক্ষ একদম্ নিরুদ্দেশ। রাত্রে সুনীলা ও ফেণিলা দোতালায় ছোট ঘরটায় শুইত। ক'দিন যতক্ষণ না ঘুমাইয়াছে, ফেণিলা কম করিয়া দশবার সুনীলাকে ঐ কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছে—বাবা রাগ করেন নাই, আমরা করি নাই, একমাত্র দিদি একটু কথা কন্ নি তার জন্যেই এত রাগ? আমরা না-হয় কেউ নই,

কিন্তু বাবা—বাবার ওপর কি খগেন বাবুর কাছে দিদি? তুমিই বল না ভাই মেঝ? 'মেঝ' প্রতিবারই সেই এক জবাবই দিয়াছে—আমি জান্‌ব কোত্থেকে বল্? আমি কার কোন্ কথায় থাকি? রান্নাঘরের কথা জিজ্ঞাসা কর, ক'সের তেলে ক'টা ইলিশ মাছ ভাজা হয় জিজ্ঞাসা কর—সব বল্‌ছি। অন্য কিছু জিজ্ঞাসা করিস্‌নে ভাই!

নীলা 'মেঝ'কে অন্ধকারে বেশ করিয়া বুকের মাঝে চাপিয়া ধরিয়া বলিল—আচ্ছা বলত ভাই মেঝ, একটা এই এত—এ-তো বড় ইলিশ ভাজ্‌তে কতখানি তেল লাগে!

সুনীলা জবাব দিল, আধ পোয়া!

ইস্ তাই বৈ কি! এই—এ-তো ব-ড় যে!—বলিয়া সে সুনীলার পিঠে দাগ কাটিয়া মাপ দেখাইয়া দিল।

সুনীলা বলিল—আধ পোয়ার বেশী লাগে না। তেল বেরোয় কি-না।

কাল্ যে তুমি ইলিশ ঘন্ট করলে, খগেন বাবু খেলে কিন্তু খুব সুখ্যাতি করতেন। না ভাই?

কি জানি!

অমনি কি-জানি! তুই ভাই মেঝ—যেন কি!—হ্যাঁ! একদিন সেই মনে নেই, আমি একটা তরকারী রেঁধেছিলুম, খেয়ে......

তুই নিজেও ঘুমুবি নে—আমাকেও ঘুমুতে দিবি নে নীলা?

ফেণিলা বলিল—ঘুমোও বাবা, খুব ঘুমোও, কুম্ভকর্ণ হও, আর যদি আমি কথা কই থুড়ি-থাক্।—সে যে রাগ করিয়া মুখ ফিরাইয়া শুইল, জানিয়াও সুনীলা সাড়া দিল না। চুপ করিয়া কিছুক্ষণ পড়িয়া থাকিলেই ঘুমাইয়া পড়িবে—এই ভাবিয়া সে'ও পাশ ফিরিল।

(খ)

শুচিতা।

শুক্রবার সন্ধ্যা হইতেই ফেণিলা অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িতেছিল। অন্য শুক্রবারে ৬টার ভিতরই খগেন আসিয়া পড়ে। সে না আসিলে বাবা কিছুতেই চা খান না। বাবা বলেন, আহা সে বেচারা সমস্ত দিন খেটে খুটে শ্রান্ত হ'য়ে আস্‌ছে, গল্প গুজবের মধ্যে বসে চা না খেলে তার কষ্ট দূর হ'বে কেন? আজও হেরম্বনাথ চা খান্ নাই। সুশীলা দু'তিনবার রান্নাঘরে সুনীলাকে তাগিদ পাঠাইয়াছিল, হেরম্বনাথ বলিয়াছিলেন, না, না, খগেন আসুক, খাবো।

ফেণিলা জিজ্ঞাসিল—দিদি তোমার জন্য এক পেয়ালা করে দেব?

দাও—বলিয়া সুশীলা অন্যত্র চলিয়া গেল। ফেণিলা রান্নাঘরে গিয়া একেবারে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—মেজদি, দিয়ে এস ভাই 'বঠ্‌ঠাকরুণকে' এক পেয়ালা চা!

সুনীলা জিজ্ঞাসিল—৬টা কি বেজে গেছে, নীলা?

কখো-ন!—বলিয়া ফেণিলা ফোঁপাইতে বসিল।

সুনীলা কাৎলিটা ষ্টোভের উপর বসাইয়া দিয়া নীলাকে বেষ্টন করিয়া বলিল—কি হ'য়েছে নীলা? দিদি কিছু বলেছেন?—সুনীলার ভয় হইতেছিল,—সাড়ে ছ'টা বাজিতে সে নিজের কাণেই শুনিয়াছে, বাবার ঠিক ছ'টার সময় চা খাওয়া অভ্যাস, তিনি বিলম্বে খাইবেন বলিয়াছেন—নিজের মুখে কোন কারণ ব্যক্ত না করিলেও সুনীলার তাহা জানিতে

বাকী ছিল না—পাছে এই লইয়াই একটা অনর্থ উপস্থিত হয়! কিন্তু তাহার প্রশ্নের উত্তরে যখন নীলা কেবলমাত্র ফোঁস ফোঁস করিয়া এই কয়টা কথাই বলিল যে, বলাবলির তোয়াক্কা সে কাহারই রাখে না ;—এখনই মিস টড্ কে লিখিয়া সে কাসিয়ংএ চলিয়া যাইতে পারে, তখন সুনীলা মনের মধ্যে একটু আরাম পাইলেও, সম্পূর্ণ নির্ভয় হইতে পারিল না। ছোট বোন্‌টির মুখে দু'টুক্‌রা পুডিং গুঁজিয়া দিয়া তাহার মুখখানি কোলের মধ্যে লইয়া আদর করিয়া বলিল—ছিঃ নীলা সন্ধ্যেবেলা ওরকম করে থাক্‌তে নেই। জানিস্ ত বাবা বলেন—

প্রভাতে সন্ধ্যায় আমি
অতি ক্ষুণ্ণমন
বসে থাকি তব আশে
পাব দরশন ॥

উপুরে যা নীলা, দেখ্‌গে যা পশ্চিমের বারান্দায় আকাশের পানে চেয়ে বাবা কেমন বসে আছেন। সন্ধ্যার অল্প অন্ধকার তাঁর সুন্দর মুখখানিকে কেমন পবিত্র গম্ভীর করে তুলেছে—যা নীলা যা!

ফেণিলা উঠিয়া গেল। সুনীলা এক মিনিট নীরবে দাঁড়াইয়া কাৎলি নামাইয়া চায়ের সরঞ্জাম সজ্জিত করিয়া, বেহারাটার হাতে দিতেই দ্বারের পাশ হইতে কে ডাকিল—সুনীলা!

সুনীলা বলিল—চলুন, চলুন, বাবা এখনও চা খেতে পান্ নি, আপনার জন্যে! এত দেরী করলেন কেন আজ?

ট্রামের কারেণ্ট বন্ধ হ'য়ে গেছল!

উপরে আসিতেই হেরম্বনাথ সস্নেহে বলিলেন—এত দেরী যে খগেন!

ফেণিলা ঝঙ্কার দিয়া বলিল—বলুন, আফিসে কাজের তাড়া!

খগেন্দ্র সহাস্যে কহিল—না, ট্রামে দেরী হ'য়ে গেল।

সুশীলা চা পান করিয়া বলিল—বাবা, কাল তুমিও চল-না আমাদের সঙ্গে?

হেরম্বনাথ বিস্মিতস্বরে জিজ্ঞাসিলেন—কোথায় সুশীলা?

সুশীলা বলিল—সেই যে—বাবা, কাল শনিবার আমাদের মাঠে যাবার কথা আছে। কাল মিঃ সিংহ আস্‌বেন।

আমাকে আর কেন মা? আমার কি আর ওসব দেখবার বয়স আছে সুশীলা? এখন পৃথিবীর ঘোড়দৌড় শেষ ক'রে তাঁর চরণে পৌছুতে পারি—তবেই-না।

সন্ধ্যার অন্ধকার যেন অনেকক্ষণ কথাগুলিকে ঘরের মধ্যেই চাপিয়া ধরিয়া রাখিল। ফেণিলা সে নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া দিয়া বলিল—বাবার ঐ এক কথা! বয়েস আর বয়েস! তোমার ক'টা চুলই বা পেকেছে বাবা? আমাদের মিস্ টডের. না মেঝ্?

মেঝ্ বলিল—হ্যাঁ!

হেরম্বনাথ বলিলেন—ওরে পাগলী, না-ই পাক্‌ল চুল, বয়সে ত আর নেই-ক ভুল!—এই ধর না, একুশ বছরে চাকরীতে ঢুকি, ৩৭ বৎসর চাকরী করি—কত হল ৫৮ হল ত? পেন্সন পাচ্ছি ক'বছর, তের—কত হ'ল ৭১ একাত্তর বছর। বয়সটা কি কম হ'ল?

উঃ বড্ড বেশী হ'ল!—বলিয়া নীলা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। আচ্ছা বাবা, আমার ঠাক্‌মা যখন বেঁচেছিলেন, তোমায় কি ব'লে আশীর্ব্বাদ করতেন বল দেখি?

কেন বল্ ত ?

বলই না শুনি ?

সে কত বল্‌তেন। দীর্ঘজীবি হও, সোণার দোত কলম হ'ক্, দেশের দশের মাথা হও, পাঁচজনের অন্ন দাও—এই সব।

আর কি ?

শত বৎসর পরমায়ু হ'ক্, ছেলে-মেয়ে......

নীলা হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল—এখনো ঊনত্রিশ বছর, তার পরে তুমি বুড়ো হ'বে ৭১ আর ২৯—একশ! আমার পুণ্যাত্মা ঠাকুমার কথা মিথ্যা হয় না।

না, নীলা, তাঁর কথা এজীবনে সবই ফলেছে, একটাও বিফল হয় নি।

তখন সেই প্রসঙ্গই আলোচিত হইতে লাগিল। সে কথা বলিতে বলিতে হেরম্বনাথ কাঁদিয়া ফেলিলেন ; শ্রোতারাও তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া চক্ষের জলে ভাসিয়া গেল। সব শেষে হেরম্বনাথ বলিলেন—তাই যখন মনে হয় খগেন যে এরা, এদের মা'র স্নেহের বর্ম্মের ভেতরে থেকে পৃথিবীর ঝঞ্ঝা ব্যত্যয়ের সন্মুখীন হ'তে পারে নি, তখন এরা কর্ম্মঠই বা হ'বে কোত্থেকে আর দৃঢ়তাই বা পাবে কোথায় ? মা যে পৃথিবীতে একটির পর আর একটি, তারপর একটি এমনি করে সন্তানকে সব জিনিষে তৈরী করে নেন্—যেমন পাখিটি তার শাবককে ডানার পাশে পাশে খানিকটা করে উড়িয়ে আবার বাসায় ফিরে আসে। আবার নে যায়, আবার ফিরে আসে, যতদিন না বাছাটি নিজের ডানায় ভর দিয়ে ঐ আকাশে বেড়িয়ে বেড়াতে পারে ; যতদিন না সে অসংখ্য শত্রু, বিপদ-আপদ সব বাঁচিয়ে নিজের আহারটি, নিজের বাসাটি দেখে নিতে পারে।

রাত্রি অনেক হইয়া গেছে, যখন কথাবার্ত্তা শেষ হইল দশটা বাজে। হেরম্বনাথ সুনীলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হ্যাঁমা অন্নপূর্ণা, খগেন এত রাত্রে মেসে গিয়ে দু'টো কড়কড়ে ভাত খাবে?

ফেণিলা সোল্লাসে বলিয়া উঠিল—কেন, আমরা কি ওঁকে খাওয়াতে পারি না!

সুশীলা বলিল—সেই ভালো, খগেন, এইখান থেকেই যা হয় দু'টো খেয়ে যাও। সুনীলা······

সুনীলা বলিল—খাবার যথেষ্টই আছে, তবে উনি যদি······

খগেন বলিল—বাসায় ভাতগুলো নষ্ট হ'বে বড়দি!

হোক্ গে যাক্। যেতেই যে বারোটা বেজে যাবে।

সুনীলা বলিল—আর ভাত ত নয় আমাদের বাড়ী—লুচি, রুটী সব রকমই আছে।

খগেন ব্যথাক্ষুব্ধ মুখে কহিল—আমি যে রাত্রে ভাত ছাড়া কিছুই খাইনে।

আর কেহই কোন কথা কহিল না। খগেন্দ্র কিংকর্ত্তব্য ভাবিতে ভাবিতে দাঁড়াইয়া উঠিল, এবং সোজা দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া বলিল:—আমি যাই জ্যেঠাম'শায়!

হেরম্বনাথ মেয়েদের মুখের পানে চাহিতে চাহিতে বলিলেন—যাবে! তাইত! যাবে!

ফেণিলা বলিল—আপনি কি কখনো কোথাও নেমন্তন্ন যান্ না, খগেন বাবু? আমাদের বাড়ীর নেমন্তন্ন হলেই হয় আপনার শিরঃপীড়া, নয় পেটের পীড়া·····

সুশীলা হাসিয়া বলিল—ঠিক বলেছিস্ নীলা! হাঃ হাঃ।

হেরম্বনাথ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলেন, বলিলেন—তাহ'লে আর রাত করো না বাবা!

খগেন—আজ্ঞে না—যাই—বলিয়া পুনরায় হাত তুলিতেই ফেণিলা বলিল—খেয়ে যাবেন না বুঝি?

না, নীলা, ওঁকে বাসায় যেতেই হ'বে। কোথাও খাওয়া খগেনের সহ্য হয় না।—বলিয়া হেরম্বনাথ সিঁড়িতে নামিতে লাগিলেন। সুশীলা, সুনীলা, ফেণিলা—তিনজনেই সেখানে মূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

দরজার কাছে আসিয়া হেরম্বনাথ বলিলেন—কাল সকালে, সময় করে একবার আস্‌তে পারবে কি খগেন?

পারব।

তাহ'লে আটটা, এই রকম সময়ে এসো। একটা বিশেষ কথা আছে।

উপরে উঠিয়া আসিতেই সুশীলা জিজ্ঞাসিল—তোমার খাবার দেওয়া হ'ক বাবা?

হ'ক্—বলিয়া হেরম্বনাথ বারান্দার সুইচটি অফ্ করিয়া অন্ধকারে চুলের মধ্যে আঙ্গুল পুরিয়া আকাশের পানে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন।

ফেণিলা কি একটা বলিতে আসিতেছিল, পিতাকে তদবস্থ দেখিয়া ফিরিয়া গেল। সুনীলা ডাকিল—বাবা!

যাই মা, বলিয়া হেরম্বনাথ চটি জুতাটা পরিয়া নামিয়া গেলেন। রান্নাঘরের পাশে খাবার-ঘরে মেয়েরা অপেক্ষা করিতেছিল, হেরম্বনাথ আসনে বসিবার পূর্ব্বেই বলিলেন, খাওয়া দাওয়া নিয়ে ওকে তোমরা

প্রীতির

নিদর্শন

পীড়াপীড়ি ক'র-না মা। আমি ওর বাবাকেও জানি, ওকেও জানি। ওরা নিজের মত বদলাবার লোক-ই নয়। আর, যদি ওর এই শুচিতাটুকু রেখে-ও সন্তুষ্ট হয়—থাক্ না-মা! বেশ ত!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

স্রোতের মুখে।

পরদিন মাঠে হঠাৎ দেখা গেল, খগেন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ফেণিলা সুনীলাকে চাপিয়া ধরিয়া বলিল—কেমন-ভাই মেঝ্, বলি নি আমি?

সুনীলা কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে ক্ষুণ্ণই হইয়াছিল। কেন সে আসিল? তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে আসিতে কেই-বা বলিয়াছিল। না-আসিলে কি এমন মন্দ হইত? সুনীলা কোন কথা কহিল না। ফেণিলা আনন্দাতিশয্যে একবার গ্যালারীর শীর্ষে, একবার মাঠের মাঝে—ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

প্রথম দিনটি তাহারা কেবলমাত্র ঘোড়দৌড় দেখিতে গিয়াছিল। কিন্তু পরের শনিবারে তাহারা দু'পাঁচ টাকার বাজীও ধরিয়া ফেলিল। ভাগ্যদেবী বোধ করি সে'দিন ইহাদের প্রতি প্রসন্নই ছিলেন, কমবেশী দশ পনেরো কুড়ী টাকা জিৎ খেলার শেষে সকলেরই রহিয়া গেল। এইখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক হইতে পারে যে, এই ঘোড় দৌড়ের মত সজীব জুয়ায় দু'রকমের লোক মাতিয়া ওঠে! একদল, যাহারা প্রথমেই কিছু লাভ করিতে পারে, অন্য দল—যাহারা প্রথমেই মোটামুটি হারিয়া আসে। প্রথম দলের নেশা চাপে, এবার পাঁচ আসিল, সুবিধামত ধরিলে যে পঞ্চাশ, চাই কি, পাঁচ শ' না আসিবে তাহার স্থিরতা কি? শেষের দল দেখে, অমুক এত পাইল, তত পাইল, আমার যে এতগুলি

গেল, একদিন ত হারটা না উঠাইলে চলিতেছে না। এই সময়ে এই প্রতিজ্ঞাও তাহারা করে যে, যা হইবার হইয়াছে, হারটি উঠিলে আর মাঠের পথে চলিবে না। কালে দেখা যায়, মন্তপের মন্ত ত্যাগ, চোরের সাধুতা অবলম্বনের মতই তাহাদের ভীষ্ম প্রতিজ্ঞাসমূহ অতলে ভাসিয়া গেছে।

তবে ইহাদের পক্ষে অন্য কথাও খাটিতে পারে, ঘোড়দৌড়ের মধ্যে যে সজীবতা আছে, বোধ করি ফুট-বল ক্রিকেট ম্যাচের মধ্যেও তাহা নাই। হ্যাঁ, ভিন্নজাতির বিপক্ষে স্বজাতির ফুটবল ম্যাচে আমাদের আন্তরিকতা পূর্ণ মাত্রায় ফুটিয়া উঠে সত্য, কিন্তু স্বার্থের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে, রেশের মত এমন উপাদেয় স্বার্থপূর্ণ খেলা কুত্রাপি নাই।

এ শনিবারে খগেন আফিস হইতে মাঠে গিয়া দেখিল, সিংহ সাহেবের পার্শ্বে সুশীলা, এবং অল্পদূরে বাহু-সম্বদ্ধ হইয়া সুনীলা ও ফেণিলা গ্যালারীর ঠিক নীচেই দাঁড়াইয়া আছে। ফেণিলা খগেনকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিল—তিনি কৈ, খগেনবাবু?

খগেন একদৃষ্টিতে যতদূর পারে মাঠটা দেখিয়া লইয়া বলিল—কি-জানি!

সিংহ সাহেব বলিলেন—এই যে খগেনবাবু এসেছেন। কৈ - টিপ্ টাপ বলুন দু'চারটে! শুনে নিই আমরা।

খগেন বিদ্রূপটা মানিয়া লইল বটে, কিন্তু ফেণিলা সুদশুদ্ধ আসলটা তৎক্ষণাৎ ফিরাইয়া দিল। বলিল—খগেন বাবুর কাছে টিপের প্রত্যাশা করে' ত আর আপনি বাড়ী থেকে আসেন নি, ঘনশ্যাম বাবু। আপনার কত লোক আছে—ভাবনা কিসের?—বলিয়া সে ম্লানমুখী

খগেনকে জিজ্ঞাসিল—তিনি ত এইখানেই থাক্‌বেন—বলেছিলেন না?

খগেন আস্তে আস্তে কহিল—হ্যাঁ! তবে তার দেরী আছে। থার্ড রেশ পর্য্যন্ত তিনি গ্র্যাণ্ডেই থাকবেন বলেছেন।

ফেণিলা জিজ্ঞাসিল—গ্র্যাণ্ড কি খগেন বাবু?

খগেন সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিল, তাহারা যেমন সেকেণ্ড এন্‌ক্লোজারে রহিয়াছে, ঠিক দক্ষিণে ও বামে আর দু'টি এন্‌ক্লোজার আছে। দক্ষিণেরটি হ'ল—থার্ড, একটাকা প্রবেশ মূল্য; আর যেটি বামে সে'টি গ্র্যাণ্ড, পাঁচটাকা গেটে দিয়ে ঢুক্‌তে হয়,—অধিকন্তু গ্র্যাণ্ডে ধুতি চাদরে প্রবেশাধিকার পাওয়া যায় না। টাই ও টুপির দরকার। ঐ-যে দেখ না, সব সাহেব, মেম।

শুনিয়াই ফেণিলা বলিল—ওখানে বাঙ্গালী যায়?

কেন-যাবে না? বলিয়া সিংহ ভ্রূকুটি করিলেন।—আমি ত আগে বরাবরই যেতুম। এবারে তোমরা আছ বলেই······

না, ঘনশ্যামবাবু আপনার ওখানেই যাওয়া উচিৎ। টাই বেঁধে টুপি এঁটে হংসমধ্যে······

সুনীলা ফেণিলার বাহুস্পর্শ করিয়া বলিল—কি হচ্ছে নীলা?

সুশীলা কোন কথা না বলিলেও, সে যে নীলার প্রতি সন্তুষ্ট হয় নাই, ইহা তাহার মুখের পানে চাহিয়া কাহারই অবিদিত রহিল না। সুনীলা সুশীলার মনের ভাবটি বুঝিয়া ফেণিলাকে ডাকিয়া রেলিঙের ধারটিতে আসিয়া দাঁড়াইল। সেই সময়েই বোর্ডে জকির নাম উঠিতে-ছিল,—খগেন পকেট হইতে সদ্যঃক্রীত চারি আনা মূল্যের রেসিং

গাইডখানি বাহির করিয়া কপিং পেন্সিলে জকির নাম টুকিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

সিংহ সাহেব টিকিট কিনিতে গেলেন, ফেণিলা বলিল—কি খেলবেন, খগেনবাবু?—খগেন খেলিবে না শুনিয়া সে'ও খেলিবে না বলিল। কেবল সুনীলা পাঁচটি টাকা খগেনের হাতে দিয়া বলিল—আমার তরফ, মার্ব্বেল রক্ একখানা ধরে আসুন-না।

খগেন জিজ্ঞাসিল—উইণ?

নিশ্চয়ই। প্লেসে আর দেবে কি!

খগেন চলিয়া গেল। সুশীলা জিজ্ঞাসিল—তোরা বুঝি খেল্‌বি নে?

ফেণিলা বলিল—উঁহু—খগেনবাবু বলেন, হার্ডলে (খানা-পগারে) কে ওঠে পড়ে তার কিছু ঠিক নেই না খেলাই ভাল।

আমরা ধরেছি।

সুনীলা জিজ্ঞাসিল—কি—বড়দি?

ব্রাণ্ডিচক্।

তৃতীয় বাজী শেষ হইবার অল্পক্ষণ পরেই ফেণিলা খগেনের বাহুতে টান দিয়া কহিল—ঐ যে খগেনবাবু তিনি এসেছেন।

খগেন দেখিল। ফেণিলা তাহাকে তখনি টানিয়া লইয়া যাইতে চায়। কিন্তু খগেনের মনের মধ্যে কেমন একটা সঙ্কোচ উঠিয়া তাহাকে পিছাইয়া আনিতেছিল। তাহার একটু কারণও হইয়াছিল। নীলা যে সময়ে খগেনকে আগন্তুকের আগমন বার্ত্তা বিজ্ঞাপিত করিল, ঠিক সেই সময়েই সিংহ সাহেব বারবার তাহার দিকে চাহিয়া মৃদু হাস্য করিতে

লাগিলেন ; মধ্যে ব্যবধানটা একটু বেশী ছিল বলিয়াই বোধ করি এ-যাত্রা বিদ্রূপ বাণটা হইতে খগেন রক্ষা পাইল।

সুনীলাও আগন্তককে দেখিয়াছিল, সিংহ সাহেবের হাসিটাও সে দেখিয়াছিল, সে-ই খগেনকে উৎসাহ দিয়া বলিল—ওঁর সঙ্গে দেখা করুন-না, খগেনবাবু!

খগেন কাছে আসিতেই বীরদৎ সহাস্যে কহিলেন—কি-রকম খেললেন, বলুন?

ফেণিলাকে দেখিয়া বীরদৎ মাথার টুপি তুলিয়া বলিলেন—আজও খেলবেন না-কি?

ফেণিলা বলিল—খেল্‌ব।

তবে ফোর্থ রেসে ঐ ৫নং কিং অব্ বিজ্‌কে ধরে দিন খান কতক।

তাহার মুখের কথাই ইহাদের পক্ষে যথেষ্ট হইয়া গিয়াছিল, তাহারা বিনাবাক্যব্যয়ে খগেনকে টাকা সমেত পাঠাইয়া দিল।

ফেণিলা জিজ্ঞাসিল—আচ্ছা, আপনি এত খবর কোথায় পা'ন্ বলুন-না?

বীরদৎ মৃদু হাসিয়া কহিল—সে আর বেশী কথা কি?

সুশীলা নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসিল—কি ধরলি নীলা?

নীলা বলিল। সুশীলা বলিল—আমরা অন্য একটা ধরেছি। এও দু'খানা ধরব না-কি?

সুনীলা বলিল—দেখই না-দিদি! দশটাকা বৈ ত নয়।

সুশীলা চলিয়া গেল।

দৌড় শেষ হইল। কিং অব বিজ্ পাঁচ টাকায় চৌষট্টি টাকা দিয়া গেল।

সুশীলা ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসিল—এবারে কি খেলবি নীলা?

নীলা বীরদত্তের পানে চাহিতেই বীরদৎ মৃদু হাসিয়া বলিলেন—একটা খুব খারাপ ঘোড়া আছে—ধরবেন? লোকে কিন্তু শুনলে হাসবে।

নীলা বলিল—হোক্—খারাপ—ধরব।

বীরদৎ বোর্ডের দিকে চাহিয়া কহিল—দেশের জ্যাক-কে ব্যাক্ করুন তবে।

সুশীলা বোর্ড দেখিয়া জিজ্ঞাসিল—১১নং—বীরদৎ?

বীরদৎ খগেনের দিকে চাহিয়া বলিল—আপনারা শেষ অবধি আছেন ত? আমি আস্‌ব'খন শেষের দিকে।

মরি বাঁচি করিয়া এবং কেবলমাত্র সুশীলার কথা রাখিতেই সিংহ সাহেব ১১ নম্বরকে দশটাকা ধরিয়া দিলেন। খগেন, সুশীলা ও নীলা প্রত্যেকে দশখানি টিকিট কিনিয়া বেড়ার ধারে দাঁড়াইয়া রহিল।

বিক্রয়ের তালিকায় দেখা গেল, ১১ নম্বরে মাত্র ১৭ খানি বিক্রয়। খগেন বলিতেছিল—প্লেন্ লাসেট্‌কে কেউ ধরেনি নীলা। ঘোড়াটা কোথাও কখনও সেকেণ্ড থার্ডও হ'তে পারে নি। সে উইন্ করবে, এ আর কে বিশ্বাস করবে, বল?

নীলা বলিল—আর কেউ করুক না-ই করুক আমি বিশ্বাস করি।

খগেন বলিল—যদি না আসে?

নীলা বলিল—গেল! তা'তে আমার দুঃখ নেই, খগেন বাবু। আজ ত আর ঘরের পয়সা যায় নি।

সেই এক সান্ত্বনা। কেহই আর কিছুই বলিল না। ঘোড়দৌড় আরম্ভ হইয়া গেল। কেণিলা খাতার সঙ্গে মিলাইয়া জকির কালো জামা ও কালো টুপি খুঁজিতেছিল, কিন্তু দেখিতে পাইল না। একটা লাল পোষাক সর্ব্বাগ্রে ছুটিয়া আসিল, সকলেই তাহার নাম ধরিয়া চীৎকার করিতেছিল। সিংহ সাহেব নিজে সে'টিকে ধরিয়াছিলেন কি-না জানি না, তবে তাঁহার বিরাট বপু কাঁপাইয়া সেই নামটিই তাঁহার কণ্ঠে পুনঃপুনঃ নিনাদিত হইতেছিল।

সুশীলা বলিল—আমি বলেছিলুম...

সিংহ সাহেব সহাস্যে ডাকিলেন—ও নীলা-নীলা!

নীলার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল—একমুহূর্ত্তের জন্য। তারপরই দেখা গেল, কালো জামা কালো পোষাক সর্ব্বাগ্রে দেখা গিয়াছে। নীলা প্রাণপণ শক্তিতে চীৎকার করিয়া উঠিল—বীরদৎ! বীরদৎ।

নম্বর উঠিল—১১

সিংহ সাহেব মুখখানা হাঁড়ীর মত করিয়া বলিলেন—খগেন বাবুর বরাতটা দেখ্‌ছি খুবই ভালো।

এই সময়ে সেই লোকটি আসিয়া দাঁড়াইলেন। খগেন হাসি মুখে অগ্রসর হইতেই ভদ্রলোক কার্ড কেস্‌টি খুলিয়া একখানি কার্ড বাহির করিয়া কহিলেন—এইতেই আমার নাম ঠিকানা পাবেন, যদি কখনো দরকার হয়...বলিয়া কার্ডখানি খগেনের হাতে দিয়া, টুপি তুলিয়া কহিলেন—নমস্কার, নমস্কার।

খগেন যখন কার্ডটি পাঠ করিয়া চক্ষু তুলিল, ভদ্রলোক দৃষ্টিচক্রের বাহিরে। খগেন নীলার হাতে কার্ডটি দিয়া বলিল—আমি আস্‌ছি, নীলা।

প্রীতির
নিদর্শন

নীলা পাঠ করিল :—

মিঃ বীরদৎ

টারফ্ ক্লাব	কাঠখোলা
কলিকাতা	দত্তবাটী।

খগেন আসিয়া বলিল—তোমাদের ওখানেই একদিন আসতে বলে এসেছি নীলা!—সুশীলার দিকে ফিরিয়া বলিল—উনি একদিন আসবেন, বলেছেন।

বেশ ত!

আর জান দিদি, সেদিন কাগজে বেরিয়েছিল, বিলেতে বীরদৎ ডারবি খেলায় ঘোড়দৌড় করতেন!

সুনীলা বলিল—সত্যিই কি উনি বাঙ্গালী?

ফেণিলা বলিল—বাঙ্গালী বৈ কি! দেখলি নে মেঝ, তখন আমায় বল্লেন—স্বজাতিকেই ব্যাক্ করুন।

এই সময় হেরম্বনাথ উপস্থিত থাকিলে, নিশ্চয়ই বলিতেন—তা'হলে এখন চল্ল, কি-বল-হে!

সত্যই সেদিন যখন খেলা-শেষে তাহারা ট্যাক্সি চড়িয়া হাসিমুখে গৃহে ফিরিতেছিল, তখন তাহাদের মুখে কেবল মাত্র বীরদত্তেরই আলোচনা জাগিয়া রহিল। বীরদৎ সুপুরুষ, শক্তিমান, তদুপরি রেশ্‌গামীদের সৌভাগ্য দেবতার মত, সুতরাং এই নবীন জুয়াড়িরা যে তাহারই প্রসঙ্গ আলোচনায় মাতিয়া উঠিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কি আছে?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জুয়াড়ি।

সেদিন সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে খগেন ট্রামে চড়িয়া আফিস্ হইতে ফিরিতেছিল। সে সময়ে প্রায়ই খালি ট্রাম মিলে না, জানি না কেন—এইখানা খালি ছুটিতেছিল। সামনের বেঞ্চে দুইটি মাড়োয়ারী বসিয়া নিম্নস্বরে কথাবার্ত্তা কহিতেছিল—তাহারা মাঝে মাঝে খগেনের দিকেও সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিতেছে।

আকাশে মেঘের ঘনঘটার দিকে চাহিতে চাহিতে তাহাদের কথা চলিতেছিল। হঠাৎ একসময়ে খগেন শুনিতে পাইল—দশ্ সে হাজার।

আবার শুনিল—সাত বাজে সে দশ বাজে তক্।

জরুর।

খগেন শুনিয়াছিল—মাড়োয়ারীদের মধ্যে জলের খেলার বাজী প্রচলিত আছে। একপক্ষ একটা সময় নির্দ্দেশ করিয়া বলে—অমুক সময় হইতে অমুক সময় মধ্যে যদি বৃষ্টি হয়, তবে সে এতটাকা দিতে প্রস্তুত আছে; অপর পক্ষ তাহার বিপক্ষে আর একটা বাজী রাখে।

খগেন আকাশের কৃষ্ণ মেঘের পানে চাহিয়া দেখিল, বৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী। আকাশের কোনদিকে কোথাও একটুকু ফাঁক নাই—কৃষ্ণ মেঘে ভরিয়া গেছে।

খগেন বলিল—দশটার ভিতর বৃষ্টি না হইয়া যায় না।

একজন মাড়োয়ারী উৎসুক হইয়া বলিল—বাজী ?

খগেন আর একবার আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল—আপনি বলুন ?

মাড়োয়ারী বলিল—হাজারে পাঁচ।—পাঁচের দর !

খগেন বলিল কত ? দু'হাজারে দশ ?

মাড়োয়ারী বলিল—আইয়ে ! নগদ ?

খগেন পকেট হইতে সেভিংস ব্যাঙ্কের খাতাখানা মাড়োয়ারীকে দেখাইয়া বলিল—দু'হাজার একশো আছে।

মাড়োয়ারী খাতাখানা লইয়া টুপ্ করিয়া নামিয়া তাহাকে অনুসরণ করিতে বলিল। অনেক গলি ঘুঁজি পার হইয়া, গোলক ধাঁধায় ঘুরিয়া, খগেন একটা অন্ধকার বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। অন্ধকারে সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে দু'তিনবার সে পড়ি পড়ি হইয়াছিল, মাড়োয়ারীটি তাহাকে ধরিয়া উপরে লইয়া আসিল। তাহাদের হস্তধৃত হইয়া যে ঘরটায় সে নীত হইল, সে যেন অন্ধকার বাড়ীর ঘরই নহে। ঘরে কম্ করিয়া পাঁচটি ইলেক্‌ট্রিকের ঝাড় জ্বলিতেছে, সুদৃশ্য কাশ্মিরী কার্পেট মেঝেয় পাতা, চার কোণে চারটি বুক্ কেস্, একধারে বেজ্ বসানাবৃত সেক্রেটেরিয়েট টেব্‌লের আশে-পাশে পাঁচ সাতখানা মেহগ্নি চেয়ার, টেব্‌লের উপর কাঁচের ফুলদানিতে একঝাড় সিজন্ ফ্লাওয়ার।

খগেনকে কক্ষে বসাইয়া মাড়োয়ারী জিজ্ঞাসিল—কুছ্ 'পাণি উনি ?'

এই সময়ে সে প্রত্যহ-ই হেরম্বনাথের বাসায় এক পেয়ালা চা আর কিছু না কিছু খাইতই, কিন্তু অপরিচিত স্থানে, অত্যন্ত ক্ষুধা স্বত্বেও কিছু খাইতে পারিল না।

সাতটা বাজিতেই মাড়োয়ারী বলিল—বাজী আরম্ভ।

অন্য মাড়োয়ারীটি ও খগেন সায় দিল।

মাড়োয়ারী খগেনের ব্যাঙ্কের খাতা খগেনকে দিয়া জিজ্ঞাসিল—ফরম আছে আপনার কাছে?

খগেন সেইদিনই ব্যাঙ্কে টাকাটা গচ্ছিত করিয়া আসে, কয়েকখানা উইথ্‌ড্রয়াল ফর্ম্মও সে আনিয়াছিল, বলিল—আছে।

মাড়োয়ারী বলিল—দু'হাজার টাকার একখানি ফর্ম্ম তৈয়ার করুন!

সে নিজে একখানা চেক্‌ বহি বাহির করিয়া বেয়ারার চেক্‌ কাটিয়া খগেনের সামনে ধরিয়া বলিল—এই নিন্‌, আমি দশহাজারের বেয়ারার চেক্‌ কাটিয়া দিলাম।

খগেন কলমটা তুলিয়া লইল। হাতটা একটু কাঁপিল, বুকের মাঝে যেন একটা কাঁটার মত কি খচ করিয়া উঠিল। তখনি মনে হইল, এ ত ঘরের পয়সা নয়, রেশেই ত জিতিয়াছি, না-হয় জুয়ার পয়সা জুয়াতেই গেল।—খগেনের স্মরণ ছিল এ কথা কেণিলাই তাহাকে একদিন বলিয়াছিল। তবুও, হাতটা—কাঁপিল বৈ-কি; বুকটাও একটু কাঁপিল যে! এতটা টাকা, খুড়তুতো বোন্‌টির বিবাহ আসন্ন! যাইবে?

তখনি মনে হইল, যাইবে কেন? বৃষ্টি নিশ্চয়ই হইবে। তখন দশহাজার আমার।

অন্য মাড়োয়ারীটির সঙ্গেও দেনা পাওনা মিটিয়া গেল। খগেন একবার করিয়া ঘড়ির পানে, আর একবার বাহিরে আকাশের পানে চাহিয়া দেখে। আট্‌-টা বাজিল, সাড়ে আট্‌-টা,—ক্রমে ঢং ঢং করিয়া ন'টা'ও বাজিয়া গেল। আকাশ কালো করিয়া মেঘ যেমন জমিয়া ছিল, তেমনি রহিয়া গেল। খগেনের অন্তরাত্মা শুকাইল। না—না—ঐ যে,

ঐ যে! ঐ বাতাস উঠিয়াছে। চারিদিকের খড়খড়ি জানেলা পড়ার ঝন ঝন্ শব্দে কাণে তালা লাগিবার উপক্রম হইল। খগেন রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ প্রবল বায়ু বহিয়া বন্ধ হইয়া গেল। তখন মাড়োয়ারীটিরও মুখ শুকাইয়া উঠিয়াছে। সে তাড়াতাড়ি বাহিরে উঠিয়া আসিল। খগেনও বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। মাড়োয়ারী জিজ্ঞাসিল—কেত্তা বাজা হ্যায়?

খগেন ঘড়ি দেখিয়া বলিল—পৌনে দশ।

মাড়োয়ারী সোল্লাসে কহিল—বহুৎ খুব।

খগেন আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিল, মেঘ কাটিয়া শরতের নীলাকাশে ঘোমটা-টানা নববধূটির মত লজ্জারঙীন মুখে চাঁদ প্রকাশ পাইতেছে। দেখিয়াই সে ধপাস্ করিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল।

দশটার পর একরকম সর্ব্বস্বান্ত হইয়া টলিতে টলিতে বাসায় ফিরিয়া গেল। তাহার ঘরের টাকা নয় বটে, কিন্তু এই টাকাটা লইয়াই সে কত না আকাশ কুসুম করিতেছিল। কালও সে, দেশে খুড়ীমাকে লিখিয়াছে, আপনি নিভার পাত্র স্থির করুন। আমি হাজার দুই টাকার সংস্থান করিয়াছি। কাল সত্য সত্যই তাহার দুই হাজার টাকা ছিল, আজ সে—নিঃস্ব। সে পুরুষ মানুষ, সবই তাহার সহ্য হইবে, কিন্তু চতুর্দ্দশবর্ষীয়া অনূঢ়া কুমারীর জননী, নিভার মা, তাহার খুড়ীমা—তিনি যে কেবলমাত্র তাহারই মুখের পানে চাহিয়া আছেন, তিনি? তিনি কি মনে করিবেন? তিনি কি ভাবিবেন না যে, খগেন প্রতারণা করিয়াছে!—নিভা তাহার আপনার ভগ্নী নহে বলিয়াই সে এমন দুর্ব্ব্যবহারটা করিতে পারিল!

প্রীতির

নিদর্শন

মেসের বাসার ঠাকুর থালার উপর ভাত রাখিয়া কাঁসি চাপা দিয়া, জলের গ্লাসের উপর বাটিতে খানিকটা দাল রাখিয়া যথাসময়ে বাসায় চলিয়া গেছে। মেসের ঝিরা-প্রায়ই রাত্রে থাকে না,—ভাতের থালায় গামছা চাপাইয়া স্বগৃহে গমনান্তর আহারে বসে। খগেনের আহারে ইচ্ছা ছিল না,—নতুবা ঝি ও ঠাকুর উভয়ে মিলিয়া যে কাণ্ডটি আজ করিয়া গিয়াছিল, তাহাতে 'মরা মানুষের রক্ত' ও গরম হইয়া উঠিত।

ঠাকুর ভাত বাড়িতে গিয়া ভুলবশতঃ হাঁড়ী পরিষ্কার করা ভাতটিই কাঁসি চাপা দিয়াছে, ঝি জলের পরিবর্ত্তে গ্লাসে খানিকটা দধি রাখিয়া গেছে। মেসের ম্যানেজার সত্যচরণবাবু দিবা-রাত্রে অর্দ্ধসের দধি ভোজন করিতেন। তাহারই কতকাংশ শ্রীমতী সৌদামিনীর নিত্যনৈমিত্তিক বরাদ্দের মধ্যে ছিল—আজ ভ্রম-বশতঃ দধির গ্লাসটি ফেলিয়া সে একটা জলের গ্লাসই লইয়া গিয়াছিল।

খগেন এ-সবের কিছুই জানিতে পারিল না। সে জামা-জুতা খুলিয়া অন্ধকারে হাঁতড়াইয়া বিছানাটা পাতিয়া, দু'হাতের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া শুইয়া পড়িল।

টাকাটা গিয়াছে বলিয়া তাহার দুঃখ নহে, সে খুড়ীমার কথাই ভাবিতেছিল। আজই হ'ক, কালই হ'ক যদি তাঁহার পত্র আসে—'আমি পাত্র স্থির করিয়াছি, ত্বরায় তুমি টাকা লইয়া আসিবে'—তখন সে কি করিবে?

শুধু তাই নয়। হেরম্বনাথের কথাগুলিও তাহার মনে পড়িয়া গেল। তিনি ত এই আশঙ্কাই করিয়াছিলেন। জুয়ার পরিণাম এইরূপ হইয়া থাকে—তাঁহার কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়া গেল।

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত সে বিছানায় পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। অন্য একটা ঘরে হরিচরণবাবু অনেক রাত্রে কোথা হইতে আসিয়া ভুল বকিতেছিলেন, তাহারই এক একটা শব্দ মাঝে মাঝে খগেনের বুকটিকে আলোড়িত করিয়া তুলিতেছিল। হরিচরণ বাবুরও বোধ করি সে রাত্রে কিছু টাকা খোঁওয়া গিয়াছিল, তিনি তাহারই উল্লেখ করিয়া বার বার বলিতেছিলেন—আমাকে ফাঁকী দেওয়া! ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি? তোমার ভিটে মাটি চাঁটি না করি ত আমার নামই হরিচরণ চাটুর্য্যে নয়। বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা……ইত্যাদি!

খগেন একবার ভাবিল—ইংরেজ রাজত্বে জলের খেলা, তুলার খেলা এ সমস্ত জুয়া নিষিদ্ধ। ইচ্ছা করিলেই সে মাড়োয়ারীদের পুলিসে ধরাইয়া দিতে পারে। বাড়ীটা বা রাস্তাটা তাহার মনে নাই বটে, তবে ব্যাঙ্কে যখন তাহারা টাকা তুলিতে যাইবে, তখন ত অক্লেশে ধরাইয়া দেওয়া যায়। তা না যাক্‌ টাকাটার পেমেণ্ট বন্ধ করা চলিতে পারে। তাহা হইলে তাহার টাকাটি ত বাঁচিয়া যায়।

আবার ভাবিল, না—কাজ নাই। ঐ টাকাটা গিয়া তাহার বড়ই উপকার হইয়াছে। আর সে জুয়ার নামও করিবে না। অন্ধকারে যুক্তকর কপালে ঠেকাইয়া বলিতে লাগিল—হে দয়াময় দয়া কর। আমার মনে বল দাও, আর নয়, আর নয়। জুয়ার পয়সা জুয়াতেই গেছে, যাক্‌—আর যেন ও নেশা আমাকে পাইয়া না বসে, দয়াময়।

দয়াময় সেই অন্ধকারেই যে হাসি-টা হাসিলেন, মানুষ-খগেন শুধু অন্ধকার বলিয়াই সে'টি দেখিতে পাইল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নীলার উৎকণ্ঠা।

তিন-চারিদিন পরে সন্ধ্যাকালে খগেন আসিতেই সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠিল—এই যে খগেনবাবু! এতদিন কি হ'য়েছিল আপনার?

হেরম্বনাথ আরাম চেয়ার হইতে উঠিয়া বসিয়া বলিলেন—তুমি কি ভালো ছিলে না খগেন? তোমার চেহারাটা ত বেশ সুবিধের বোধ হ'চ্ছে না। অসুখ বিসুখ……

খগেন বলিল—আজ্ঞে না, অসুখ এমন কিছুই না। তবে আফিসে বড্ড কাজ পড়েছে। যেতে হয় সেই ন'টার সময়, আস্‌তে রাত্রি দশটা বেজে যায়।

ফেণিলা বলিল—এমন চাকরী করেন কেন?

খগেন মৃদু হাসিয়া বলিল—ভালো চাকরী পাই না বলে।

না:, চেষ্টা করলে আবার পাওয়া যায় না! আপনার যেমন কথা।

সুনীলা উঠিবার উপক্রম করিতেছিল, ফেণিলা তাহার হাতটা ধরিয়া বলিল—ক পেয়ালা চা জমেছে, মেঝ?

সুনীলা বলিল—চারদিনের চার কাপ্‌।

ফেণিলা বলিল—খগেনবাবুর চার কাপ্‌, আমার এক, বাবার দুই, তোর এক—এই সাত কাপ্‌ করিস্‌। বড়দি'র ত এখনও দেখা নেই।

খগেন জিজ্ঞাসিল—চার কাপ্‌ খেতে হ'বে?

ফেণিলা বলিল—হ'বে না? বাঃ রে!

আচ্ছা দিন। বড়দি কোথায়?

তিনি সিঙ্গী সাহেবের বাড়ী গেছেন। সেখানেই চা খাবেন—বোধ করি।

খগেন একবার হেরম্বনাথের দিকে চাহিয়া লইল। তিনি সম্পূর্ণ নির্ব্বিকারচিত্ত। দু'টি হাতের দশটি আঙ্গুল একত্র করিয়া আকাশের পানে চাহিয়া কি ভাবিতেছিলেন।

ফেণিলা জিজ্ঞাসিল—এখনও আফিসে রাত্রি হ'বে ত?

খগেন বলিল—বোধ হয় হ'বে।

ফেণিলা আর কিছুই বলিল—না। মুখখানা ভার করিয়া বসিয়া রহিল।

সুনীলা এক পেয়ালা চা খগেনের সামনে ধরিয়া দিয়া বলিল—চার পেয়ালা চা রাত্রে খেলে আর খাওয়া দাওয়া করতে পারবেন না—বুঝলি নীলা?

ফেণিলা সে কথার কোনই উত্তর দিল না। সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করিল না। নিজের পেয়ালাটি নিঃশেষ করিয়া ঘরে উঠিয়া গেল এবং অনেক দিনের পরে এ-হেন সময়ে কতকগুলা বহি খুলিয়া আড়ম্বর করিয়া পড়িতে বসিল।

খগেন উঠি উঠি করিতেছিল, এমন সময় সিংহ সাহেব, সুশীলা —ইঁহারাও দর্শন দিলেন।

সুশীলা জিজ্ঞাসিল—এতদিন আসেন-নি যে খগেন বাবু?

খগেন কি বলিতেছিল, সিংহ সাহেব তৎপূর্ব্বেই কহিলেন—আসবার

আর সময় পাবেন কোথায় বলুন? আজ কাল আবার জলের জুয়ায় মেতে উঠেছেন উনি।

খগেনের মুখ চোখ্ সহসা রাঙা হইয়া উঠিল, সে কথা বলিতে পারিল না।

সিংহ সাহেব হাসিতে হাসিতে কহিলেন—গরীবের ছেলে, জুয়া টুয়া ছেড়ে দিন, বুঝলেন, খগেনবাবু! দশ-বিশ হাজার থাকৃত—মন্দ হ'ত না। এই যে দু'টি হাজার সেদিন দিয়ে এলেন, তারপর চারদিন একেবারে কলকাতাই ত্যাগ—

সুশীলা জিজ্ঞাসিল—আপনি কলকাতায় ছিলেন না?

সিংহ সাহেব বলিলেন—আমি বল্‌ছি শুনুন-না। আজই বৈকালে এসেছেন।

খগেন আরক্তমুখে বসিয়া রহিল।

হেরম্বনাথ কহিলেন—না, না এইমাত্র খগেন যে বল্লে আফিসের কাজ পড়েছে, আস্‌তে রাত হয়······

সিংহ সাহেব বলিলেন—কৈ, বলুন-না শুনি?

খগেন কথা কহিল না। ঘর একেবারে নিঃস্তব্ধ। কেণি না বহিপত্র ফেলিয়া দ্বারের পাশটিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সেদিকে খগেনের চোখ্ পড়িতেই চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। কেবলমাত্র হেরম্ব বাবুকে একটা নমস্কার করিয়া সে চুপ চুপ করিয়া নীচে নামিয়া গেল।

সিংহ সাহেব হেরম্বনাথকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—দেখলেন ত ব্যাপারটা?

হেরম্বনাথ চুলের মধ্যে আঙ্গুল পুরিয়া ক্রমাগত টানাটানি করিতে লাগিলেন। দু'তিন মিনিট পরে জিজ্ঞাসিলেন—কিসের খেলা বল্লেন ?

জলের। বৃষ্টি হ'বে কি-না—তা'তেও জুয়া চলে কি না। বেশ মোটা রকমেরই জুয়া। মেছোবাজার গ্যাঁড়াতলার গুণ্ডারা খেলে।

হেরম্বনাথ নীরব।

সুশীলা বলিল—আর কলকাতা ছেড়ে কোথায় গেছলেন—বলছিলেন যে ?

সিংহ সাহেব বলিলেন—সে খবরটা পাই নি এখনও ঠিক। তবে কলকাতায় ছিল না—এটা নিশ্চয়ই। দেখলেন ত ?

তা ত দেখলুম—বলিয়া সুশীলা ফেণিলার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল।

সিংহ সাহেব হাসিতে হাসিতে বলিলেন—আর বোধ করি—এদিকে আসছে না-ও। অন্ততঃ যত দিন আমি আছি, কি বলেন ?

হেরম্বনাথ ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—অবশ্য, খগেন জুয়া খেলে অন্যায় করেছে, কিন্তু তার জন্যে আমি দুঃখিত নই। জুয়া—জুয়া ! ও রেশ-ও যা, এ'ও তা। কিন্তু গোপন করার কি অভিসন্ধি থাকতে পারে এবং মিথ্যা বলাই বা কেন ?

ফেণিলা তাঁহার পাশটিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে-ই বলিল—না বাবা, এখনি একে মিথ্যে বলা যায় না। অন্ততঃ বিশেষ রকম প্রমাণ না পেলে······

আবার কি প্রমাণ চান ? ওর পালানো দেখে বুঝলেন না ?

ফেণিলা সিংহ সাহেবের কথায় কাণ না দিয়াই বলিল--বাবা, অন্য একসময়ে তাঁর কাছে সব কথা শুনে—কি-বল ?

হেরম্বনাথ বলিলেন—তা ত শুন্তেই হ'বে। আমি কালই বিকেলে তা'কে সঙ্গে করে' ডেকে আন্‌ব'খন। জুয়া সে খেল্‌তে পারে—ও সর্ব্বনেশে নেশা যার একবার ঢুকেছে তার আর নিস্তার নেই—কিন্তু সে মিথ্যে বল্‌বে না! তার বাপের চরিত্র আজ পর্য্যন্ত আমার সামনে জ্বল্ জ্বল্ করছে দরিদ্র ছিলেন বটে কিন্তু সত্যকে তেমন করে জীবনের মন্ত্র করতে খুব অল্প লোককেই আমি দেখেছি।

ফেণিলা বলিল—না বাবা, খগেন বাবুও মিথ্যা বল্‌বেন না।—এ আমি নিশ্চয় বল্‌তে পারি।

সুশীলা বিরক্ত হইয়া বলিল -তুই ত সব জানিস্ নীলা!

ফেণিলা সে কথার জবাব না দিয়াই বলিল—কাল বিকেলে তাঁর বাসায় তুমি যাবে ত বাবা!

যাব বৈ কি-মা! বিকেলেই যাব।

সিংহ সাহেব বলিতেছিলেন—সাহসকেও বলিহারী! মেছোবাজারের গুণ্ডাদের সঙ্গে কথা কইতেই আমাদের ভরসা হয় না, উনি কি-না গেলেন, তাদের সঙ্গে জুয়া খেল্‌তে! আবার রাত্রে যখন মেসে ফিরলেন, তখন মুখের গন্ধে চৌদিক আমোদ করছে, পা দু'টি টলমলায়মান, চক্ষু রক্ত বর্ণ।

ফেণিলা কি বলিতে যাইতেছিল, সুনীলা তাহার হাত ধরিয়া ঘরে আনিয়া বলিল—চ' নীলা, আমরা নীচে যাই।

ফেণিলা বলিল -কেন যাব? কে-ও? কেন ও যা-তা বলে আমাদের

প্রীতির

নিদর্শন

খগেন বাবুর নিন্দে করবে ? ওর সঙ্গে ত আমাদের সেদিনের আলাপ। আর খগেন বাবুর……

তা হ'ক। চ', নীচে যাই। ছিঃ ! ঐ রকম করে' বল্‌তে আছে !

—বলিয়া একরকম টানিতে টানিতেই সুনীলা তাহাকে নীচে লইয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ঘোড়া-ভূত।

সুশীলা নীচে আসিয়া সুনীলাকে জিজ্ঞাসা করিল—কাল শনিবার—মাঠে যাবি, সু?

সুনীলা, নীলার মুখের পানে চাহিয়া, বলিল—তোমরা যবে দিদি?

আমরা ত যাবই। উনি জিজ্ঞাসা করছেন—তোরা যাবি? নীলা বোধ হয় যেতে পারবে না।

এ কথায় নীলা সোজা হইয়া উঠিল, বলিল—পারবো না, নয় দিদি। যাব-না। কি কুক্ষণে যে ঐ ঘোড়াভূত ঢুকেছিল এসে……

সুনীলাও নীলবর্ণ হইয়া গেল। সুশীলা বলিল—তোর কি বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পাচ্ছে নীলা?

না, দিদি, বুদ্ধি আমার যেমন ছিল, তেমনিই আছে! সে জন্যে ভেবো না। আমি বল্‌ছি কি, ঘোড়াভূত না চাপ্‌লে খগেন বাবুরও এমন দুর্দ্দশা হ'ত না, আমাদেরও……

তোদের আবার কি হল তাই শুনি?

সে শুনে আর কি হ'বে বল! আমরা যাব না—এ নিশ্চয়।

সুনীলা বলিল—আমি যেতে পারি।

সুশীলা আর কোন কথা না বলিয়া ঘর ছাড়িয়া গেল। সুনীলা নীলার গালটি টিপিয়া দিয়া বলিল—সিঙ্গী সাহেবকে ভূত বল্লি!

ফেণিলা আকাশ হইতে পড়িয়া বলিল—সিঙ্গী সাহেবকে! কক্ষ্‌খোনো না—আমি রেশ্‌কে বলেছি।

সুনীলা সস্নেহে বলিল—আমি তা জানি নীলা! কিন্তু দিদি অন্য রকম বুঝেছেন।

তা বুঝুন।

অল্পক্ষণ পরে নীলা বলিল—আচ্ছা ভাই মেঝ, তোমার কি মনে হয়?

সুনীলা জিজ্ঞাসিল—কিসের কি মনে হয়, নীলা?

নীলা বিরক্ত হইয়া বলিল—আমার মাথার, আমার মুণ্ডুর, আবার কিসের?

সুনীলা মৃদুস্বরে কহিল—না বুঝলে কি উত্তর দেব?

আহা! কিছুই জানেন না!

সুনীলা কথা কহিল না। আপন মনে পাণের খিলি মুড়িতে লাগিল। কিন্তু নীলা উত্তরোত্তর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল, পরুষ কণ্ঠে কহিল—ঐ সিঙ্গী সাহেব যা বল্লে……

সুনীলা বলিয়া উঠিল—তা কি জানি!

জানাজানির কথা হ'চ্ছে না ত! তোমার কি মনে হয়—তাই বল না।

তবুও তাহাকে নীরব দেখিয়া নীলা বলিল—ভেতর গোঁজা লোকদের আমি দু'চক্ষে দেখ্‌তে পারি না।—সে উঠিয়া গেল। সুনীলা, পাণ মুড়িয়া একটি ক্ষুদ্র রূপার ডিবায় সেগুলি একটি করিয়া তুলিতে লাগিল। হঠাৎ উপরে একটা গোলমালের শব্দে সচকিত হইয়া উপরে

আসিবার মধ্য পথেই নীলার প্রবল কণ্ঠে শুনিতে পাইল, সে বলিতেছিল :—

পরের কুৎসা করে' আর পরের আলোচনা করে' যারা আমোদ পায় তা'দের বিমর্ষ থাক্‌বার হয় ত কোন সুযোগই হয় না,—কারণ এই বিপুল বিশ্বে তাদের কাছে এক 'আমি' ছাড়া সবই পর, আর এ কাজে শ্রোতার অভাব কোনদিনই কারু হবার সম্ভাবনা নেই।

এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই সুনীলা চলিয়া আসিতে পারিল না। সে ধীর পদে উপরে উঠিয়া আসিয়া নিঃশব্দে দ্বারটির পাশে দাঁড়াইল। শুনিল, সিংহ সাহেব বলিতেছেন—সত্য কথা বলা—সে যারই বিরুদ্ধে হ'ক, কোন দিনই পরনিন্দা নয়, আর এই সামান্য কথা নিয়ে আপনি যে এত বিচলিত হয়ে উঠ্‌বেন—তা জান্‌লে আমি তুলতাম না।

ফেণিলা বলিল—আপনার কাছে সামান্য হ'তে পারে, তাই বলে সকলের কাছেই যে তাই, তার ঠিক কি ?

সিংহ সাহেব যেন অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়াছেন, এমনি স্বরে ও ভঙ্গিমায় বলিতে লাগিলেন—অপনি অকারণ ক্রুদ্ধ হ'য়ে উঠলেন। আচ্ছা, আপনিই বলুন, আমার দোষটা কি হ'য়েছিল ? কি বলেছিলাম আমি ? খগেন বাবু আপনাদের বন্ধু, এ ত স্বতঃই লোকের মনে হ'তে পারে যে তাঁর পতনে আপনাদের কষ্ট হ'য়েছেই। আপনার মুখের বিশুষ্কতা দেখে আমার ত কেবল ঐ মনে হ'য়েছিল।

ফেণিলা আর কিছুই বলিল না। এই আলোচনাটি এইখানে এমন করিয়া থামিয়া গেলে মন্দ হইত না, কিন্তু গমনোদ্যত নীলাকে সম্বোধন করিয়া সিংহ সাহেব কহিলেন—আর পরনিন্দা, পরের আলোচনা প্রভৃতি

যে কতকগুলো কথা বললেন, প্রমান চান আপনি, যে সেগুলোর আলোচনা আমার কৃত নয়। এ আলোচনা আপনার বন্ধুই জাগিয়েচেন, সকলেই তা জানে—কাগজে ছাপাও হ'য়ে গেচে ক'দিন, নৈলে আমি জান্‌ব কোথেকে বলুন ?

সুশীলা জিজ্ঞাসিল—কাগজে ছাপা হ'য়ে গেছে না-কি ?

নৈলে আর বলছি কি ! এ ত বাজারে হৈ চৈ হ'য়ে গেছে একেবারে। কাগজে হেডিংই দিয়েচে "ঘোড়ারোগ।" বল না সুশীলা, চাকর-বাকর কাউকে, আমার গাড়ীতে একটা পোর্টফোলিও আছে, নামিয়ে আন্‌তে।

ঠিক এই মুহূর্ত্তে তিনি সুশীলার বিশেষ আত্মীয় হইয়া অকস্মাৎ 'তুমি' সম্বোধন করিলেন। সুশীলা চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়াছিল, তখনই ফেণিলা দু'পা অগ্রসর হইয়া বলিয়া উঠিল—দাঁড়াও দিদি, আমি যাই আগে। তারপর কাগজটা আনিয়ে দু'জনে পড়ে আমোদ করো।—বলিয়াই সে দ্রুতপদে নামিয়া গেল।

সুশীলা জ্বলন্ত চোখে একবার সিঁড়িটার পানে আরেকবার অদূরে আরাম কেদারায় শায়িত বৃদ্ধপিতার পানে দৃষ্টিপাত করিয়া, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নীচে নামিয়া আসিল। নীলাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল—ও কথাটার মানে কি হ'ল ?

ফেণিলা মুখ না তুলিয়াই জিজ্ঞাসিল—কিসের মানে ?

সুশীলা কি বলিতে যাইতেছিল, নীলা আরক্ত মুখখানি তুলিয়া তখনি বলিল—যা বলবার তা—আমি বলেছি দিদি ! মানে যা বুঝেছ তাই। তার বেশী আমিও জানি নে।

প্রীতির

নিদর্শন

এই সময়ে সুনীলা কাগজ খানি হাতে করিয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল — এই নাও দিদি।

ফেণিলা অকস্মাৎ রুদ্ধকণ্ঠে কেবলমাত্র "তুমিও" — এই কথাটি উচ্চারণ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

সুশীলা দু'মিনিট কাল মূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া সুনীলার হাত হইতে সংবাদ পত্রটি টানিয়া লইয়া উপরে উঠিয়া আসিল।

সিংহ সাহেবের উৎসাহ অনেকখানি কমিয়া গিয়াছিল, সুশীলা আসিয়া কাগজখানি হাতে দিতেই তিনি নবীন উৎসাহে পড়িতে আরম্ভ করিয়া দিলেন।

অধঃপতনের চূড়ান্ত

শিক্ষিত যুবকের পরিণাম।

হেরম্বনাথ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পদচারণা করিতেছিলেন, — এদিকে ফিরিয়া বলিলেন — ওটা থাক্, এখন পড়বার দরকার নেই। আপনি বরঞ্চ ওটা রেখে যান, সুবিধে মত আমরা পড়তে পারব।

সিংহ কাগজখানি ভাঁজ করিয়া রাখিতে ছিলেন, ফেণিলা কোথা হইতে ঝড়ের মত আসিয়া বলিল — না, না, বাবা, ওঁকে পড়তে দাও — নৈলে ওঁর কিছুতেই তৃপ্তি হ'বে না।

সিংহ বলিলেন — আমার তৃপ্তি হ'বে না কেন, নীলা?

সে ত আমার চেয়ে আপনিই বেশী বুঝতে পারচেন, ঘনশ্যাম বাবু। — বলিয়া সে দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

সব শুদ্ধ এক কাণ্ড হইয়া গেল। সিংহ সাহেব মুখখানা কালো

করিয়া, বারবার সুশীলার দিকেই চাহিতে লাগিলেন; সুশীলা পিতার পানে, আর পিতা বোধ করি অন্ধকার আকাশে একমাত্র জগৎপিতারই অন্বেষণ করিতেছিলেন—কারণ এদিকে তাঁহার যে বিন্দুমাত্র মনোযোগ আছে এমন মনে হইল না। তাহা দেখিয়াই সুশীলা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। কিন্তু কি-যে বলিবে, বা-কি—যে করিবে তাহা সে ভাবিয়াই পাইতেছিল না।

সিংহ সাহেব দাঁড়াইয়া উঠিলেন। ব্ল্যাক বিলম্বিত ছড়িটি ও ফেল্ট হ্যাটটি হাতে তুলিয়া, সুশীলাকেই সম্বোধন করিয়া কহিলেন—চল্লাম।

সুশীলা আর একবার পিতার পানে চাহিল, তিনি তখনও পশ্চিমাকাশে ক'টা নক্ষত্রকেই বিশ্বপিতার দৃষ্টি কল্পনা করিয়া নির্নিমেষে সেদিকেই চাহিয়া নীরবে বসিয়া ছিলেন—সুশীলা বলিল—বাবা, উনি যাচ্ছেন।

হেরম্বনাথ ধ্যান ভঙ্গে চমকিত হইয়া বলিলেন—ওঃ—যাচ্ছেন, নমস্কার।

আজ তিনি অত্যন্ত অন্যমনস্ক, তাহা ইহারা দু'জনেও বুঝিতে পারিল। টুপি হাতে সিংহ-সাহেবকে 'নমস্কার' তিনি কোন দিনই করিতেন না।

সুশীলা নীরবে ক্ষিতিতলন্যস্তনেত্রে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, সিংহ নামিয়া গেলেন। তাঁহার মোটর গাড়ীর শব্দ দূর হইতে দূরে লোপ পাইতে, সুশীলা কহিল—

বাবা, তুমি নীলাকে প্রশ্রয় দাও?

প্রীতির

নিদর্শন

হেরম্বনাথ বলিলেন—প্রশ্রয়! নীলাকে! এ কথা কেন সুশীলা?

সুশীলা বলিল—ভদ্রলোককে, বিশেষ করে ওঁর মত গণ্যমান্য লোককে বাড়ীতে অপমান করা ...

অপমান নয়, সুশীলা, অপমান করা ওকে বলে না।

এতেও যদি অপমান করা না-বলে তবে আর কা'কে বলে—তা ত আমারও জানা নেই।

হেরম্বনাথ সুশীলার আদ্রকণ্ঠস্বরে বিস্মিত হইয়া বলিলেন—সুশীলা, তুমি বলছ এ অপমান, আমি কিন্তু তা মনে করি না। অবশ্য নীলার উদ্ধত আচরণে আমিও সন্তুষ্ট নই, কিন্তু অপমান সে করে নি। সে শুধু আলোচনাটা থামাতে চেয়েছিল—ঘনশ্যাম বাবুর কি উদ্দেশ্য জানি না, তিনি বার বার সেটা উত্থাপন করতেই নীলা, হাজার হ'ক—ছেলে মানুষ ত—একটু অসহিষ্ণু হ'য়ে পড়েছিল।

সুশীলা কহিল—তাই বলে মুখের ওপর অমনি করে'......

বাধা দিয়া হেরম্বনাথ কহিলেন—কিন্তু এটা কেন তুমি দেখ্‌ছ না সুশীলা, এই পরিবারে খগেন কতদিনের পরিচিত, তোমাদের কেউ ত তা'কে কম স্নেহ করতে না, তোমাদের কত গাঢ় বিশ্বাসের পাত্র সে—হঠাৎ তার বিপক্ষ আলোচনা শুনে আমিই স্থির থাকৃতে পারি নি—তা নীলা ত শিশু।

সুশীলা ক্ষুব্ধকণ্ঠে কহিলেন—তুমি নীলার দিকটাই টান্‌ছ বাবা, কিন্তু তিনি যে কতদূর অসন্তুষ্ট হ'য়ে গেছেন তা ত তুমি দেখ্‌ছ না। তিনি ত সদুদ্দেশ্যেই বল্‌তে এসেছিলেন আমাদের কাছে, নৈলে খগেনকে,

—তিনি ত চিন্তেনই না, তাঁকে। আমাদের বাড়ী আসা যাওয়া করে, গরীবের ছেলে, চাকরী বাকরী করে' খায়, তার মঙ্গলের জন্যই তিনি তোমার কাছে কথাটা বল্‌ছিলেন, নৈলে সে থাকুক আর যাক্—তাঁর কি, বল ?

হেরম্বনাথ সহসা কোন কথা কহিলেন না। অনেকক্ষণ পরে বলিলেন—সুশীলা, তুমি নীলাকে যতদূর অপরাধী ভাবছ·········

তুমি ভাবছ না, এই ত! সে ত জানি-ই বাবা! তুমি নীলার দোষ দেখ্‌তে পাবেই না।—বলিয়া সে দু'হাতে মুখ ঢাকিয়া অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে কহিতে লাগিল—কিন্তু আমি যে আর মুখ দেখাতে পারব না তাঁর কাছে। আমিই তাঁকে আজ ডেকে এনেছিলাম, আমার সামনেই তাঁকে অপমান করা হ'ল—আর আমি কোন মুখে তাঁর কাছে যাব—কোন্ মুখেই বা স্কুলে ফিরব।

হেরম্বনাথ বলিলেন—সুশীলা, রাঁচির স্কুল তুমি ত্যাগ কর।

সুশীলা মুখ হইতে হাত সরাইয়া সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। হেরম্বনাথ বলিলেন—স্কুলের কাজ নিয়ে তোমার আর দরকার নেই।

সুশীলা জিজ্ঞাসিল—কেন ?

হেরম্বনাথ কহিলেন—কি কাজ তোমার বিদেশে থেকে! আর এমন কাজ, ইচ্ছা করলে তুমি কলকাতাতেও অনেক পাবে, সুশীলা।

সুশীলার মনে হইল, পিতা আসল কথাটি কিছুতেই বলিতেছেন না। অথচ সেইটি জানিয়া লওয়া তাহার বিশেষ প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছিল। সে স্থিরনেত্রে পিতার পানে চাহিয়া বলিল—এতদিন ত এ কথা বল নি বাবা!

হেরম্বনাথ একটু চমকিয়া উঠিলেন; সহসা উত্তর দিতে পারিলেন না।

সুশীলা বলিল—বরং তুমিই বরাবর বল্‌তে, সেখানের জলহাওয়ায় আমার স্বাস্থ্য ভালো থাক্‌বে।

সে ত নিশ্চয়ই, সুশীলা।

সুশীলা আশা করিতেছিল, পিতা হয়ত কথাটি শেষ করিবেন, কিন্তু তিনি মধ্যপথেই থামিয়া গেলেন এবং কথাটা যেন একরকম শেষ হইয়া গেছে, এমনি ভাবে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলেন ও দু'বাহু সম্বদ্ধ করিয়া লম্বা ছাদটিতে পাদচারণ করিতে লাগিলেন।

সুশীলা কিন্তু ঠিকই বুঝিয়াছিল, আজিকার এই যে ঘটনা ঘটিয়াছে, নীলার মত, পিতাও সিংহ সাহেবকেই দোষী করিয়াছেন—ইহাতেই সুশীলার ক্ষোভ বাড়িয়া গিয়াছিল, কিন্তু পিতা মুখে কোন কথাই বলিলেন না—সে'ও প্রতিবাদ করিতে পারিল না।

শুধু নিজের ঘরে ঢুকিবার পুর্ব্বে একবার আগুনের মত তপ্তস্বরে বলিয়া গেল—আমি কালই চলে যাব, বাবা। বিদেশে আমি বেশ থাকি, কোন হাঙ্গামা নেই। এখানে থাকা আমার পোষায় না।

তখনও হেরম্বনাথ কিছুই বলিলেন না। অনেকদিনের পরে আজ বৃদ্ধের বক্ষ মথিত করিয়া যেন অনেকদিনের, অনেক চাপা ব্যথার এক গভীর দীর্ঘশ্বাস উঠিয়া অনন্তে মিলাইয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

রক্ষকের দাবী।

সাড়ে ন'টা বাজিতেই সুনীলা পিতার পাশটিতে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসিল বাবা, তোমার খাবার দিই এইবার?

অন্ধকারে সুনীলা বুঝিতে পারে নাই যে তাহার পিতা নিদ্রিত;—উত্তর না পাইয়া সুনীলা আস্তে আস্তে পিতার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। এ রকম সময়ে কোনদিনই হেরম্বনাথ নিদ্রা যাইতেন না, আজ তাঁহার চিত্ত প্রসন্ন নাই, সুনীলা তাহাও জানিত—কাজেই তাঁহাকে জাগাইবে কি-না তাহাই ভাবিতেছিল—এমন সময়ে ফেণিলা আসিয়া বলিল—বাবা উঠ্‌লেন না মেঝ্‌?

তাহার কণ্ঠস্বরে হেরম্বনাথের তন্দ্রাটুকু ভাঙ্গিয়া গেল। হেরম্বনাথ উঠিয়া বসিয়া ডাকিলেন—নীলা!—সুনীলাকে কহিলেন—তুমি খাবার দেবার ব্যবস্থা করগে মা।

নীলা নিকটে আসিতেই বলিলেন—বোস, নীলা।

নীলা বসিল। হেরম্বনাথ একটি একটি করিয়া বলিতে লাগিলেন—আজ তোমার দ্বারা অতিথির মর্য্যাদা ক্ষুন্ন হ'য়েচে নীলা, তোমার অসহিষ্ণু আচরণে সিংহ সাহেব অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হ'য়ে গেছেন—এ বোধ করি তুমি নিজেই বুঝতে পারচ।

নীলা কথা কহিল না।

প্রীতির নিদর্শন

হেরম্বনাথ বলিতে লাগিলেন—তুমি ভেবো না নীলা, তোমার মনের কথা আমি বুঝতে পারি নি। সে আমি ঠিকই বুঝেছি। খগেন আমার মত তোমাদেরও আপনার লোক, সে আমার পরিবারের বিশেষ আত্মীয়, তার বিরুদ্ধে কোন কথা শুন্‌লে ধৈর্য্যচ্যুতি হওয়ারই সম্ভাবনা, কিন্তু তাই বলে তুমি যে মান্য অতিথির অসম্মান করবে এই বা কি কথা!

আমি অসম্মান করি নি বাবা! কথার প্রতিবাদ করেছি। সে ত তোমার কথার বিরুদ্ধেও আমরা করে থাকি, বাবা, সে কি তোমাকে অসম্মান করি বলে?—বলিতে বলিতে ফেণিলার কণ্ঠ সজল হইয়া উঠিল।

হেরম্বনাথ নীলার হাত দু'টি বুকের 'পরে তুলিয়া লইয়া স্নেহার্দ্রকণ্ঠে কহিলেন—না মা—আমাকে অসম্মান করবে কেন!

—আমরা তোমাকে অসম্মান করতে পারি বাবা!—

হেরম্বনাথ মুখ ফিরাইয়া ডাকিলেন—কাছে আয় সু!

সুনীলা কাছে আসিয়া সিক্তস্বরে কহিল—তুমি ত সবই শুনেছ বাবা, নীলা ত অন্যায় কিছুই বলে নি।

হেরম্বনাথ সে কথার উত্তর না দিয়াই বলিলেন—চ' নীলা, খাবি, চ'। সু, তোমার দিদিকে ডেকে নিয়ে এস।

সুশীলা তোরঙ্গ বাক্স গুছাইয়া তুলিতেছিল—সুনীলা ডাকিতেই বলিল—আমি খাব না সু, তোমরা খেয়ে নাও গে।

সুনীলা বলিল—বাবা যে খেতে বসেছেন দিদি!—রীতি ছিল, হেরম্বনাথের আহার কালে তিনজনে তাঁহার সামনে বসিয়া গল্পগুজব

করিত। যখন সুশীলা রাঁচিতে থাকিত, তখন দুই বোনে সামনে বসিয়া কত রাজ্যের, কত কাজের, কত অকাজের আলোচনা করিয়া যাইত।

সুশীলা একটা জামা বার বার ভাঁজ করিতেছিল, কিছুতেই মনের মত হইতেছিল না—বিরক্ত হইয়া জামাটাকে ছুড়িয়া ঘরের কোণে ফেলিয়া দিয়া বলিল—যাও না ভাই সু, আমার ক্ষিধে নেই—বলছি!

সুনীলা গেল না, বলিল—বাবা খেতে বসেছেন দিদি।

তা জানি। আমার অনেক গুছিয়ে গাছিয়ে নেবার আছে, যাবার সুবিধে হ'বে না।

সুনীলা নামিয়া গেল। হেরম্বনাথ আহার্য্যের সামনে চুপটি করিয়া বসিয়াছিলেন, ফেণিলা আস্তে আস্তে পাখা করিতেছিল, সুনীলাকে একেলা আসিতে দেখিয়া হেরম্বনাথ জিজ্ঞাসিলেন—তোমার দিদি?

দিদি আস্‌তে পারলেন না। বল্লেন, তাঁর অনেক গোছাতে হ'বে, যেতে পারবেন না।

শুনিয়া হেরম্বনাথ আহারে মন দিলেন। আজ আর কথাবার্ত্তা একটিও হইল না। হেরম্বনাথ প্রত্যহ যাহা খাইতেন আজ অর্দ্ধেকেরও বেশী পাতেই পড়িয়া রহিল। সুনীলার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধের কোন উত্তর না দিয়াই উঠিয়া গেলেন।

এখন, এ বাড়ীর কর্ত্তৃত্বটা ছিল পুরা মাত্রায় সুনীলারই হাতে। লোকের খাওয়া-দাওয়া, আরাম-বিরাম, সুখ, স্বাচ্ছন্দ সবের দায়িত্বই ছিল তার। ইহাতে করিয়া সুনীলার মনে ভারি সুখ ছিল। অনেক মেয়েরই থাকে। আজ অকস্মাৎ তাহার মনে হইল, এ সমস্ত ভার তাহার হাতে না থাকিলেই বিশেষ মঙ্গলকর হইত।

সুনীলা খাইবে না বলিয়াছে, অথচ তাহাকে অভুক্ত জানিয়া ইহারাই বা খায় কেমন করিয়া? দিদি যাহা একবার না বলিয়াছে তাহা যে আর হাঁ হইবে না, তাহাও সে বিশেষরূপেই জানিত, তাই সে পিতা উপরে যাইবার পরও অনেকক্ষণ সেখান হইতে উঠিতে পারিল না। ফেণিলা পিতার সঙ্গেই উপরে গিয়াছিল, সুনীলা তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইল।

ফেণিলা আসিতে অতীব করুণকণ্ঠে কহিল—একটা কথা রাখবি নীলা?

নীলা কহিল—রাখব।

সুনীলা বলিল—বড়দি রাগ করে' বলেছেন. 'খাব না'—তাঁকে ডেকে আন্-না ভাই।

নীলা তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল—সে আমি পারব না, কিছুতেই পারব না।

কথা রাখবি নে?

অন্য যা বলবে তাই করব। ঐটি মাফ কর।—বলিয়া সে প্রস্থান করিতেছিল, সুনীলা তাহার হাতটা চাপিয়া ধরিয়া বলিল—নীলা!

পারব না, পারব না, পারব না।

কেন পারবি নে। দিদি ত!

ফেণিলা মুখখানি বিকৃত করিয়া কহিল—দিদি ত! এখন একবার ঘরে গেছলুম—বাবা!—অনেক কষ্টে প্রাণে বেঁচে ফিরে এসেচি। আর না!

কি হ'ল আবার?

হ'বে আবার কি! দেখলুন—তোরঙ্গ বাক্স গোছানো হচ্ছে, তাই জিজ্ঞাসা করতে গেলুম, দিদি কোথাও যাবে না কি? কথা কইলেন না। এক দৃষ্টিতে সে অগ্নিকাণ্ডের ইঙ্গিত করিল।

সুনীলা এক মুহূর্ত্ত ভাবিয়া লইয়া কহিল—তুই একটু দাঁড়া নীলা, আমিই দেখি আরেকবার।

সুনীলা উপরে আসিয়া দেখিল, পিতা তখনও সেই কেদারায় বসিয়া আছেন। সুনীলাকে আসিতে দেখিয়াই তিনি বলিয়া উঠিলেন খাওয়া দাওয়া হল না?

সুনীলা মৃদুকণ্ঠে বলিল—বড়দি যে খাবেন না বলছেন বাবা!

হেরম্বনাথ চুপ করিয়া রহিলেন। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়াও যখন নিজে কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিলেন না, তখন সুনীলাকেই জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি তাকে ডেকেছ মা?

ডেকেছি বাবা।

একবার নীলাকে পাঠিয়ে দিলে না কেন?

সে যেতে চায় না বাবা।

হেরম্বনাথ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—যেতে চায় না! তাই ত!

পাঁচ ছ' মিনিট কাটিয়া গেল, সুনীলা জিজ্ঞাসিল—কি করব বাবা?

চল—দেখি—বলিয়া সুনীলাকে সঙ্গে লইয়া সুশীলার কক্ষে আসিতেই সুশীলা রুদ্ধকণ্ঠে বলিল—আমি না বল্লুম তোমাকে সু, যে আমার ক্ষিধে নেই—আবার কেন বাবাকে ত্যক্ত করতে গেলে?

হেরম্বনাথ বলিলেন—না, ত্যক্ত কিসের? আমি ত শুতে আসছিলুমই। কিন্তু তুমি খাবে না কেন সুশীলা?

প্রীতির

নিদর্শন

এই যে বল্লুম, বাবা।

তা হোক—তুমি যাও,—যা পারো। জোর করবার ত কেউ নেই মা, যা পারো খেয়ে এসো।

ক্ষিধে না থাকলেও খেতে হবে—এ-কি কথা?

হয় বৈ কি, সুশীলা! সব কাজ কি পৃথিবীতে নিজের ইচ্ছেয় অনিচ্ছেতেই হয়? তা ত হয় না মা! তোমার ছোট বোন্ দুটি তোমার জন্যে এখনও খেতে পায় নি,—তা জান?

কেন আমি ত ওদের বলে দিয়েছি;

দিলেই বা বলে! ওদের কর্ত্তব্য নেই? তুমিই বল দেখি সুশীলা, ওদের কর্ত্তব্য ওরা না করলে তুমিই কি খুসী হ'তে পারো?

সুশীলা অল্পক্ষণ নীরব থাকিয়া পুনশ্চ কহিল—আমার ক্ষিধে নেই বাবা!

হেরম্বনাথ দ্বারটি ধরিয়া কহিলেন—আর কিছু আমারও বলবার নেই সুশীলা। কখনো কোনদিনই তোমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কথাই আমি বলি নি, আজও বল্‌ব না। আজ তোমাদের মা থাকলে এ সব দায় তারই হত!—বলিতে বলিতে হেরম্বনাথ নীরব হইলেন। একটুখানি দম লইয়া পুনরায় কহিলেন—আজ মনে হয়, সেবার পক্ষাঘাত রোগ আমাকে ত্যাগ করলে কেন?—বলিয়া বৃদ্ধ ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন।

সুশীলা একমুহূর্ত্ত পরে—"বাবার ঐ কেমন এক ধারা"—বলিয়া আসন ছাড়িয়া উঠিল, এবং সুনীলাকে অগ্রবর্ত্তিনী করিয়া—"চল সু, নীচে চল"—নীচে নামিয়া আসিল।

হেরম্বনাথ উপর হইতে সকল সংবাদই রাখিলেন। মৃদু নিশ্বাস

ফেলিয়া, আঙ্গুলে ক'ফোঁটা চোখের জল মুছিয়া মন্থরগতিতে নীচে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

ফেণিলা সস্নেহে কহিল—এস বাবা, আজ তুমি আমাদের কাছে বসে খাওয়াবে, এস।

না, না, বাবা রাত অনেক হ'য়ে গেছে, তোমার শরীর খারাপ, তুমি শোও গে যাও।

সুশীলার এ নিষেধ সত্ত্বেও হেরম্বনাথ ফেণিলার সস্নেহ আহ্বানটি উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। ঘরের কোণ হইতে একখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িয়া বলিলেন—রাত আর নতুন ক'রে আমার কৈ হ'য়েছে মা সুশীলা? রাত যে অনেক দিন আগেই তার নিঃশ্চন্দ্র আকাশ, নির্জ্জন অন্ধকার সব নিয়ে এই পোড়া পাহাড়টার মত বুকখানায় জমে বসে আছে! এই বারো বছর দিবসের মুখ আমি দেখি-নি, সুশীলা, যা আমার চোখে পড়েছে, সে ঐ অন্ধকার, সে ঐ রাত্রি।

এক মিনিট থামিয়া হেরম্বনাথ করুণস্বরে কহিলেন—তবুও একটা আলো আকাশের কোন্ প্রান্তে উঠে আমাকে খানিকটা আলো আর খানিকটা আরাম দিত—যখন তারও আর সন্ধান পেলাম না, তখন, তখন—

হেরম্বনাথের কণ্ঠস্বর মথিত করিয়া বাষ্পোচ্ছ্বাস ঘরটিকে যেন মলিন ধূমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তিনি অশ্রুপূর্ণ কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন—তখন এই তিনটি তারার মালার পানে চেয়েই এই বিশ্বজোড়া অন্ধকারকেও তুচ্ছ ক'রে দিতে পেরেছিলাম। তোরা হয়ত জানিস্ নে মা, যখন তোদের একমাত্র স্নেহের ভাইটি অকালে কুসুমটির মত বৃন্তচ্যুত হ'য়ে ঝরে পড়ল,

ভারি হুজুগে দেশ, কেবল হুজুগ, কেবল হুজুক। হুজুগ ছাড়া কথা নেই। আর ঐ-যে সেক্‌হ্যাণ্ড করা দেখ্‌ছ—ও-সব ষ্টেট্‌ ক্রাফ্‌ট পলিসি বুঝলে না? ওর মানে হ'চ্ছে—তোমাদের কত সম্মান করি দেখ্‌ছ ত! যান্-না দেখি কতবড় বীরপুরুষ উনি, ঐ খদ্দরের পোষাকে একবার কোন একটা বড় সাহেবের কাছে. মজাটা টের পাবেন।

ফেণিলা হাসিয়া বলিল—মজা উনি টের পাবেন না, মজা টের পেতে ওঁর পরে যারা টাই এঁটে, টুপি সেঁটে যাবেন, তাদের দিকে চেয়েই বড় সাহেব বল্‌বে, নিজের কিছু নেই এঁদের, তাই পরের পোষাক এঁটে এসেছে।......আমাদের বিদ্যেসাগর ম'শায় লাটসভায় যেতেন কি পোষাকে, জানেন কি?

সব গাঁজাখুরী!

ফেণিলার মুখ চোখ রাঙা হইয়া উঠিল। দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্যের মত সে যেন কি বলিবে তাহাই খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল, সুনীলা বলিয়া উঠিল—ও কথা বল্‌বেন না, মিঃ সিংহ। বিদ্যাসাগর ম'শায় মানুষ ছিলেন না,—দেবতা ছিলেন। আমার বাবা বলেন, বড়কে বড়র সম্মান যে দিতে পারে না, তার মত অভাগা পৃথিবীতে আর কেউ নেই।

সিংহ সাহেব একটু লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিছুক্ষণ কোন কথাই বলিতে পারিলেন না। অল্পকাল পরে যেন অকূলে কূল পাইয়াছেন এমনি ভাবে মাথাটি নাড়িয়া কহিলেন—এতই স্বদেশভক্ত মহাপ্রাণ, তখন কেনই বা আপনারা খদ্দর ব্যবহার করছেন না, আর কেনই বা ঐ চেয়ার টেব্‌লে বসে মেম-সাহেব সেজে গল্পগুজব করছেন, তা ত বুঝিনে!—কি—বল সুশীলা?

'আপনারা' বলিতে যে তিনি কেবলমাত্র ইহাদের দু'জনকেই ইঙ্গিত করিলেন, তাঁহার শেষের কথাতে ইহাই প্রকাশ পাইল এবং তাহা বুঝিয়াই ফেণিলা উষ্ণ অথচ মৃদুকণ্ঠে কহিল—সে ত্রুটী আমাদের স্বকৃত নয়। কেন-যে বাবা এ'টির প্রচলন করেছিলেন, তা ত বুঝি নে।

সিংহ বেশ পরিহাসের স্বরে কহিলেন—তা' হ'লে বোধ করি ভুলটা আপনার বাবার কৃত।

অবশ্য। সত্যিই যদি এ ভুল হয়। কিন্তু আমার কি মনে হয় জানেন, ঘনশ্যাম বাবু, বাবার এ ভুল নয়। দেশের চতুর্দ্দিকে যে স্বাধীনতার স্রোত বইছে, তার আবর্ত্তন থেকে আমাদের সাংসারটি বাঁচতে পারেন নি তিনি।

সিংহ হাসিলেন। হাসিয়া বলিলেন—তবে কি এই বুঝতে হ'বে নীলা যে, এখন খদ্দর পরার স্রোত বয়েচে, অমনি সবাইকে 'ভেড়ার পালের' মত ছুটতে হ'বে সেইদিকে? হুজুগ—আর হুজুগ।

ফেণিলা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল, কহিল—তা ত বলবেনই আপনি, এদের 'ভেড়ার পাল'। ভেড়ার পালই বটে, তবে এই ভেড়ার পালের মুখ চুলকোয় না ঐ বিলিতি বাঁদরদের কলা খেতে দেখে, এই যা! করে কোন্ সাহেব কি টুপি মাথায় দিয়েছে, অমনি হ'ল ফ্যাসান, কে কবে লাট-সাহেব টাই-টা বেঁধেছে পেছন দিকে—বাঁধ, বাঁধ, ফ্যাসান, কে সাহেব মিটিঙে বক্তৃতা করতে ভারি টেবিল চাপড়ায়, ভাঙ্ ভাঙ্ টেবিলটাই ভাঙ্! সাহেবরা শতকরা নব্বই জন দাঁত বাঁধায়, অমনই হুড় হুড় করে সব চল্লেন, বেদে-ডাক্তারের সামনে হাঁ করে দাঁড়ালেন।

সাহেব বল্লে, পাটনা ইউনিভার্সিটি হ'বে, চাঁদা তোল্। তোল্ তোল্ পড়ে গেল; আর খুলনায় যে হাজার হাজার নিরন্ন দেশবাসী না খেতে পেয়ে ম'ল, সাহেব বল্লে ড্যাম্! আর অমনি দলশুদ্ধ কামান দাগতে লাগল, ড্যাম্ ড্যাম্, ড্যাম!

কথাগুলি হাস্যোদ্দীপক বটে, কিন্তু কাহার মুখেই হাসি দেখা গেল না। একমিনিট পরে ফেণিলা পুনশ্চ কহিল—কিন্তু কাল যদি লাটসাহেব বলে' বসে, বাঃ খদ্দরগুলি বেশ হ'য়েছে, অমনি র‍্যাণ-কেন্, হ্যারিসন হাতবে, হোয়াইটোয়ের বাড়ীতে ভিড় জমে যাবে—খদ্দর কিন্‌তে। কি বলেন মিঃ সিংহ! রাজাজ্ঞা, রাজপ্রতিনিধির আজ্ঞা, লঙ্ঘন করলে ফাঁসী হয়—না?

সিংহ হাসিয়া বলিলেন—ছোঃ ছোঃ, হারিসন হাথোবে বেচবে—খ—দ্দ—ড়? হ'য়েচে আর কি! তোমার মাথা খারাপ, নীলা, মাথা খারাপ। তোমার বাবাকে লিখে দিতে হ'ল, চিকিৎসা আবশ্যক।—তিনি হাসিতে লাগিলেন।

ফেণিলা বলিল—তাই লিখবেন, ঘনশ্যাম বাবু, আজই লিখবেন, তবে অনুগ্রহ করে সমস্ত ঘটনাটাই তাঁকে জানাবেন, নৈলে তিনি হয়ত ঠিক বুঝতে পারবেন না। কিন্তু তিনি যে আপনার জন্যেই কমল কররেজের মধ্যম নারায়ণের ব্যবস্থা করে পাঠাবেন, তা আমি আগের থেকেই বলে গেলাম।—বলিয়া সে খোলা জানেলা-পথে ফুটপাতের ওপারে একখানা একতল গৃহের দ্বারে বিলম্বিত সাইন্ বোর্ডটার পানে দৃষ্টি করিয়া বাহির হইয়া গেল।

সাইন্-বোর্ডে লেখা ছিল ——

প্রীতির

নিদর্শন

কবিরাজ—শ্রীকমলাকান্ত গুপ্ত ভিষগাচার্য্যের
উন্মাদরোগের আদি ও অকৃত্রিম
মধ্যমনারায়ণ ও মহারায়ণ তৈল

৬৲ সের ৮৲ সের

আর বলা যায় না কেন, সিংহসাহেব ক্রুদ্ধ না হইয়াই উঠিলেন। আজ বোধ করি তিনি একশিশি মহানারায়ণ তৈল উপহার পাইলেও অসন্তুষ্ট হইতেন না।

সুনীলা ফেণিলার সঙ্গে সঙ্গেই বাহির হইয়াছিল; বাহিরে আসিয়া দু'জনে কবিরাজের সাইন্-বোর্ডটার দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিল।

সুশীলা জিজ্ঞাসিল—তাহ'লে কালই?

নিশ্চয়ই। আমি রিজার্ভ করিয়ে রাখব, আর এখান থেকেই তোমাকে তুলে নিয়ে যাব—কি বল?

সুশীলা মাথাটি নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিতেই, সিংহসাহেব সুশীলার দিকে দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া, স্নেহস্বরে কহিলেন—তা'হলে সুশীলা, গুড্ আফটান্নুন।

কি জানি কেন, আজ আর সুশীলা হাত বাড়াইল না, সে দু'টি হাত যুক্ত করিয়া কহিল—নমস্কার।

—বোধ করি, পাশের ঘরে বোন্ দুটির হাসির শব্দ তাহার কাণে যাইতেছিল, মুখটি রাঙা করিয়া আর একবার বলিল—নমস্কার।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

প্রেমের রহস্য।

ফেণিলা হাসিয়া বলিল—সত্যি বলচি ভাই, আসল কারাগার ত দেখি নি কখনও, শুধু আমাদের সেই বাড়ীটা দেখেই আমি ওটা লিখেছিলুম। কাগজে-কাগজে রেজাণ্ট যখন বেরুল, দেখা গেল, আমিই প্রথম হ'য়েচি, প্রাইজ ছিল, একশ' টাকা, আর এই মেডেলটা। সেকেণ্ড, থার্ড— হ'য়েছিল—দু'জন পুলিস্ অফিসার।

সুনীলা জিজ্ঞাসিল—তোরা একেবারে কোথাও যেতে আস্‌তে পারতিস্ নে ?

হাঁ। ঐ গাড়ী চড়ে স্কুল, কলেজ—আর বাড়ীটার ছাদটি ছিল মস্ত —এই যা। না কেউ আসত,—না কেউ কোথায় যেত!

তবে শান্তি কি-করে লভেই বা পড়ল, বিয়েই বা হ'ল কেমন করে? কেউ যদি না-আস্‌ত, বিকাশ বাবু-ই বা এসেছিলেন কেমন করে?

ফেণিলা হাসিয়া বলিল—আমার ঐ-যে মাস্‌তুতো ভাই অবণী তারই বন্ধু ছিল—বিকাশ। একটা কি ছুটির দিনে দু'জনে কোথায় মাছ ধরতে গেছ্‌ল, সন্ধ্যেবেলা অবনী আর বিকাশ একটা বারো সের কাৎলা মাছ নিয়ে বাড়ী ঢুকল। মাছটা তুলেছিল, অবনী। তা বিকাশ না-কি নিজের বাড়ীতে মাছটা দেখাতে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, তা আমাদের বাড়ীতে দেখিয়ে, তারপর নিয়ে যাবে, যে পুকুরে ধরেছিল, সেটা আমাদের

বাড়ীর কাছেই। দুই বীরপুরুষে মাছ ঘাড়ে করে এল, তখনি চলে গেল। ঘণ্টাখানেক পরে অবনী মস্ত একখানা ল্যাণ্ডো চড়ে মাছ নিয়ে ফিরে এল'। মাছটা সে ধরেছে, তারই প্রাপ্য কি-না। মাসীমা অবনীকে বল্লেন—হ্যাঁরে বনী, (তাঁকে সবাই 'বনী' বলে ডাকৃত) দু'জনে আমোদ করে ধরলি, একা তুই মাছ খাবি, বন্ধুকে ভাগ দিবি নে? বনী বল্লে—সে-কি মাছ নেয় মা? তার নিজেরই দশ-বারোটা পুকুর, রোজ এর চেয়ে বড় বড় মাছ তাদের নিত্য-খরচ হয়। মাসীমা বল্লেন—হ'লই বা বড়লোক, তোর বন্ধু ত! বনী বল্লে—না মা, সে এর ভাগ নেবে না, আমি জানি! মাসীমা ভেবে চিন্তে বল্লেন—তবে তা'কে বলে আয়-না কেন, রাত্রে আজ সে এ'খানেই খাবে। এতে ত আর সে অমত করবে না!—সে অমত করিল না সত্য, যথাসময়ে মোটর গাড়ীর শব্দে আমাদের সরু গলিটি সচকিত করে বিকাশ এলেন! হ্যাঁ—বিকাশ বটে! কি সুন্দর, নম্র চেহারাটি! মনে এতটুকু অহঙ্কার নেই! হাসিটি যেন পাতলা ঠোঁঠ দু'খানিতে লাল রঙের সঙ্গেই জড়িয়ে রয়েচে। আমরা কেউ তাঁর সামনে বেরুই নি বটে,—তবে আড়াল থেকে, শান্তি, কান্তি আর আমি তাঁকে দেখেছিলুম। বয়স—বনীরই বয়সী। ১৬-১৭ কি বড় জোড় আঠারো হ'বে।—সেই প্রথম কারাপ্রাচীর ভেঙ্গে গেল; সেইদিনই আমরা প্রথম জানলুম যে, সে'টি কারাগার নয়, আমাদের বাড়ী।

ফেণিলা থামিয়াছিল, কিন্তু সুনীলা তাহার মুখের দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে জানিয়া, আবার বলিতে লাগিল—তারপর থেকে, ছুটির দিনটি এলেই বিকাশ ছিপ-ঘাড়ে করে' মোটর থেকে নেমে তাড়া-

হুড়ো লাগিয়ে বনীকে নিয়ে বেরিয়ে যেতেন। যেদিন শিকার মিলত, বিকাশ নামতেন, নয়ত বনীকে দরজার সামনে ছেড়ে দিয়ে চলে যেতেন। এই রকম ক'রে' মাসখানেক কাট্‌ল। আবার একদিন মস্ত শিকার মিলেছে, এবার বিকাশই গেঁথেছিলেন। দেখাতে এসে, বিকাশ মাসীমাকে বল্লেন—বনী আর তার বোনেরা আমার ওখানে খাবে। তখন ত আর কারাগার নয়, মাসীমা বল্লেন—তা যাবে, তার আর কি!

—কি সিঙ্গী দেখেছ মেঝদি, বড়লোক যা'কে বলে! তিনটে বড় বড় মহল পার হ'য়ে আমরা যেখানটায় নামলুম, সে'টি হ'চ্ছে মেয়ে মহল। শুধু সেইটেই হ'বে আমাদের বাড়ীটার তিন চারগুণ! কিন্তু কি অমায়িক লোক তাঁরা! চার ভাই তাঁরা, বড় দু'টিকেও দেখেছি বটে, কিন্তু বিকাশ আব প্রকাশ এ'দের সঙ্গেই আমাদের আলাপ হ'য়েছিল—তেমন আর দেখিনি—এ জীবনে! বিকাশ তখনি দু'টো পাশ করেছিলেন, বিলেত যাবেন বি-এ পাশ করে! সেখানে অক্স-ফোর্ডে বি এ পড়বেন।

সুনীলা উৎকণ্ঠ হইয়া কহিল—তারপর ?

বিলেত যাবার দিন এগিয়ে আস্‌চে, বিকাশ ভারি ব্যস্ত, বনীও। আজকাল আমাদের বাড়ীতেও আসা-যাওয়া খুবই কম,—সময়াভাব। আমরা বনীকে অনুযোগ করি, আমিও, দশবছরের কান্তিও, পঞ্চদশী শান্তিও। একদিন সকালে উঠে "বিশ্ববাণী" খুলে দেখি, বিকাশের লেখা পাঁচ ছ'টি কবিতা বেরিয়েচে। বিকাশ আগেও লিখ্‌তেন, এদানী পড়াশুনায় ব্যস্ত থাকায় লেখাটা বন্ধ ছিল,—আমি ছ' বছরের বাঁধানো "বিশ্ববাণী" খুলে দেখি, মাসে একটা, দু'টো কবিতা—আছেই। সে-সব

প্রীতির

নিদর্শন

কবিতা মামুলী, আকাশ, বাতাস, বসন্ত জ্যোৎস্না, বর্ষা, গ্রীষ্ম, শীত, ইট, কাঠ, ঢিল, পাঠ্‌কেল—দু'চোখে যা দেখেছেন, তাই নিয়েই, কিন্তু সেদিন প্রভাতে যে পাঁচ ছ'টা কবিতাই আমি পড়লুম, সে কবিতা, না চোখের জল, অনেকক্ষণ অবধি তাই ঠিক করতে পারলুম না। বাংলা কবিতা কারুই আমি পড়তুম না, তা'তে করে আমাদের সেই কারাগৃহে আমার নামই ছিল—অকবি! কিন্তু সেই অকবিরই চোখের জল যেন নিংড়ে বেরিয়ে আস্‌তে লাগল। বিশেষ করে,' যেটায় কবি বল্‌চেন স্বদেশ ছাড়চি তা'তে দুঃখ্‌ নেই, কেননা সে আমার, আমি তার—দেশ কোনদিনই আমাকে তার আকাশের তল্‌ থেকে বঞ্চিত করবে না; স্বধর্ম্ম সে'ও আমি ত্যাগ করছি নে, যেহেতু মহাপাপীই ধর্ম্মত্যাগ করে, আমি অত বড় পাপী নহি, কাজেই ধর্ম্মের ভাবনা'ও আমার নেই—তবে কিসের ভাবনা—কবির! যার এই দুই সম্পৎ আছে তাহার আবার দুঃখ কিসের! কবি বল্লেন—কিন্তু প্রিয়ে! তোমার মুখের ঐ হাসি কি অম্লান থাক্‌বে, তোমার বুকে শান্তি কি চিরদিনই বিরাজ করবে, এই সহস্র সহস্র যোজন দূরের প্রেমিকের পরেই তোমার কোমল নারীচিত্তটি পড়ে থাক্‌বে, না অদর্শনে অল্পে মুখের হাসিটি ম্লান হ'য়ে যাবে, হৃদয়ের শান্তি বিদূরিত হ'বে আর মহাসাগরের পরপারে তোমার মনটি বাঁধা থাক্‌তে পারবে না! পড়েই আমার মনে হ'ল, এই কবিপ্রিয়া কে? বনীও জান্‌ত না।

একমিনিট থামিয়া সে পুনরায় কহিল—তারপরই একদিন দেখি, বাড়ীতে ভারি আনন্দ কোলাহল পড়ে গেচে। আমি স্কুল থেকে ফিরতেই শান্তি ফিক্‌ করে হেসে, যেন অপরাহ্নের সূর্য্যটির মত টুক্‌ করে

পালিয়ে গেল। মাসীমা বল্লেন·········!—বুঝলুম শান্তিই সেই কবি-প্রিয়া! তারপর, একদিন!—ফেণিলা যে ইঙ্গিতটি করিল, সুনীলা তাহার ঠিক অর্থ বুঝিয়াই কহিল—কিন্তু বিয়ে যে হ'ল, এঁরাও কি ক্রিশ্চানই ছিলেন।

না, না, বিকাশ বাবুরা পুরোমাত্রায় হিন্দুই ছিলেন। বিয়েটা হ'ল ত আর্য্য সমাজের মতে,—লাহোরে গিয়ে।

তা'তে কেউ আপত্য করলে না?

আপত্তি আর কে করবে, বল! যদিও কেউ আপত্তি করত, টিঁকত না। নৈলে যে কবির বুক ভেঙে যেত; আর কবিপ্রিয়ার শিরদাঁড়া, Spinal Cord, ভেঙ্গে ধনুষ্টঙ্কার হ'ত।···তার ক'মাস পরেই বিকাশ বিলেত গেলেন। সেইদিনই তাঁর "শ্বেতপদ্ম" বেরুল। তাঁর প্রকাশক রাত্রি ন'টার সময় এসে দশখানা বহি দিয়ে গেল; খুলে দেখি, উৎসর্গটি ভারি চমৎকার।—দেখ-না,—বলিয়া সে আলমারী খুলিয়া একখানি সাদা মখমলে বাঁধা পুস্তক বাহির করিয়া সুনীলার হাতে দিল। উৎসর্গ পৃষ্ঠায় লেখা ছিল,

"তুমি স্বদেশে, আমি বিদেশে
মধ্যে সমুদ্র, মধ্যে নীলাকাশ,
মধ্যে প্রেমের এক অফুরন্ত নদী,
তাহারই বুকের এ "শ্বেতপদ্ম"
স্বদেশে ফুটিয়া থাক্—
তোমারই পদ্মের মত হাত দু'খানিকে সুরভিমণ্ডিত করিয়া থাক্।"

সুনীলা মুগ্ধস্বরে কহিল—বাঃ!

অল্পক্ষণ পরেই ফেণিলা মুখটি করুণ করিয়া কহিল, শান্তির ত ঐ অবস্থা হ'ল, তার পরই হলুম আমি! কান্তি ত নেহাৎ শিশু। আমার বিশ্বাস ছিল, আমার এসব রোগ বালাই নেই, ওমা, সময়কালে আমারো একটা উৎকট পীড়া দেখা দিলে, যাই আর কি? তবে সুখের বিষয় ছিল এই, আমার লাভারটি কবি ছিলেন না……

সুনীলা হাসিয়া বলিল—তোর আবার কি হ'য়েছিল রে?

ফেণিলা দুঃখে ম্লান হইয়া অতীব মৃদুকণ্ঠে কহিল—কি আর হ'বে মেঝ! যা সবার হ'য়ে থাকে, তাই! আমিও ত প্রায় শান্তির মত গেছলুমই, অতি কষ্টে, প্রাণে বেঁচে, আধমরা হ'য়ে ফিরে এসেছি।— তাহার অশ্রুসজল আঁখি দু'টির পানে চাহিয়া সুনীলার মনখানি বড়ই বিষণ্ণ হইয়া গেল। সে আর একটা কথাও বলিতে পারিল না, কেবল সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিতে ফেণিলার ম্লান মুখখানিই দেখিতে লাগিল।

ফেণিলা মিনিট তিনেক পরে গদ্গদস্বরে কহিল—একদিন আধদিন নয়, তিনটি বছর ধরে সে একটী কথা না বলে, কেবল আমার মুখপানে চেয়ে দিন কাটিয়েছিল। একদিন ক'রে হপ্তায় আমাদের দেখা শুনা বন্ধ থাকৃত, শেষাশেষি সে একদিনের বিরহও সহ্য করতে না পেরে একটা না একটা অছিলায় এসে হাজির হ'ত। কথা বল্‌ত না, কথা শুনৃত। এমনি করে তিনটি বছর আমার আশা করে, আমার মুখ চেয়ে সে ছিল, আহা, তার পর হতাশ হ'য়ে বেচারা মনের দুঃখে, 'বেলোয়ারী'তে ভুগে ভুগে, বিডিন ষ্টিটের হাফিস্ থেকে টিকিস্ কিনে ছাপরায় চলে গেল। —সে কণ্ঠস্বর যতদূর সম্ভব করুণ করিয়া কহিল—শুনেছি, সেখানে গিয়ে সাদী করে ফেলেছে। আহা বেচারী! সে থাকৃতে একদিন আমাকে

আমার বহিপত্র বইতে হ'ত না। আমার বহিগুলি, খাবারের বাক্সটি বুকে করে, অত যত্নে আর কেউ তুললে না, মেঝ্, কেউ তুল্লে না। হায় হায়! আগে জানলে কি ছাড়তুম আমি তা'কে! আমি ভেবেছিলুম, যাচ্ছে যাক্, একবার দেশটা ঘুরেই আসুক। তখন কি জানি ছাই যে আমার বরাত পুড়েছে, আমার আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে, সে সেখানেই···

···বলিতে বলিতে বস্ত্রপ্রান্তে মুখ ঢাকিয়া ফেণিলা ফোঁপাইতে লাগিল। কাঁদ কাঁদস্বরে বলিল—সে'ও গেল আমিও স্কুল ছাড়লুম! কলকাতা, সে বিহনে আমার কাছে শূন্য বোধ হল, আমি কার্সিয়ঙে গেলুম। সেইখানেই তার চিঠি পেলুম, সাদী! সতীনকে একখানা বারো টাকা দামের কাপড় পাঠিয়ে দিলুম। চিঠি টিঠি লিখ্‌তে পারি নি, যতবার কাগজ নিয়ে লিখ্‌তে বসি, চোখের জলে কাগজ ভেসে যায়, হাত কেঁপে ওঠে—! ওহো, হো, হো!—সে খুব জোরে জোরে ফোঁপাইতে লাগিল

সুনীলা বলিল—তা কেঁদে আর কি করবি বল্! Loverদের গতিকই ঐ! আহা, নীলা কাপড়টা ছেড়ে ফেল, বোন্, ছেড়ে ফেল—ভিজে ঢোল হ'য়ে গেছে-যে!

ফেণিলা সত্য সত্যই আল্‌না হইতে একখানা কাপড় টানিতেছিল, তাহা দেখিয়া, সুনীলা দু'হাতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—বেচারা সহিসকে খুব নাকাল করেছিস্ বল?

না, দিদি, নাকাল না, ভালোবাসা! নীরবে, গোপনে, যতনে—ভালোবাসা!

উঃ! ভাগ্যিস্ বেচারা দেশে পালিয়েছিল, তা না হ'লে টাউরেই মারা পড়ত।

তবু আসল কথাটি বলি নি এখনও।

সে'টি হ'চ্ছে কি?

সে'টি হ'চ্ছে এই যে, আমাদের গাড়ীর সহিসকে সবাই দিত পূজার সময় দু'একটি, টাকা। এ'কে দিতাম, আমি—চার চার আট। চার পূজায়, চার বড়দিনে। লোকটাকে দেখ্‌লেই কেমন আমার দয়া হ'ত। তার সেই কালো কুচ্‌কুচে মুখটিতে যেন গভীর দুঃখের ছাপ লেগে ছিল বলেই আমার মনে হ'ত।

আট্‌-টা করে' টাকা ফাল্‌তো পেলে অমন অনেকেই আরাধনা করে।

না মেঝ্‌, না, সে ভালোবাসা।—হাসি মুখে এই কয়টা কথা বলিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। মিনিটখানেক আলমারীটার দিকে চাহিয়া চাহিয়া বলিল—এই আলমারীর অর্দ্ধেক বহিতে তার অঙ্গের উত্তাপ এখনো লেগে রয়েছে, বুঝলে মেঝ্‌! প্রাইজের দিন আমার হাত ভর্ত্তি বহি দেখ্‌ত, আর কালো মুখের সাদা দাঁতের হাসিতে একেবারে সৌদামিনী খেল্‌ত! এত ভালো আর কেউ বাসবে না রে কেউ বাস্‌বে না।—শেষের দিকটা তাহার উচ্ছল কণ্ঠস্বর যেন একটু বাধিয়া, একটু বিচলিত হইয়া গেল।

সুনীলা বলিল—কেউ-না-কেউ বাসে বোধ হয়।

ফেণিলা বলিল—কি জানি! সন্ধান ত পাই নি তার! পেলে একদিন নেমন্তন করে খাইয়ে দিই।

খাইয়েছিলি ত খগেন বাবুকে? একা তোর হাতের দু' একটি তর-কারী আর লুচীই তিনি খেয়েছেন।

তা খেলেই বা—তা'তে হয়েচে কি! আর খেয়েছিলেন কি সাধে?

কি রকম ভয় দেখিয়েছিলুম সেদিন তাঁকে। আমি ক্রিশ্চানের বাড়ীতে মানুষ, তাই খাবেন না, এই দুঃখ জানাতেই তবে না তিনি আসনে বসে পড়লেন! বাস্তবিক ত আমি ক্রিশ্চান নই, দোষ আর কি হ'য়েছে বল?

দোষের কথা নয়। আমি বল্‌ছি—ঐ ত সন্ধানও পেয়েছিস্, খাইয়েও-ছিস্—আবার কেন?

এইটুকু শুনিয়াই ফেণিলা জিব কাটিয়া কহিল—পাগল! ছিঃ ছিঃ! এই বুঝি বুদ্ধি তোমার!

কেন—বুদ্ধির আবার কি দোষ হ'ল শুনি?

ছিঃ ছিঃ! মেঝ্, তোমার এই বুদ্ধি!—বলিয়া সে কুঞ্চিত মুখটি ফিরাইয়া লইল। দশ পনেরো সেকেণ্ড পরে বলিল—দিদির না-হয় গাত্র দাহ জন্মেছিল, যা খুসী তাই বল্লেন, তুমি কি করে বল্লে, বল ত শুনি? ছিঃ ছিঃ—

না রে, আমি ঠাট্টা করছি, কিন্তু গাত্রদাহ হ'বে কেন?

হ'বে না—ও বাবা! বড় লোক, চারখানা কার রাখে, সাহেব সেজে আসে, তার সাম্‌নে ঐ ছেঁড়া কাপড় পরা ভেতো বাঙ্গালীটা আমাদের সঙ্গে আন্তরিকতা করে, এ শুধু সিঙ্গী কেন, অনেক বাঘ, ভাল্লুক, ঘোড়া, গরু, কুকুর-ছাগলেরও গাত্রদাহ হ'য়ে থাকে! দাহ কি বল্‌ছ, রাঁচী গমনটা আর একটু বিলম্বে ঘটলে, গায়ের ছাল চামড়া খসে কেবল হাড়ই বেরিয়ে পড়ত—বলিয়া সে হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। সুনীলাও হাসিয়া, তাহার গালটি টিপিয়া দিয়া, চায়ের ব্যবস্থা করিতে দুপ্ দাপ্ করিয়া. গুণ গুণ শব্দে সুর ভাজিয়া নীচে নামিয়া গেল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

প্রেম ?—স্বদেশ ? না—কি ?

প্রথম দিন কতক ইহারা দু'টিতে বেশই ছিল। এত বড় বাড়ীটার গোটা দুই তিন চাকর বাকর, আর এই দুইটি তরুণী। পিতার ও সুশীলার ফাঁকটা পূরণ হইয়া গেল এই দু'য়ের মনের গোপন-সম্মিলনে। অনেক দেশ বিদেশ ঘুরিয়া, অনেক পর্ব্বত অধিত্যকা বেষ্টন করিয়া দু'টি ক্ষুদ্র তটিনীর যেন এই নির্জ্জন সঙ্গম। তাহাদের তর্কে বাধা দিবার কেহ নাই, তাহাদের কলহাস্যে যোগদান করিতেও তাহারা কাহাকেও চাহিল না। যেন এই দু'টিতেই এই সংসারে জন্মিয়াছে—ইহারাই পরস্পরকে জড়াইয়া, প্রীতি বর্ষণ করিয়া এমনই বড় হইয়া আসিয়াছে—কাহাকেই তাহাদের কোন আবশ্যক নাই।

সেদিন শনিবার। সকালে চা খাইয়া ফেণিলা "পত্রিকা"খানি হাতে করিয়া বসিয়া গেল, সুনীলা নীচে পাকশালার বন্দবস্ত করিতে গেছে। ফেণিলা কাগজ পড়া শেষ করিয়া পাকশালায় আসিয়া বলিল—মেঝ্‌, দুপুর বেলায় গাড়ীটা জুত্‌ব ?

সুনীলা বলিল—কোথায় যাবি ?

ফেণিলা বলিল—কতকগুলো কাপড়চোপড় কিন্‌ব মনে করছি।

সুনীলা সাশ্চর্য্যে কহিল—কাপড় চোপড় ? কি হ'বে রে ?

ফেণিলা বলিল—দিশী কাপড় কিন্‌ব। এ-সব আর পরব না।

সুনীলা হাসিল, বলিল—এ'ও ত দেশী।

কে বল্লে দেশী? নাম-টাই দেশী, এই যা! নৈলে ওর একচুলও দেশী নয়।

সুনীলা চুপ করিল। একমিনিট পরে বলিল—কিন্তু কাপড় যে অনেক রয়েছে, এখনই আবার কিন্‌বি?

কি করি বল? এ ত আর পরব না। না কিন্‌লে চলবে কি ক'রে?

কোথায় কিন্‌বি?

ফেণিলা এক মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিল, তারপর কহিল—খুঁজে পেতে কিন্তে হ'বে, ভাই। যেখানে পাই।

সুনীলা বলিল—হঠাৎ এ খেয়াল কেন হ'ল নীলা?

ফেণিলা গম্ভীর মুখে কহিল—খেয়াল এই একটাই নয় দিদি! আমি সব ত্যাগ করব।

সুনীলা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বিচলিত হইয়া উঠিল। উৎসুক নেত্রে চাহিয়া রহিল।

ফেণিলা বলিল—কত লোকে কত ত্যাগ করেছে, মেঝ্, আমরা কি এতই হীন, এতই ক্ষুদ্র যে মায়ের তরেও কিছুই ত্যাগ করতে পারি না? যাদের বড় বড় জিনিষ আছে, তারা ত ত্যাগ করছেই, আমাদের ক্ষুদ্র, সামান্য যা আছে, তার কি এতই মূল্য যে কোন কারণেই আমরা ছাড়তে পারি না?

সুনীলা কথা কহিল না।

ফেণিলা বলিল—মেঝ্, আমি ডিক্রীও ত্যাগ করব।

প্রীতির

নিদর্শন

সুনীলা বিস্ময়পূর্ণ কণ্ঠে কহিল—বি-এ ডিক্রী ?

হ্যাঁ—বলিয়া সে মুখখানি নমিত করিল। দুই মুহূর্ত্ত পরে কহিল—মেঝ্, এ আমার বহু দিনের সঙ্কল্প। এতদিন তা সাধিত করতে পারি নি বলে দুঃখে আমি মরে যাচ্ছি, মেঝ্। কিন্তু কেন পারি নি, তা তুমি জান—বাড়ীতে একটা হৈ চৈ পড়ে যেত, কৈফিয়ৎ দিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হ'ত! আজ তুমি আর আমি! আজ আর আমায় রোখে কে ?

সুশীলা নীরব। সে কি বলিবে? ফেণিলার যাহা মনের ইচ্ছা, তাহা সে ত্যাগ ত করিবেই না, তবে আর বিরুদ্ধ মত প্রচার করিয়া লাভই বা কি ? বরঞ্চ সে যাহা ভাল বলিয়া বুঝিয়াছে, তাহা করিয়াই যদি সে সন্তুষ্ট হয়, ক্ষতি কি ?—ভাবিতে ভাবিতে সুনীলার মনে হইল সত্যই ত! এ ত খুব চমৎকার জিনিষ! আমার পয়সা, আমার দেশের নিরন্ন দরিদ্রের জঠরেই যাউক, বিদেশী রাক্ষসদের ক্ষুধা মিটাইবার চেষ্টা করিয়া মরি কেন ? এই দেশে যত শ্রমজীবি আছে, কর্ম্মের অভাবে, উদরান্নের জন্য তাহারা চিরদিনই উপবাসী থাকিয়া, পথের ধূলায় গাড়াগড়ি দিয়া হাহারব করিবে, আর আমার পয়সা লইয়া ঠগের দল হোমরা-চোমরা হইয়া স্ফূর্ত্তি করিয়া বেড়াইবে! এই যে ভারতবর্ষময় অন্নের জন্য হাহাকার, এ-ত শিশুকাল হইতেই শুনিয়া আসিতেছি। ক্রমশঃ কমা দূরে থাক্—হু হু করিয়া বাড়িয়াই চলিয়াছে! সে দোষ কাহার ? আমাদেরই! আমরা যদি ইচ্ছা করি, চেষ্টা করি, এই সমস্ত দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের সাহায্য করিতে, সকলের আগেই যে আমরাই তাহাদের সর্ব্বদুঃখ মোচন করিতে পারি।

দশ বিশ্ পঞ্চাশ দান করিয়া নহে,—তাহাদের কর্ম্মে নিযুক্ত করিলে,

দুর্ভিক্ষও হয় না, এত হাহাকারও শুনিতে হয় না। রাজা ত পাঁচ সাত হাজার—দান করেই কর্ত্তব্য শেষ করলেন, দেশের যাঁরা মাথা, তাঁরা সেই বদান্যতার ঢাক এমনই জোরে বাজাতে সুরু করে দিলেন, যেন এই হ'চ্ছে তাঁদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পাওনা! হারে মাথা তাঁদের! এই দান কত দিন, কতক্ষণ! সে ত সমুদ্র তুলনায় গোষ্পদ বিশেষ! তা'তে কি দুঃখ দূর হয়, না, অভাব মেটে! করুণ দেখি তাঁরা চেষ্টা, দেখ্‌বেন, এই সব অন্নের কাঙালী ভিখারীর দল তাঁত চালিয়ে, মাঠে লাঙ্গল দিয়ে, দেশেরও অভাব দূর করবে, তাদের নিজেদের বুভুক্ষাও তৃপ্ত করবে! তা ত কেউ করবেন না। আর এ কাজ করতে সর্ব্বশক্তিমান গবর্ণমেণ্টের কাছেও হাত পাততে হবে না। নিজেরাই করা চল্‌বে,—তাঁরা শুধু বলুন, থাক্ ম্যানঞ্চেষ্টার কাপড় সাগর পারে, তার আর লঙ্কা ডিঙ্গীয়ে বাহাদুরী নিতে হ'বে না, আমরা এখানেই যে যা পারব, তাই যোগাড় যাগাড় করে পরব। কৈ বলুন দেখি, তাঁরা যে তোমাদের ইয়ুনিভার্সিটি তোমাদের থাক্—তোমাদের ছেলে-মেয়ে, নাতি-পুতি পড়ুক—আমাদের দরকার নেই; তোমাদের আফিসে তোমরাই বড় সাহেব, ছোট সাহেব, কেরাণী, দপ্তরী, বেহারা—সব তোমরাই হও—আমাদের দরকার নেই—পারি ত আমরা যেমন করেই হোক্ আমাদের অন্নসংস্থান করব—দেখি কত বল ধরে ওরা, আর তা'ও দেখি, কেমন বছর বছর দুর্ভিক্ষ রাক্ষসী আমাদের দেশের লোকের রক্ত শোষন করে!

এর ভেতরে এমন মাদকতা ছিল যে, যে কোনদিন দেশনীতি, রাজনীতির কোন সংবাদই রাখিত না, কয়েকমুহূর্ত্তের মধ্যেই সে কতদিনের, কত দূরের চিন্তা করিয়া ফেলিল। এবং চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই সুনীলার মনটি

উত্তেজিত হইয়া উঠিল। ফেণিলা পাণের বাটার সম্মুখে বসিয়া পাণগুলি চিরিয়া থাক্ দিয়া সাজাইয়া রাখিতেছিল, সুনীলাকে নীরব, চিন্তান্বিত দেখিয়া, সে অনেকক্ষণ কোন কথাই বলে নাই। যেইমাত্র সুনীলা দাঁড়াইয়া উঠিয়াছে, সে বলিল—কাউকে দিয়ে আস্তাবলে খবর পাঠিয়ে দাও না মেঝ্, যা'তে ঠিক এগারোটার সময় গাড়ী আনে।

বলে দিই, বলিয়া সুনীলা বাহির হইয়া গেল, ফিরিয়া আসিয়া কহিল—আমিও যাব, নীলা।

ফেণিলা দাঁড়াইয়া, সুনীলাকে দু'হাতে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া পুলকিতস্বরে কহিল—যাবে মেঝ্, যাবে? সে বেশ হ'বে।

সুনীলা বলিল—তুই একলা যাবি -তাই......

ফেণিলা নিরুৎসাহ হইয়া গেল। বলিল—কেন, রাস্তায় বাঘ-ভাল্লুক আছে না-কি?

সুনীলা সে কথার উত্তর দিল না। ফেণিলা আবার বলিল—যারা ভালো জিনিষ চিনেও গ্রহণ করতে পারে না, তাদের মত দুর্ভাগা কেউ নেই এ পৃথিবীতে। তুমিও যে বুঝতে পারছ না, তা নয়। যে কারণেই হোক্ তোমার সে সাহস হ'চ্ছে না—কিন্তু কেন? কিসের ভয়? কা'কেই বা? কার একচালায় চাল তুলে বাস করি যে এত ভয়, এত দৌর্ব্বল্য!

সুনীলা বলিল—না নীলা, ভয় ও নেই, দৌর্ব্বল্যও নয়—আমার কাপড় চোপড় যথেষ্ট রয়েছে, সেগুলো নষ্ট করার কোন দরকার নেই। যে কারণেই হোক্ না কেন, অপব্যয় করা আমি পছন্দ করি নে।

অপব্যয় তোমাকে কে বল্লে? তুমি যা ত্যাগ করবে তা কতজন

বস্ত্রহীনাকে লজ্জা থেকে রক্ষা করবে জান ? তুমি ত কাগজ পড় মেঝদি, একি কোনদিনই তোমার নজরে পড়ে নি যে কত শত সতী রমণী……

সুনীলা বলিল—আমি জানি নীলা।—সে কতদিন এ-সব খবর কাগজে পড়িয়াছে, নীরবে কাঁদিয়া কাঁপড়ে চোখ মুছিয়াছে।

এ-হেন মহান উদ্দেশেও যদি না পার, কি আর বলব তোমাদের!—বলিয়া সে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

সুনীলা ভাবিতেছিল, আজিকার কাগজে হয়ত নিদারুণ কোন দুঃসংবাদ পড়িয়া নীলা উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। সংবাদ লইয়া জানিল, সে স্নানঘরে। সুনীলা উপরে আসিয়া পত্রিকা খুলিয়া এ-পিঠ ও-পিঠ উল্টাইতে লাগিল। কিন্তু কোথাও কিছু খুঁজিয়া পাইল না। ইংরেজ পরিচালিত আর একখানি সংবাদপত্র আসিত, সেখানাও অন্বেষণ করিল, কিন্তু পাইল না। রেশের পাতাটা খুলিতেই মনটি বিষণ্ণ হইয়া গেল। মনে হইল, আজ শনিবার, দিদি থাকিলে এতক্ষণ রেশ্‌ টিপসের লাল নীল জরদা রঙের বহি আসিয়া পড়িত; কত উৎসাহই না দেখা যাইত।—এই কথা কয়টি ভাবিয়াই সে কাগজখানা বন্ধ করিতেছিল, অকস্মাৎ তাহার মনে পড়িল, আর একজন হয়ত এখনও এই সর্ব্বনেশে নেশায় হাবুডুবু খাইতেছে। নীলা ঠিকই বলিয়াছে, এই ঘোড়াভূত কোথা হইতে জুটিল !!

চক্ষু পড়িল, রেশের সংবাদের ঠিক নীচে, একটা বড় ছত্রে :—

বাঙ্গালী জকির অসহযোগ।

সুনীলা নিশ্বাস রোধ করিয়া পড়িয়া গেল। তাহার মর্ম্ম এইরূপ যে, বীরদৎ অকস্মাৎ রেশের সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছেন। আজ বেলা ১২॥ হইতে

তিনটা পর্য্যন্ত এস্‌প্ল্যানেডের মোড়ে রেশগামীদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দান করিবেন। রেশে যাওয়া, জুয়া খেলা যে ভারতবাসীর মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিতেছে এবং পরোক্ষে বিদেশী জুয়াড়ি শয়তানদের প্রভূত পরিমাণে অর্থশালী করিতেছে—ইহাই তাঁহার অসহযোগ পন্থা অবলম্বন করিবার একমাত্র কারণ। এই প্রসঙ্গে ফিরিঙ্গী সম্পাদক যে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া সুনীলার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল।

সে ভাবিতে লাগিল, আমাদের দেশে কি এমন একজনও নির্ভীকচিত্ত, তেজস্বী সম্পাদক নাই যিনি এই ফিরিঙ্গী পুঙ্গবকে কিঞ্চিন্মাত্রায় সহবৎ শিক্ষা দেন।

ফেণিলা নীচে তাহাকে ডাকাডাকি করিতেছিল, শুনিয়া সুনীলা কাগজখানা ফেলিয়া রাখিয়া, বাহিরে আসিয়া কহিল—আমি উপরে আছি, নীলা।

ফেণিলা উপরে আসিয়া বলিল—খাবার দাবার ত কোন উদ্যোগই দেখছিনে মেঝ্‌-দি! আজ কি একাদশীর ব্যবস্থা করেছ?

সুনীলা পরিহাস-সরল কণ্ঠে কহিল—মন্দ কি! দেশের কত লোক ত নিরন্ন রয়েছে, তা'দের জন্য একদিনের গ্রাসই না-হয় ত্যাগ করলে।

ফেণিলা দুই তিনমুহূর্ত্তকাল ব্যথা ক্ষুব্ধ মুখে চাহিয়া থাকিয়া, আস্তে আস্তে বলিল—ঠাট্যা করতে তোমার গলার মধ্যে জিভটা আড়ষ্ট হ'ল না!—তাই ভাবি আমি!—বলিয়া সে ক্রোধরক্তমুখে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছিল, সুনীলা কাঁদ কাঁদস্বরে তাহার হাতটি চাপিয়া ধরিয়া বলিল—আমাকে ক্ষমা কর, নীলা।

ফেণিলা সজোরে বাহুমুক্ত হইয়া বারান্দায় বাহির হইয়া কহিল—

না, না, এত জ্বালাতন আমার সহ্য হ'বে না। আমি ত কারো ভালোতে-মন্দতে থাকি না, যত রাগ সব আমারই ওপর? কেন, কিসের জন্যে? আমি কার কি করেছি!

সুনীলা অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে কহিল—তোর ওপর আমি কি রাগ করতে পারি, নীলা, তুই-ই বল্? তো'কে যে আমি কত ভালোবাসি নীলা, তা কি তুই জানিস্ নে?

ফেণিলা বলিল—জানি গো সব জানি। সব জানি। কার যে কত ভালোবাসা তা আর জান্তে বাকী নেই! সব বোঝা গেছে।—বলিয়া সে আরক্ত মুখখানা অন্যদিকে ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সুনীলা বিস্ময়াভিভূতের মত চুপটি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, ফেণিলার উত্তপ্ত কণ্ঠস্বর পুনরায় শ্রুত হইল—কিন্তু এ'টা তোমরা ঠিকই জেনে রেখো যে, এতে ভয় পাবার মেয়ে নীলা নয়! তোমাদের বিদ্রূপে পিছিয়ে যাব, এমন সঙ্কল্পও আমার নয়। সে, তোমরা সকলে মিলেই কেন যত ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করতে পার, কর-না। আমি যা করব বলেছি, তা আমি করবই। তা থেকে টলাতে পারে, এমন লোক ত আমি দেখি নে।

তবুও সুনীলা কথা কহিল না। এক একটা কথা যেন তাহার ত্বক-মাংস ভেদিয়া অস্থি-পঞ্জরে ঠেকিয়া তাহাকে বেদনাতুর করিয়া ফেলিতেছিল, তবুও সে কথা বলিতে পারিল না। এবং এই নীরবতায় জ্বলিয়া উঠিয়া, ফেণিলা গর্জ্জন করিয়া উঠিল—কি ভাবছ? আজকের আমোদটা একা উপভোগ করতে হ'চ্ছে বলে দুঃখ জন্মাচ্ছে? ডাক-না, ডাক, সিঙ্গী টিঙ্গী কে কোথায় আছে, ডেকে পাঠাও।

সুনীলার অন্তরটি কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিল, কিন্তু এ সবের উত্তরে

কি-যে বলিবে তাহা তাহার অন্তর্য্যামীও জানিতেন না। সে ছোট বোন্‌টির মুখের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রায় দু'মিনিট নীরবে থাকিয়া, ফেণিলা আর্ত্তস্বরে কহিল—বাইরে থেকে কেউ শুন্‌লে তোমাদের দোষ দেবে না। সবাই বলবে এই মেয়েটাই যত নষ্টের মূল। নইলে সবাইয়ের সঙ্গে এরই বা এত বাধে কেন? কৈ আর কারুরই সঙ্গে বাধে না—এই ভাবছ ত? তা'তেই বা ক্ষতি কি? বলুক না, যে-যত পারে, আমি কারু তোয়াক্কা রাখি নে। যার যা খুসী, সে তাই বলুক। আমি কারু কথায় থাকৃতে চাই নে, আমার কথাতেও কেউ যেন না থাকে! আরো ভালো হ'ত, যদি আমি এখান থেকে যেতে পারতাম! কিন্তু তা আর হ'বে না,—আর আমি কোথাও যেতে পারব না।

সুনীলা স্নেহার্দ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসিল—কে তোকে যেতে বল্‌ছে নীলা?

মুখে আর কে কবে কা'কে বলে থাকে বল? কেউ বলে না, অতি বড় অভদ্র যে, সে'ও না। তা না-ই বলুক, কিন্তু আমি বুঝি ত? আমি হ'লুম, সবার চক্ষুঃশূল! আমা হ'তেই তোমাদের সুখের ঘরে দুঃখ প্রবেশ করেছে, আমার জন্য বাবা দেশত্যাগী, নিরীহ বেচারা খগেন বাবু বিতাড়িত, লাঞ্ছিত, সিংহ পলাতক......

এক কথা কতবার বল্‌বি নীলা! সেদিন-না বলেছি তো'কে যে, এর কোনটাই সত্যি নয়।

হ্যাঁগো, বলেছিলে ত! সে কি আমি ভুলে গেছি? ভুলি নি! কিন্তু এই যে কাল চিঠি এল, সুশীলা—সুনীলার খবরের জন্যই ব্যস্ত—আমার ত একটা আশীর্ব্বাদ ছাড়া চিঠিতে উল্লেখ পর্য্যন্ত নেই।

কাল হেরম্বনাথের পত্র আসিয়াছিল, ফেণিলা তাহা দেখিয়াছে। বলিল – আমার বাবা এমন ছিলেন না! তাঁকে লাগিয়ে ভাঙ্গিয়ে সবাই এই রকম করেছে—সে আমি জানি।—সে চুপ করিল। নিমেষমাত্র কাল,—পরে পুনরায় কহিল – যখন কার্সিয়ঙে আনতে যান, আমি ত আসতে চাই নি! আমাকে জড়িয়ে ধরে', এক হল্ লোকের সামনে বাবা যে কেঁদে ফেলেছিলেন বলতে বলতে, যে নীলা, তুই তোর মা'র একমাত্র প্রতিচ্ছবি! আমার এ বৃদ্ধ বয়সে তোর মা নেই, তুইও যদি না থাকিস, আমি যে মরেও সুখী হ'তে পারব না।—বলিতে বলিতে সে কাঁদিয়া ফেলিল। স্বর্গীয়া জননীর উল্লেখমাত্রে সুনীলা, কক্ষগাত্র বিলম্বিত হাস্যময়ী জননীর তৈলচিত্রখানির পানে চাহিয়া, করজোড়ে প্রণাম করিল।

ফেণিলা বলিতে লাগিল, সেই বাবা আমার নন্, কাজেই এ গৃহও আমার বাসের স্থান নয়—তবুও আমি কোথাও যেতে পারব না। মিস্ টডের কাছে আমি চিরদিনই স্বাগত, কিন্তু আর না! তাঁদের সম্পর্ক রাখাও আর আমার চলবে না।

কেবলমাত্র কৌতূহলের বশেই সুনীলা জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিয়াছিল—কেন নীলা?

ফেণিলা আরো উগ্র হইয়া উঠিল, কহিল, কেন? তা শুনলে যে হাসি-বিদ্রূপ থামাতে পারবে না দিদি! না, না, শোন, তার পর হাস, আর যাই কর,—আমি দেখ্‌ব না, চাইবও না।

সে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া দৃঢ়স্বরে কহিল—আমি যে হুজুগে দিদি! আমি হুজুগই করবো! নন্-কো-অপারেশনের হুজুগ শুনেছ ত?—আমাকেও পেয়ে বসেছে সে! আমি অসহযোগ করব।

কার সঙ্গে? আমাদের সঙ্গে?

যদি দরকার হয়! হাসছ! হাস। হ্যাঁ, যদি আমার পথে চল্‌তে তোমাদের সঙ্গে বিরোধ বাঁধে, তোমাদের ছাড়তেও আমি পারব, দিদি! আজন্ম মিস্ টডের স্নেহভোগ ক'রেও যদি দুঃসময়ে তাঁর স্নেহের আশ্রয়টি ত্যাগ করা আমার দুঃসাধ্য না হ'ল, তোমাদের ছাড়তেও কষ্ট হ'বে না।

সুনীলা বলিল, আজকের "এংলো ইণ্ডিয়ান" পড়েই এই মত হ'য়েছ বুঝি?

ফেণিলা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—হ্যাঁ, তাই! সে খবরটিও পেয়েছ! তাই বুঝি ও ঘরে কাগজ ওল্‌টাচ্ছিলে?

কাগজ আজ কি নতুন ওল্‌টালুম নীলা?

না, নতুন নয়, পুরাতন! কিন্তু সকালটা কাটে রান্নাঘরেই; বোধ করি, সকালে কাগজ পড়া এই প্রথম।

বেশ, তাই যেন হ'ল! কিন্তু বীরদৎ রেশ্‌ ছেড়েছেন, নন্-কো-অপারেশন করছেন, সব সত্যি হ'তে পারে, কিন্তু আবার যে বিলেত চল্লেন, তার কি? বিলেত যাওয়া, বিদেশের জাহাজওয়ালাদের মুঠো মুঠো টাকা ঢালা, তা'দের দেশে গিয়ে বাস করতে খরচা করা—এ সব বুঝি নন্-কো-অপারেশনের গণ্ডীর মধ্যে নয়? সম্পাদক ত বেশ ব্যঙ্গই করেছে!—একটু আগে এই সম্পাদকের বিরুদ্ধে দাঁড় করাইতে সে দেশের লোককেই আহ্বান করিয়াছিল, এখন তর্কের সময়ে তাহার মুখ দিয়া একেবারে অন্তরূপ বাহির হইয়া পড়িল।

ফেণিলা বলিল, সে কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা করো—আমি জান্‌ব কোত্থেকে?

প্রীতির
নিদর্শন

তা জানিস নে, কোন খবরই রাখিস্ নে, তবু মেতে উঠ্‌লি ?

মেতে আমি তা'তেই উঠি নি, দিদি! মেতে চিরদিনই ছিলুম। আগুন চিরদিনই জ্বলছিল, হঠাৎ বাতাস পেয়ে দিগ্দাহ সুরু করে দিয়েছে।

সুনীলা বলিল—কিন্তু বাতাস ত তিনি!—যার সম্বন্ধে তুমি একেবারেই অজ্ঞ! যা'কে একটি দিন, দশটিমিনিটের বেশী কাছে দেখই নি!

ফেণিলা বলিল—আমি ত অন্ধ নই যে, সারাজীবন ধরে দেখব আর বলব, তবু দেখার আশা আমার অপূর্ণই রয়ে গেল। আর অজ্ঞতার কথা বল্‌ছ, কাগজে যতটুকু বেরিয়েছে, আর যা বেরোয় নি, এ তিনিও যেমন জানেন, আমিও তেমনি জানি! যাদের উদ্দেশ্য এক, তা'দের চলবার পথ-ও ডু'টি নয়।—বলিয়া সে সোজা নীচে পাকশালায় প্রবেশ করিল।

সুনীলা নিশ্চল প্রতিমূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল—ইহা কি? ফেণিলার সঙ্গে সকল বিষয়েই তাহার মনে যোগ ছিল, আজ অজ্ঞাতে, বিধির বিপাকে ফেণিলার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া তাহাকেও ক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিয়াছে, তাহার নিজের অন্তরের অন্তর-সমুদ্রও বিক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। সে শুধু ভাবিতেছিল, যাহাদের উদ্দেশ্য এক, বাস্তবিক তাহাদের বিচরণ পথও একটি কি না! অথবা এ অন্য কিছু! অন্য আর কি হইবে?—কিন্তু তাহার মন এইখানে সায় দিল না, কে-যেন বিরুদ্ধ মত সুনীলার অধরে জাগাইয়া তুলিতেছিল, পাছে সত্য সত্যই সেই কথা বিশ্বাস করিতে হয়, সে আপনার মনে এই বলিতে বলিতে নামিয়া লাগিল—যে, এ-কি? এ—কি?

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

উত্তেজনা ও অবসাদ।

সারা দিনটা সুনীলা তাহার ছোট বোনটির প্রসন্নতা কামনা করিয়া ফিরিতে লাগিল কিন্তু নীলা সেই-যে বলিয়াছে, আমার বিচরণ পথে বাধিলে তোমাদের ত্যাগ করাও আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হইবে না, সে কোন সময়েই সুনীলার সামনে ধরা দিল না। আরো অধিক আশ্চর্য্য এই যে, সারা দিনমান এত রকম বিরকমের কার্য্যে আপনাকে মগ্ন রাখিল যে, সুনীলা একটিবারও এমন অবসর পাইল না, তাহার সঙ্গে দু'টি কথা কয় বা হাতে ধরিয়া তাহার ক্ষমা ভিক্ষা করে।

রাত্রে আহারাদির পর ফেণিলা মধুর সাহায্যে পিতার শয়ন মন্দিরে নিজের শয্যা লাগাইয়া লইল এবং চাকর বাকরের খাওয়া দাওয়ার তত্ত্বাবধান করিয়া সুনীলা উপরে আসিয়া দেখিল. সে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া গেছে। ইহাতে তাহার ক্ষোভ খুবই বাড়িয়া গেল এবং সুষুপ্ত বাড়ীখানার মাঝে, অন্ধকারে দাঁড়াইয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল। অনেকক্ষণ কাঁদিল, ভারী কাঁদিল। আজ তাহার নিজের জীবনটাকে এমন অভিশপ্ত, অসার বোধ হইতে লাগিল যাহা আর সে কোনদিনই অনুভব করে নাই। অন্ধকারে কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার চোখের জল যখন শেষ হইয়া গেল, বুকটি অভিমানে ভরিয়া গেছে। এতখানি স্নেহের বিনিময়েও ফেণিলা যখন তাহার প্রতি এমন নির্দ্দয় রূঢ় আচরণ করিতে পারিল, তখন কোন সান্ত্বনাকেই বুকের মধ্যে সে স্থান দিতে চাহিল না। নিজের

ঘরে ঢুকিয়া, অন্ধকারে বিছানায় শুইয়া সন্তাপহারিণী নিদ্রাদেবীর আরাধনাতেই মন দিল। কিন্তু হায়! বুকটি যে অভিমানে বেশী করিয়া ব্যথায় ভরিয়া ওঠে, দুঃখের চেয়ে, অভিমানে যে বুকের রক্ত অজস্রধারে চক্ষু বহিয়া ক্ষরিয়া পড়ে। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত পড়িয়া থাকিয়াও চোখের পাতায় নিদ্রা ত আসিলই না, যত রাজ্যের ভাবনা চিন্তা একীভূত হইয়া তাহার মনের পাতায় ঝাঁকিয়া বসিতে লাগিল।

যতদিন ফেণিলা এ বাড়ীতে আসিয়াছে, একটি দিনও সে সুনীলার কাছ-ছাড়া হইয়া সুখ-রজনীও অতিবাহিত করে নাই, আজ এই প্রথম সে বিচ্ছিন্ন হইয়া কক্ষান্তরে নিদ্রাগত হইয়াছে। সন্তানের প্রতি বাৎসল্যে আঘাত প্রাপ্ত হইলে জননীর বুকটি যেমন অভিমানে ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠে, সুনীলার নারী চিত্তটি তেমনি করিয়া উঠিল। সে পাশের বালিশটার মধ্যে মুখ চাপিয়া অন্ধকারেও সজোরে চক্ষু পল্লব মুদ্রিত করিয়া পড়িয়া রহিল।

হঠাৎ একসময়ে সেই দীর্ঘ, সুপুষ্ট পাশের বালিশটাকেই ফেণিলা জ্ঞানে বুকে চাপিয়া চুম্বনে ভরিয়া দিতে দিতে, মনের সব গ্লানি ব্যথা নিঃশেষ করিয়া যেই ডাক দিল, নীলা, নীলা, বোন্‌টি আমার!—তাহার মন লাফাইয়া বলিয়া দিল, কোথায় নীলা, কোথায় নীলা! তাড়াতাড়ি উঠিয়া খাটের বাজুতেই নিবদ্ধ সুইচ্‌টি টিপিয়া, ভয়ে ভয়ে আলো জ্বালিয়া দিল। আস্তে আস্তে চোখের পাতা উন্মীলিত করিয়া দেখিল, নীলা নাই। তাহার মনে হইল, যেন সে এই ছিল, এখনি উঠিয়া গেছে। বিছানার সবটাই এলোমেলো হইয়া রহিয়াছে। সে-যে নিজেই ছট্‌ফট করিয়া বিছানাটাকে এমন বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিয়াছে এ তাহার যেন

মনেই ছিল না, মনে পড়িতেই সমস্ত চিত্ত বিস্বাদে ভরিয়া গেল। বাতিটি নিবাইয়া সে পুনরায় শয্যাশ্রয় গ্রহণ করিল।

এতবড় রাস্তার উপরে বাড়ীখানা, তবুও এমনি নিঃশব্দ, নিঝুম যে সুনীলা সেদিকে মন দিয়াও যে একটু বিমনা হইবে, তাহারও জো নাই। সাড়াশব্দহীন রাজধানীর রাতটা যেন কাটিতে চাহে না। ঘরে একটা না-বাজা ঘড়ি ক্রমাগত টুক্ টক্ করিয়া কর্ত্তব্য রক্ষা করিয়া চলিতেছিল তাহার দিকে চাহিয়া সময় জানিয়া লইতেও সুনীলার সাহস হইতেছিল, না, যদি সে এখনও অনেক রাতেরই বিজ্ঞাপন দিয়া বসে! ঐ একটা কাক ডাকিল, না? কাকই ত! তবে আর রাত নাই, প্রভাত সমাগত হইয়াছে। আঃ বাঁচা গেল! ঐ-যে আবার একটি ডাকিল! বেশ হইয়াছে। আবার,—আবার। এবার দু'টিতে মিলিয়া কোলাহল করিতেছে। বোধ করি ইহাদের আজ আর ঘুম হয় নাই, সকলের আগে এই দু'টিই জাগিয়াছে। তাহার মনে হইল, হয়ত ফেণিলা-ও ও-ঘরে এমনি জাগিয়া রাত্রি প্রভাতের আশায় পড়িয়া আছে সে জানিতে পারিতেছে না বটে, কিন্তু সে যে নিশ্চয়ই বিনিদ্র, সে বিষয়ে সুনীলার এতটুকু সন্দেহ রহিল না এবং ইহারই অনুকূলে যত প্রকারের যুক্তিতর্ক আছে. সব তাহার মনে ভাসিয়া উঠিল। মনে পড়িতেই, দ্বারটি খুলিয়া আস্তে আস্তে বাহিরে আসিয়া এক মুহূর্ত্তের জন্য স্থির হইয়া দাঁড়াইল। কৈ—এখনও ত নিশান্তের অরুণ-রেখাটি আকাশের কোল ফিকা করিতে পারে নাই! তবে যে কাক ডাকিয়া গেল, সে-কি মিথ্যা! ঘরে ফিরিয়া, আলো জ্বালিয়া দেখিল, তখনও তিন ঘণ্টা রাত বাকী। আবার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। আকাশের সর্ব্বাঙ্গে রাত্রিজাগরণ-ক্লান্ত, নিস্তেজ নক্ষত্রদল পিট্

পিটু করিয়া চাহিয়া আছে। তাহাদের দৃষ্টির কোন জ্যোতিঃ নাই এবং অগণিত তারকার মিলিত আলোকও আকাশের ঘণীভূত অন্ধকারকে কিছুমাত্র আলোক দান না করিয়া আঁধারেই ভরিয়া রাখিয়াছে। এই দিগন্তব্যাপী অন্ধকারে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সে শৈত্য অনুভব করিতেছিল। ফিরিয়া ঘরে ঢুকিবে, কাহার কাতর ক্রন্দন ধ্বনিতে চমকিত হইয়া, উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইল। না, ক্রন্দন নয়, যন্ত্রণার কাতরতা! মনে হইল, নীচে চাকরদের ঘর হইতে শব্দটা উঠিয়া, অস্পষ্টভাবেই তাহার কাণে পশিতেছে। বারান্দার সুইচ্‌টি টিপিয়া, সে নীচে নামিয়া আসিল— চাকরদের ঘর খোলাই রহিয়াছে, উঁকি দিয়া দেখিল, মধু, নূতন বালক-ভৃত্য জগন্নাথ অকাতরে ঘুমাইতেছে—অদূরে রামটহলের গৃহ-দ্বারে হ্যারিকেনটি অল্প বাতাসে দুলিয়া দুলিয়া মৃদু আলোক বিকীর্ণ করিতেছে, সে'ও নিঃশব্দে পড়িয়া আছে। তবে, উপরে নয় ত! কাণ খাড়া করিয়া থাকিয়া তাহার যেন মনে হইতে লাগিল, এই চাকরদের ঘরের উপরেই পিতার কক্ষ, শব্দ সেদিক হইতেই আসিতেছে! আসিবার কালে অতি সন্তর্পণেই সে আসিয়াছিল, কিন্তু যাইবার সময় এমনই বিক্ষিপ্তচরণক্ষেপে সে দু'তিনটা ধাপ লাফাইয়া উঠিতে লাগিল যে, মধু জাগিয়া উঠিয়া, রামটহলকে খুব জোরে হাঁক্ পাড়িয়া তুলিয়া ফেলিল।

সুনীলা ঘরের মধ্যে ঢুকিতেই ফেণিলা কাতরস্বরে কাঁদিয়া উঠিল,— আমি যে গেলুম দিদি!

সুনীলা আলো জ্বালিয়া, খাটের নিকটে আসিতেই, ফেণিলা আলু-থালুবেশে সরিয়া, খাটের প্রান্তে আসিয়া, সুনীলার উরুদ্বয়ের মধ্যে মুখ রাখিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—আমার মাথা যে ছিঁড়ে গেল, মেঝ্।

প্রীতির

নিদর্শন

সুনীলা গাল দু'টি, কপালটিতে হাত রাখিয়া দেখিল, আগুন! দু'হাতে মুখটি তুলিয়া খাটে বসিয়া বলিল—জ্বর হ'য়েছে নীলা?

ফেণিলা আরক্ত নয়নদ্বয় সুনীলার মুখে নিবদ্ধ রাখিয়া বলিল—এ-কি জ্বর, মেঝ্? এত যন্ত্রণা হয় জ্বরে? মাথাটা যে ছিঁড়ে যাচ্ছে আমার!

সুনীলা দু'হাতে কপালটি টিপিয়া দিতে দিতে বলিল—কখন্ জ্বর হ'ল ভাই? আমাকে ডাকিস্ নি কেন? সারা রাতই ত আমি জেগে পড়ে আছি, নীলা।

নীলা হতাশভাবে বলিল—ডাকি নি. মেঝ্? ডেকে ডেকে গলা চিরে গেছে, তবু তোমার সাড়া পেলুম না। তখন ভাবলুম, তোমার রাগ রয়েছে, তাই সাড়া দিলে না।

সুনীলা বলিতে গেল, রাগ!—হারে মূঢ়! হারে অবোধ!—রাগ!
———ফেণিলা বলিয়া উঠিল, তখন নিজেই উঠে ডাক্‌তে যাচ্ছিলুম। এই দেখ না—মাথাটা টলে গেল!—বলিয়া সে দক্ষিণ হস্তের কুনুইটি উত্থিত করিয়া ধরিল।

পড়ে গেছলি নীলা! এঃ! এ-যে কেটে রক্ত জমে নীল হ'য়ে গেছে। দাঁড়া ভাই, একটা জল পটি দিয়ে দিই—ব্যথাটা কম হ'বে।

কম হবে কি বল্‌ছ মেঝ্? ব্যথায় যে নাড়তে পারছি নে. ভাই।

তবু কমে যাবে।……এই মধু! কেন তোরা হট্টগোল করছিস্?

চোর আসিয়াছিল. এবং তাহাকে সতর্ক জানিয়াই ফিরিয়া গেছে এই সংবাদ দিয়া মধু কৃতীত্ব অর্জ্জনাকাঙ্খায় কি-সব বলিতে গেল, সুনীলা তাহাকে ডাকিয়া বলিল—খুব বীর তুই, আমি জানি। যা, পড়বার ঘরের তাকে আইডিনের শিশিটা আছে, নিয়ে আয়। আরও এক

কাজ ক'র, জগা ষ্টোভ্ জ্বেলে খানিকটা জল গরম করে আস্তে বল রত্নানিকে।

জগা চলিয়া গেল। ফেণিলা বলিল—এত জ্বরে মানুষ বাঁচে মেঝ্?

ও-কি কথা নীলা!

না-তাই জিজ্ঞাসা করছি।

জ্বর খুব বেশী হয় নি, নীলা! বোধ হয় ১০২°র ওপর হ'বে না। ওরে মধু, ঐ খেনেই থার্ম্মোমিটার আছে, সেটাও আনিস্।

ফেণিলা কাৎরাইতে কাৎরাইতে কহিল—মাথা যে গেল দিদি!

এখনি সেরে যাবে, নীলা! ভয় কি। তোর ত জ্বরটা আস্টা হয় না কি-না, তাই প্রথম দিনটিতে এত যন্ত্রণা হ'চ্ছে। কিছু ভয় নেই—এখনি ফুটবাথ্ করে দিচ্ছি, আরাম হ'য়ে যাবে। —বলিয়া সে সযত্নে মাথাটি টিপিতে লাগিল। ফেণিলা উদাস দৃষ্টিতে ঘরের কড়িকাঠের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিল—যদি আর না সারে, জ্বর, মেঝ্? আমার ত মনেই হ'চ্ছে না যে, এ জ্বর আর সারবে!

কেন সারবে না? ভারি ত জ্বর, তার আবার ভয়। বাংলা দেশে ঘরে ঘরে এ একেবারে নিত্যকর্ম্মের মধ্যে। নাইচে, খাচ্ছে, জ্বর আস্চে, খানিক কোঁ কোঁ করচে, ডিঃ গুপ্ত গিল্চে, একটু নরম পড়লেই বত্রিশ লাফ মেরে সজোরে হুটোপাটি করে' বেড়াচ্ছে। বাংলা দেশে জ্বর এত আপনার জন, যে তার জন্যে কেউ ভাবেও না, ভয়ও পায় না।

তাদের মাথায় এই রকম যন্ত্রণা হয়? এই রকম হাতুড়ী মারার শব্দ হয়? না মেঝ্, তা হ'য় না। তা হ'লে বাংলা দেশের লোক বেঁচে থাকৃত না।

প্রীতির

নিদর্শন

তোর সব তা'তেই বাড়াবাড়ি, নীলা। বল্‌ছি আমি কিচ্ছু হয় নি, তবু বক্‌বি? চুপ কর, এখনি মাথার যন্ত্রণা কম্‌বে'খন।

রব্বানি মস্ত একটা এলুমিনিয়ামের পাত্রে গরম জল, জর্গা আইডিনের শিশি ও থার্মোমিটার লইয়া প্রবেশ করিতেই, সুনীলা জলের পাত্রটি ফেণিলার পদনিম্নে রাখিয়া কহিল—পা-টা তোল্‌ ত নীলা!—পা দু'টি গরম জলের মধ্যে ডুবাইয়া ধরিয়া বলিল—সহ্য হ'চ্ছে নীলা?

নীলা কথা কহিল না। কিন্তু সে-যে কথঞ্চিৎ আরাম অনুভব করিতেছে, তাহার মুখের দিকে চাহিয়াই, সুনীলা বুঝিতে পারিল। রব্বানির দিকে ফিরিয়া কহিল—খুব ভোরেই সতীশ ডাক্তারের কাছে যেতে হ'বে রব্বানি। বল্‌বি, বাবু নেই, দিদিমণি বড্ড ভাবছেন।

রব্বানি বলিল—এখনই যাব মা? ভোর ত হ'য়েছে।

ফেণিলা চক্ষু খুলিয়া কহিল—না রব্বানি, কোথাও যেতে হবে না তোমায়।

সুনীলা আর্ত্তের মত বলিয়া উঠিল—ছিঃ নীলা।

ফেণিলা বলিল—না দিদি, অষুধ আমি খাব না, প্রাণ যায়, সেও ভালো। তুমি যে কতকগুলো বিলিতি অষুধ খাওয়াবে সে হ'বে না, কখনই হ'বে না।

সুনীলা বলিল—বেশ। দেশী অষুধ খেতে ত দোষ নেই, আমি কবি-রাজ ম'শাইকেই ডাকাবখন।

ফেণিলা মাথাটি নাড়িয়া বলিল, তা'ও না। অষুধ আমি খাবই না, এ তুমি দেখে নিও। কেন? অসুখ হ'লেই অষুধ খেতে হ'বে, ডাক্তার কব্‌রেজ না হ'লে চলবে না—এ সব কি? কৈ—আমাদের দেশের

গরীব গুর্ব্বোরা কি করে? ক'টা ডাক্তার, ক'গণ্ডা কবরেজ দেখিয়ে অযুধ খেয়ে তবে বাঁচে তারা?

সুনীলা বলিল, আচ্ছা—তুই চুপ কর। নাই-বা এল তারা। অমনি অমনি গেলেই ত ভালো।—বলিয়া সে পা দু'টি টুয়ালে দ্বারা উত্তমরূপে মুছিয়া দিল। রব্বানিকে ইঙ্গিত করিতে সে'ও বাহির হইয়া গিয়াছিল, সুনীলা জিজ্ঞাসিল—মাথাটা একটু কমেছে নীলা?

কি জানি। কমেছে বোধ হয়।—বলিয়া নীলা ও-পাশ ফিরিয়া শুইল। পাঁচ মিনিট না যাইতেই সে আবার হাত পা ছুড়িয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। সুনীলা জিজ্ঞাসিল—আবার যন্ত্রণা হচ্ছে নীলা?

ফেণিলা সাড়া দিল না। নিজের মনেই চীৎকার করিতে লাগিল। সুনীলা তাহার মাথাটি কোলে তুলিয়া লইয়া টিপিয়া দিতে দিতে বলিল—চুপ ক'রে শুয়ে থাক, লক্ষ্মী দিদিটি আমার। এখনি সেরে যাবে। কেবল তুমি চুপ করে থাকো, আমি মাথাটা টিপে দিই।

না, না, টিপ্‌তে হবে না—আমার মাথা, ছেড়ে দাও বল্‌ছি, ছেড়ে দাও……

সুনীলা ভয় পাইয়া হাত সরাইয়া লইতেই, সে বলিতে লাগিল—কক্‌খোনো, কাউকে দেব না আমি, হাত দিতে আমার গায়ে। একটু জ্বর হ'য়েছে, ডাক্ ডাক্তার। মাথা কামড়াচ্ছে—অমনি টিপ্‌তে হ'বে! হ'বে না টিপ্‌তে, কথনো হ'বে না। সরে যাও, মেঝ্‌ দি, ভালো হ'বে না, সরে যাও আমার কাছ থেকে। আমি চাইনে সেবা! আমার

লোক আছে, আমার পয়সা আছে—তাই! ওঃ কি সব দয়ার শরীর! মায়ার শরীর গো!

সুনীলা অল্প দূরে, বিষণ্নমুখে বসিয়া রহিল।

ফেণিলা বলিতে লাগিল—আর তা যদি পার, মেঝ্-দি, যে যেখানে যত আর্ত্ত, পীড়িত, দরিদ্র দেখ্‌বে, তোমার সেবা-হস্ত দু'টী দিয়ে তাদের দুঃখ, তাদের পীড়া, তাদের দৈন্য তুলে মুছে নিতে, ত এস—বলিয়া সে অকস্মাৎ উঠিয়া সুনীলার হাত দু'টি বুকের 'পরে চাপিয়া ধরিল। এক মুহূর্ত্ত পরে বলিল—তা হ'লে দাও দিদি, আমার সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে, আমার সব রোগ তোমার ঐ হাতের স্পর্শেই বিদূরিত হ'য়ে যাবে।

সুনীলা বুঝিয়াছিল, এই উত্তেজনার মুখে তাহাকে বাধা দিতে গেলেই প্রমাদ,তাহাতে অপকার ছাড়া উপকারের কোনই সম্ভাবনা নাই। তাই সে চুপ করিয়া রহিল।

ফেণিলা বলিল—মেঝ্, সত্যি বল্‌ছি—সারা রাত এ-ই ভেবেছি আমি। এমন ক্ষমতা আমার থাকৃত যে আমি বিশ্বশুদ্ধ যেখানে যে আছে সকলের শোকে, দুঃখে সমানভাবেই আমি তা'দের কাজে লাগতে পারি, তবেই যেন আমার সাধনা সার্থক হয়। তবেই আমার বেঁচে সুখ, জীবনে শান্তি, সুখে তৃপ্তি পাই! মেঝ্, ভাবতে ভাবতে মাথাটা এত গরম হ'য়ে গেলো, পুরো দমে পাখা চালিয়েও, গলা শুকিয়ে কাঠ্ হ'য়ে এলো, কুঁজোটাই গলায় ঢেলে,—ঐ দেখ-না!—বলিয়া সে টিপয়টার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল। কুঁজোটা টিপায়ের নীচে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া আছে। সুনীলা বুঝিল, তখন হইতেই উত্তেজনায় তাহার মনটি ভরিয়া গিয়াছিল।

এবং সেই সময়েই প্রবল জ্বরও আসিয়াছে। বলিল—তখনই জ্বর হ'য়েছে, নীলা!……দেখি, এখন কত আছে? বলিয়া সে থার্মোমিটারটি দু'টি আঙ্গুলে চাপিয়া নিকটে আনিতেই, ফেণিলা হঠাৎ সে'টাকে টানিয়া লইয়া সজোরে ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল,—আবার এনেছ, ওই সব ছাই-ভস্ম আমার কাছে!

সুনীলা সত্য সত্যই ভয় পাইয়া গিয়াছিল—সে নতমুখে নীরবে বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল। ফেণিলা আর একবার মুখ তুলিয়া এদিকে ফিরিয়া বলিল জান-না, অসুখের সময় খুব শুদ্ধাচারে থাকৃতে হয়, ঐ-সব ছাই-পাঁশ এনে বিছানাটাই মাটী করলে!—বলিয়া মাতালের মত লাল চোখ দুটিতে কট্‌মট্ করিয়া চাহিয়া, তখনি আবার নির্জীবের মত শুইয়া পড়িল।

সুনীলা আধ ঘণ্টা বসিয়া যখন সাড়াশব্দ পাইল না, স্নেহের স্বরে ডাকিতে লাগিল। তাহাতেও সাড়া আসিল না। তখন সে নিজের মনেই বলিল—উত্তেজনার পরিণাম আরম্ভ হইয়াছে।

বিংশ পরিচ্ছেদ

অসময়ে।

জ্বর যে কারণেই হোক এবং নীলা তাহাকে যত আশ্বাসই দিক, সুনীলার ভয় কিছুতেই দূর হইতেছিল না। তাহার পর যখন থার্মো-মিটার ভাঙ্গিয়া নীলা এক দম নিস্তেজ হইয়া শুইয়া পড়িল, তখন সে ভয়ে

ভাবনায় একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল। ঈশ্বর না করুন, যদি জ্বর খাড়ে, অন্যান্য উপসর্গও আসিয়া জোটে, তখন সে একলা, এই নির্বান্ধব পুরীতে, কাহার ভরসায় তাহাকে লইয়া থাকিবে? কালই শৈলেনের নব-বধূটি বলিতেছিল, তাহাদের বাড়ীশুদ্ধ লোক জ্বরে পড়িয়া; পাশের বাড়ীর কমলা, কমলার মা, চারু, চারুর ছেলে-মেয়ে, সব চিঁ চিঁ করিতেছে—এ ত সে নিজের চোখে কাল দুপুরে ছাদ হইতে দেখিয়াছিল। ফি বছরই এমনই সময়ে, কি সহরে কি পল্লীতে নানারকমের জ্বর দেখা দেয়, কোন কোনটা মারাত্মক হয় বলিয়াও শুনা গেছে। ভগবান করুন, নীলার মস্তিষ্ক-উষ্ণতার জ্বর এক দিনেই ছাড়িয়া যাক্, কিন্তু যদি ভিন্ন পথ গ্রহণ করে? তখন? তখন, সে কাহার মুখ চাহিবে? কে তাহাকে এ দুঃসময়ে অভয় দিবে?

রব্বানিকে ডাক্তার বাড়ী পাঠাইয়া ডাক্তার আনাইয়া, জ্বর পরীক্ষা করাইয়া যদি আবশ্যক হয়—পিতাকে টেলিগ্রাম করিবে, এই সঙ্কল্প করিয়া সে ফেণিলার শয্যা হইতে উঠিয়া পড়িল। বাহিরে আসিয়া—প্রভাতালোকে সে যাহা দেখিল, নিজের চোখকে বিশ্বাস করিতেই তাহার ইচ্ছা হইতেছিল না। তাহাকে সে, সব চেয়ে বেশীই জানে। সে-ই যে আবার এ-ফটক পার হইয়া এই গৃহে প্রবেশ করিবে ইহাও ছিল যেমন তাহার কল্পনাতীত, আগন্তুক যখন মধুকে ছাড়িয়া, তাহার দিকে চাহিয়াই জিজ্ঞাসিল—নীলার কি খুব বেশী অসুখ?—তখন আর কোন বিস্ময়, কোন সন্দেহই রহিল না। প্রভাতের রৌদ্র ঠিক সেই সময়ে বারান্দার সেই অংশটায় পড়িয়া রক্তিম করিয়া তুলিয়াছিল, সেই দিকে চোখ রাখিয়াই সে দাঁড়াইয়াছিল, ইহার কণ্ঠস্বরে ফিরিয়া চাহিয়া, কহিয়া উঠিল

—বড় অসুখ, খগেন বাবু! বড় অসুখ। আপনি উঠে আসুন না! এসে একবার দেখুন ত—আরও কতকগুলো কথা আছে—বলছি।

খগেন প্রশ্ন করিল—যাব?

সুনীলা যেন দু'হাত বাড়াইয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে চায়। ব্যগ্রস্বরে বলিল—আসুন, আসুন। আপনি দেখ্‌লে তবে পাঠাব ডাক্তারের কাছে।

খগেন উপরে আসিতেই সুনীলা ঘরে ঢুকিল, খগেনও অনুসরণ করিয়া নীলার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া বলিল—এ কি বিছানা সু? একটা লেপ, তোষক, কি চাদর নেই তোমাদের?

সুনীলা বলিল—থাকবে না কেন? ও-যে কৃচ্ছ্রসাধন করছে, সে সব নেবে না।

খগেন—তুমি বের কর ত দেখি, নেয় কি-না—বলিয়া নীলার কপালে হাত দিয়া উত্তাপ দেখিল। "জ্বর কত? চার, না?"

চার, পয়েন্ট দুই!

আরো বাড়বে। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে পাঁচ হ'বে। কৈ...... আন্‌লে?

কক্ষের এক পার্শ্বেই বিছানাপত্র স্তূপাকারে পড়িয়াছিল, সুনীলা সেদিকে অগ্রসর হইতেই খগেন অনেকগুলা তোষক খাটের এক পাশে পাতিয়া বলিল—চাদর লাগাও, আমি তুলি ও-কে।

ফেণিলাকে স্পর্শ করিতেই রক্তচক্ষু মেলিয়া সে বলিয়া উঠিল—থাক্‌।

খগেন তবুও দুই হাতে তাহার বক্ষবেষ্টন করিয়া ধরিল, বলিল—থাক্‌ কেন, তাই শুনি।

নিদর্শন

ফেণিলা বলিল—থাক্।

খগেন একবার সুনীলার দিকে চাহিয়া, জোরের সঙ্গে বলিল—থাক্ বল্লে চল্‌ছে না, উঠে এস।

এতদিন যদি চলে থাকে, আজও চল্‌বে, ছাড়ুন, আপনি। বলিয়া সে খানিকটা দূরে সরিয়া গেল।

খগেন এ অভিমানের কারণ বুঝিল এবং এ'র বিরুদ্ধে প্রমাণ তাহার পকেটেই ছিল, কিন্তু সে-সবের কোনটাই তাহার মনে বা মুখে আসিল না। সে কেবলমাত্র বিহ্বলের মত বলিল—এই ত জ্বর হ'ল মাত্র —'ক'দিন' আর কেটেছে কৈ ?

কেটেছে, কেটেছে! কেন আমায় ত্যক্ত করছেন, সরুণ। ে আছি আমি।

তা না-হয় বেশই আছ, কিন্তু কারণটা কি শুনি ? যোগাভ্যাস করছ না-কি যে, কৃচ্ছ্র সাধন সুরু হ'য়ে গিয়েছে ? তপ্ যপ্ করছ আজকাল ?

সুনীলা বলিল—অসহযোগ ! স্বাবলম্বন !—বুঝলেন ?

ওঃ ! তাই বল ছাই !—বলিয়া খগেন একচোট্ হাসিয়া লইল। তাহার পর কহিল, আজকাল ও-একটা ফ্যাসানের মধ্যে দাঁড়িয়েছে। কাল মিঃ বীরদত্তের সঙ্গে দেখা, অসহযোগ ! আমি বলেছিলুম, গুড্-মর্ণিং !—ব্যস্, প্রাণ যায়। একগাদা লোকের সামনে আমাকে এই মারে ত এই মারে ! আমাদের মেসের হেমবাবু বলে একটি ভদ্রলোক আছেন, ফিরীঙ্গির কাছে চাকরী করাও ছেড়ে দিলেন। খুব একটা হৈ-চৈ সুরু হ'য়ে গেছে বটে। সেই হেমবাবুই কাল একখানা কাগজ দেখালেন, তা'তে মিঃ বীরদত্তের কাণ্ড-কারখানাও দেখলুম।

সুনীলা একটু হাসিল, কোন কথা কহিল না। খগেন ফেণিলার পানে চাহিতে চাহিতে বলিল—তা ফেণিলা, এ ত উত্তম করেছ তুমি! এই ত চাই! এ-যুগে যে, 'জাগে না, জাগে না, ভারত-ললনা'—এ অপবাদটা খণ্ডন না হ'লে ত চল্‌ছে না। অতি উত্তম করেছ, চমৎকার হ'য়েছে, পরিপাটি!

ফেণিলা সাড়া দিল না। অত্যধিক জ্বরের প্রাবল্যেই হোক্ আর তন্দ্রাগত বলিয়াই হোক্—এদিকে ফিরিলও না, কথাও কহিল না।

খগেন বলিল—সু, বিছানায় শোয়াতে না পারলে ত হ'বে না। এত জ্বরের ওপর এই কাঠে কম্বল বিছিয়ে শোয়া, এ-যে কৃচ্ছ্র সাধনের বাবা।

সুনীলা বিষণ্ণ করুণকণ্ঠে কহিল—আমি কি করব খগেন বাবু? আপনার কথাই রাখ্‌লে না, তা আমার?

খগেন বিস্ময়ে মুখ তুলিয়া চাহিল, ঠিক বুঝিতে পারিল না, সুনীলার কথার অর্থ কি? বলিল—তা এস, দু'জনেই দেখি চেষ্টা করে।

সুনীলা পূর্ব্বাপর সমস্ত ভাবিয়া লইয়া কহিল—আপনিই দেখুন, আমি পারব না। আমি বরঞ্চ বাবাকে একখানা টেলিগ্রাম করে দিই। নৈলে কি-যে হ'বে, কি যে করব, আমি ত কিছুই ভেবে পাচ্ছি নে।

খগেন বলিল—না, ভাবনার বিশেষ কারণ নেই।

কি জানি, খগেন বাবু! যদিই তেমন বাড়াবাড়ি হয়, তখন একেলা আমি কি করব বলুন? বলিয়া সে ভয়ার্ত্ত মুখখানি নমিত করিয়া লইল।

খগেন বলিল—আমি আছি, সু।

সুনীলা কথা কহিল না কিন্তু এই লোকটির অভয় বাণীতে সে-যে

বুকের মধ্যে অনেকখানি সাহস ও আশ্বাস পাইয়াছে তাহা কেবলমাত্র তাহার চোখ দু'টিতেই প্রকাশ পাইল।

আপনি একটু বসুন, খগেন বাবু, আপনাকে আমি চা করে দিই। বলিয়া সে নামিয়া গেল। খগেন শয্যাটির পার্শ্বে বসিয়া আস্তে আস্তে ফেণিলার হাত দু'টি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল।

ফেণিলা জাগিয়াই ছিল, চক্ষু মেলিয়া বলিল—আপনি আবার এলেন যে খগেন বাবু?

খগেন বলিল—এ সর্ব্বনাশ আমার কে করেছে বল ত, নীলা? তুমি নও, সুনীলাও নয়; সুশীলা, বোধ করি তিনিও নন্,—তবে এ কার কাজ?

ফেণিলা আরক্ত চক্ষুতে চাহিয়া বলিল, কি?

খগেন একমুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া কহিল, জ্যাঠাম'শায় আমাকে আসতে বারণ করে দিয়েছেন, তুমি জান-না নীলা?

জানি। সেই জন্যেই আপনি আসেন নি?

নীলা, কার কাজ এ বল্‌তে পার?

তা জানি না, বাবাই ত লিখেছেন।

খগেন চুপ করিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে অত্যন্ত দুঃখপূর্ণস্বরে কহিল—তিনি লিখ্‌লেও এ কাজ কার, তাই ভাবছি আমি।

ফেণিলা উত্তেজিত হইয়া বলিল—কার কাজ, আপনি জানেন না, খগেন বাবু? জেনে শুনে বোকা হ'ন্ কেন?

খগেন বলিল—তা জানি, নীলা। কিন্তু তুমি—তুমি কেন তা নীরবে সহ্য করলে নীলা?

নীলা মুখ ফিরাইয়া বলিল—আমি কি করব? আমার কথা বলবার পথ কি আপনি রেখেছিলেন যে, আমি বল্‌ব কথা! তবুও……

খগেনের ধৈর্য্য রহিল না, সে প্রদীপ্তনেত্রে কহিল—তুমি কেন সত্য কথাই বল্লে না নীলা, আমি যে কারণে এসেছিলুম? তাহ'লে কোন গোলই ত থাকৃত না।

বল্লেও সে কথা কে বিশ্বাস করত বলুন? বাড়ীতে এত লোক থাকৃতে, বাবা থাকৃতে—আপনি কি-না এলেন……

তখন ত জ্যাঠাম'শায় একা ছিলেন না, নীলা।

এ সমস্তই ফেণিলা জানিত, কিন্তু তাহার চিত্তের সমস্ত বিরোধগুলিকে একে একে মুক্ত করিয়া দিতে সে কোনমতেই নিবৃত্ত হইতে পারিল না। সে একটু চুপ করিতেই খগেন পুনরায় বলিল—আমি ত সেই জন্যেই আজ এসেছিলুম নীলা, জ্যাঠাম'শায়কে সব কথা ব'লে তাঁর ক্ষমা চাইব! যে-ই এ অনিষ্ট করুক, আমি তাঁর কাছে সব স্বীকার করলে, তিনি যে আমাকে মার্জ্জনা করবেন, সে-বিষয়ে সন্দেহ থাকৃলে আমি কখনই আসতুম না।

তা করবেন—বলিয়া ফেণিলা অন্যদিকে চাহিয়া শুইয়া রহিল।

খগেন বলিল—আমি আশ্চর্য্য হই এই ভেবে নীলা যে, আমার অনিষ্ট করে তাঁর লাভই বা কি সুখই বা কি! আমি ত এই নগণ্য প্রাণী……

সুনীলা ডাকিল—একবার উঠে আসুন. খগেন বাবু!

চা খাইতে খাইতে খগেন বলিল—কিছু ভয় নেই সু। ও-জ্বর দু'দিনেই সেরে যাবে। তুমি ভেবো না, আমি দু'বেলা এসে দেখে যাব।

নিদর্শন

সুনীলা জিজ্ঞাসিল—আপনার আফিস আছে ত?

খগেন বিষণ্ণমুখে কহিল—না। আফিস থেকে কিছুদিনের ছুটী নিয়েছি।

হঠাৎ?

খগেন কথা কহিল না। চা-টুকু নিঃশেষ করিয়া কহিল—সু, আমি জলের জুয়ায় সর্ব্বস্ব হেরে, মদ খেয়ে, বাসায় ঢুকি নি।

সুনীলা কথা কহিল না দেখিয়া, সে পুনশ্চ কহিল—আমার কাছে তার প্রমাণ আছে, দেখ্‌বে?

না—থাক্—বলিয়া সুনীলা দাঁড়াইয়া উঠিল।

খগেনও সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়াইয়া উঠিয়া অনুনয়পূর্ণস্বরে বলিল—দেখ্‌বে না সু?

কি হবে দেখে;—বলিয়া সে ফেণিলার ঘরের দিকে চলিয়া গেল। খগেন কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, সিঁড়ির দিকেই যাইতেছিল, ফেণিলার আহ্বানে চকিতে ফিরিয়া দাঁড়াইল। ফেণিলা বলিতেছিল—আপনার ত আফিস নেই খগেন বাবু, তবে এত তাড়া কিসের?

এক মুহূর্ত্তের জন্য ভাবিয়া লইয়া, উদ্বেল চিত্তকে সংযত করিয়া, সে ফেণিলার কাছে আসিয়া বসিল। ঠিক তখনই সুনীলা অন্য একটা দরজা খুলিয়া চলিয়া গেল।

ফেণিলা বলিল—আপনার টাকার দরকার মিটে গেছে ত. খগেন বাবু?

খগেন বলিল—না।

কেন, আমরা ত পাঠিয়েছিলুম আপনাকে, টাকা পান্ নি?

পেয়েছি।

তবে ?

খগেন কথা কহিল না। ফেণিলা ফের ঐ কথাটা পুনরাবৃত্তি করিবে, খগেন বলিল, এই যে সেই চেক্‌টা।

পকেটের ভিতর হইতে একখানি খাম তুলিয়া, সে চেক্‌খানি বাহির করিয়া ফেণিলার সামনে ধরিয়া বলিল—এটা আমি ফেরৎ দিয়েই যাব।

ফেণিলা বলিল—টাকার আর দরকার নেই ?

খগেন বলিল—আর দশদিনের ভেতর চোদ-দো শ', পণেরো শ' টাকার জোগাড় না হ'লে আমার বোধ করি আত্মহত্যা করতেও হ'বে।

কেন, কাবলীর কাছে ধার নিয়েছেন, বুঝি ?

না।

তবে ?

সে শুনে আর কি হ'বে নীলা ?

ফেণিলা বলিল—শুনে কি কিছুই হ'বে না খগেন বাবু ?

খগেন করুণকণ্ঠে কহিল—বিশ্বাসই যদি না হ'বে, কাজ কি নীলা ? আমি মদ খাই, আমি দুশ্চরিত্র......

কে বলেছে ?

যে-ই বলুক,—কথাটা ত আর মিথ্যে নয় !

মিথ্যে নয় বুঝি ?

ফেণিলা কি একটা উত্তর দিতে উদ্যত হইয়াছিল, সুনীলা ঘরে ঢুকিয়া কহিল—কেন এত বক্‌ছিস্ নীলা। কাল রাত্রে ভেবে ভেবে এই করেছ, আজ কি আবার একটা কাণ্ড করে তবে ছাড়বে! আর

আপনাকেও বলি, রোগা মানুষকে কোথায় একটু বিশ্রাম করতে দেবেন, তা—না……

খগেন দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—রোগা মানুষ মুখ বুজে পড়ে থাক্‌লেই বেশী কষ্ট পায়। কথাবার্ত্তায় বরং অন্যমনস্ক হ'য়ে থাকে ভাল। রোগী আমার অনেক দেখা আছে,—মেসের বাসায় আমিই সকলের ব্রাউন, হোয়াইট, আমিই তা'দের সিক্‌-নার্স।

সুনীলা হাসিয়া উঠিল, বলিল—হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে—আপনি যে ক্যাম্বেল স্কুলে দিনকতক একাউণ্টেণ্টের এপ্রেন্টিসি করেছিলেন। সে'টা আমার ভুল হ'য়ে গেছল। তা, ভালই হ'য়েছে, আপনি আসাতে—ডাক্তার আর ডাকতে হ'বে না, কি বলেন?

খগেন মুখখানা কালো করিয়া বসিয়া রহিল। ফেণিলা ব্যথিতস্বরে কহিল—আমার পক্ষে উনিই বড় ডাক্তার, মেঝ্‌! অন্য ডাক্তারের আমার দরকার নেই।

তা ত থাক্‌বেই না। বেশ, বেশ। তা ডাক্তার সাহেব কি রকম বুঝছেন, বাবাকে খবর দেব কি?

খগেন কথা কহিল না, মুখও তুলিল না। ফেণিলা ইহাতে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল—দরকার হ'লে উনি বল্‌বেন।

আচ্ছা, বলিয়া সুনীলা চলিয়া গেল। খগেন—একমিনিট, নীলা—বলিয়া মধ্য পথে তাহাকে ধরিয়া বলিল—সু, আমি এসে কি এতই অন্যায় করেছি?

কে বল্লে তা?

তুমিই।

আমি-ই। দোহাই আপনার, খগেন বাবু, আমাকে আর জড়াবেন না ওর মধ্যে। আমি কিছু বলি নি, বল্‌তে চাই-ও নি।

তা না বল্‌তে চাও—আমি যেতে পারি?

সুনীলা উত্তর দিল না। খগেন তাহার মুখের উপর স্থির দৃষ্টি রাখিয়া বলিল—এর উত্তর ত দিতে পার?

সে আপনার ইচ্ছা।

খগেন পকেট-টা হাঁতড়াইয়া কতকগুলা কাগজ বাহির করিয়া বলিল—এইগুলো রেখে দাও, সময়মত,—ইচ্ছে হয় দেখো।

সুনীলা হাত বাড়াইল না, একবার চাহিয়া দেখিল মাত্র।

খগেন বলিল—এরই ভেতর তোমার দেওয়া চেক্‌খানা রইল—সে কোটের বোতাম ক'টা খুলিয়া বুকের কাছ হইতে নীল রঙের চেক্‌খানা বাহির করিয়া অন্য কাগজের সঙ্গে সুনীলার সামনে ধরিয়া বলিল—নাও।

সুনীলা বলিল—দিন্।—সে শুধু চেক্‌খানাই লইল, অন্য কাগজপত্র ঝর্ ঝর্ শব্দে মাটিতে পড়িয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গেই খগেনের পাংশু মুখ চোখ একেবারে কালীবর্ণ ধারণ করিল। খগেন ব্যথিত হাতখান আস্তে আস্তে বাড়াইয়া সেইগুলি তুলিয়া লইয়া বলিল—আমাকে ক্ষমা করো, সু—বলিয়া সে ফেণিলার ঘরের দিকে চলিতে আরম্ভ করিতেই, সুনীলা অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল—যেগুলো আমাকে দিতে আসছেন, এতদিন কি হ'য়েছিল আপনার? বাবাকে দেখাতে পারেন নি এসে? দেখি?—বলিয়া সে একরকম জোর করিয়াই, যা কিছু খগেনের হাতে ছিল—সব টানিয়া টুনিয়া লইয়া বলিল—এর মধ্যে আছে কি? সাক্ষী সাবুদ! কিসের? মাতাল অপবাদের?

খগেন কথা কহিল না।

সুনীলা পুনরায় বলিল—আমি পাঠিয়ে দিই বাবাকে এগুলো ?

খগেন বলিল—তাঁর চিঠিখানাও আছে ওর ভেতরে, সেখানা পাঠিয়ে দরকার নেই।

সেখানাও আছে ?—কৈ ?—বলিয়া সেগুলা খুলিয়া খুলিয়া দেখিতে লাগিল। ইত্যবসরে খগেন ফেণিলার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া বলিল—আমি যাচ্ছি নীলা !

ফেণিলা বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া বলিল—আমি আর কি বলব খগেনবাবু ? আমার কথা থাকবেই বা কেন ?—বলিতে বলিতে সে-যে কাঁদিয়া ফেলিয়াছে, তাহার মুখ না দেখিতে পাইলেও খগেনের জানিতে বাকী রহিল না। সে-কি করিত, ঠিক বলা যায় না, তবে সেই সময়েই সুনীলা ঘরের মধ্যে পা দিয়া কহিল—কথা কেন থাকবে না নীলা ? খুব থাকবে ! থাকুন-না খগেনবাবু !—খগেনের দিকে ফিরিয়া—এই নিন্, এ সবে আমার দরকার নেই।—বলিয়া কাগজগুলা তাহার সামনে ছুড়িয়া ফেলিতে, খগেন বলিল—ওটা কার লেখা জান ? তোমাদের সিঙ্গী সাহেবের ! এর আগে একদিন "নভোমণ্ডলে" যা বেরিয়েছিল, তা'ও তাঁরই লেখা। 'ছাপাখানার ভূত' সাক্ষী আছেন—আমাদের হরি···

কৈ—দেখি-না, খগেনবাবু—বলিয়া ফেণিলা হাত বাড়াইয়া সেগুলা টানিয়া লইল। প্রথমেই পিতার পত্রখানি তাহার চোখে পড়িল। এবং আধখানা পড়িয়াই তাহার মুখখানা রক্তবর্ণ ধারণ করিল, চোখ দু'টি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। যখন সে পাঠ শেষ করিয়া শিথিল হাতটি সশব্দে শয্যার উপরে নিক্ষেপ করিল, তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে।

মুহূর্ত্তের মধ্যেই তাহার মুখখানি পাণ্ডুর হইয়া গেল। সুনীলা তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া খাটের এ-পাশে ঘুরিয়া আসিতেছিল—আসিয়া দেখিল, সে দু'হাতে কণ্ঠনলীটা চাপিয়া ধরিয়াছে।

সুনীলা আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিতেই, খগেনও চোখ তুলিয়া চাহিল এবং দু'জনে হাত দু'টি ছাড়াইয়া দিতেই ফেণিলা বলিয়া উঠিল—এ'ও তার কাজ! আমাকে অপমান করাই তার উদ্দেশ্য। যেমন করেই হোক্ যা করেই হোক। উঃ কি শয়তান! কি শয়তান! দিদি আর লোক পেলে না দুনিয়ায়! এই হতভাগা, নিন্দুক মিথ্যেবাদী……

সুনীলা তাহাকে শান্ত করিতে তাহার হাত দু'খানি হাতের মধ্যে চাপিয়া স্নেহস্বরে কহিল—নীলা! অসম্মানের কথা কইতে নেই, ভাই।

না, কইতে নেই? খুব আছে। আমার নামে যে এ সব কথা বল্‌তে পারে, তার মত, তার মত—সে-যেন তিক্ত কটু বাক্য সঞ্চয় করিয়া ফিরিতেছিল, বিষম ক্রোধে—সহজ কথাই মানুষ ভুলিয়া বসিয়া থাকে, সে'ও তিন চার সেকণ্ড মধ্যে একটা কথাও খুঁজিয়া পাইল না।

সুনীলা বলিল—সিংহ-ই যে বলেছেন তার নিশ্চয়তা নেই নীলা। আগে থাক্‌তেই তাঁকে অমন করে' বলা তোমার উচিৎ নয়। আমার মনে হয়, বাবা নিজেই লিখেছেন, কারু যুক্তিপরামর্শ না নিয়েই!

তোমার মনে হয়! বাবা নিজের থেকে লিখেছেন? বাবা এই সব করতে গেছেন? এত নীচ, এত ছোট তিনি নন্। আর—আপনি! আপনি এ চিঠি পেয়েও এলেন না বাবার কাছে—খুব বাহক লোক আপনি! যদি আস্‌তেন বাবা থাক্‌তে, দেখতুম কত বড়… ..পাছে

সংযম হারাইয়া নীলা যা-তা একটা কিছু বলিয়া বসে, সুনীলা তাহার মাঝখানটিতেই বলিয়া উঠিল—এতদিন আসেন নি কেন?

এতক্ষণে খগেন সহজস্বরে কহিল—সাহস হয় নাই।

ফেণিলা বলিল—সিংহের ভয়ে বিবরে ঢুকেছিলেন?—তাহার আরক্ত মুখের পানে চাহিয়া খগেনের বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না। সে-যে জানিয়া শুনিয়া কোন অপরাধই করে নাই এবং ঈশ্বর জানেন, যে-অনিষ্ট আশঙ্কায় ফেণিলা একেবারে দুর্ব্বার হইয়া উঠিয়াছে, তাহা ঘুণাক্ষরেও তাহার জানা ছিল না. তবুও সে কথা কহিতে পারিতেছিল না।

ফেণিলা মাথাটা তুলিয়া, প্রদীপ্ত নেত্রে চাহিয়া, ততোধিক দৃপ্তস্বরে কহিল—এই অপমানের বোঝা আপনিই আমার ঘাড়ে তুলে দিলেন, খগেনবাবু!—বলিতে বলিতে তাহার স্বর বদ্ধ হইয়া আসিল এবং চোখের পাতা ঝরিয়া ক'ফোঁটা জল তাহার শুষ্ক সাদা মুখখানায় গড়াইয়া পড়িল। খগেন তবুও নির্ব্বাক। সুনীলা বলিল—উনি বোধ করি চুপ করে' থেকেই একটু আরাম পেয়েছিলেন!

আরাম পেয়েছিলুম আমি! কখন না! কেন তুমি বার বার এমন করে বলছ সুনীলা! তোমাদের কষ্ট দিয়ে সুখ হবে আমার! তোমাদের সঙ্গে একদিনের সম্পর্ক আমার!

সুনীলা বলিতেছিল—তবে······

খগেন না থামিয়া কহিল—আর কোন্ সাহসে ঢুক্‌ব আমি বাড়ীর ভেতর, এর পরেও? আমি ত আর জানতুম না, যে সিংহ চলে গেছেন! আমার ইচ্ছা ছিল, এ'টা যখন মিথ্যা, তখন একদিন প্রকাশ করলেই চল্‌বে, না হয় আপনা থেকেই তা প্রকাশ পাবে।······আজও আমি

আসতুম না, নীলা! কি-জানি আমার কেমন একটা ভয় হ'য়েছিল, জ্যাঠাম'শায়ের মত দেবচরিত্র মানুষের কাছেও আমার দারিদ্র অপরাধ ধরা পড়ে গেছে এবং সে অপরাধের শাস্তি আর যাই হোক্, মার্জ্জনা নয়। এই ভয়ই আমার ছিল, এবং আজও আমি আসতুম না—যদি না আমাকে সত্বর কলকাতা ত্যাগ করতে হ'ত। তাই আজ তাঁর মার্জ্জনা নিয়ে, তোমাদের সকলের কাছেও মাফ্ চেয়ে, আমি জন্মের মত বিদায় নিতে এসেছিলুম। নীলা, তোমার প্রতি আমি অন্যায় করেছি, তুমি আমাকে মাফ্ কর।—বলিতে বলিতে সে বিহ্বলের মত ফেণিলার হাত দু'টি নিজ করতলে চাপিয়া ধরিল।

ফেণিলা খগেনের হাতটা টানিয়া বলিল - কিন্তু আপনাকে আমি ছাড়চি নে খগেনবাবু—এগুলো বাবাকে দেখাতেই হ'বে।

তোমরা দেখিয়ো, নীলা—বলিয়া খগেন তাহার হাতটি মুক্ত করিয়া লইল।

আপনি কোথায় যাবেন, খগেনবাবু?

যেন একটা মস্ত কাজ মনে পড়িয়া গেছে, এমনি সসব্যস্তে দাঁড়াইয়া উঠিয়া, খগেন বলিল—চল্লুম নীলা!

ফেণিলা কহিল—কোথা যাবেন?

দেখি—বলিয়া সে হাত দু'টী কপালে ঠেকাইয়া বলিল—তোমাদের দু'জনের কাছেই আমি মাফ্ চাচ্ছি,......সু কৈ?

কখন্ যে সুনীলা বাহির হইয়া গেছে, কেহই জানিতে পারে নাই। তাহাকে না দেখিয়া খগেনের চিত্ত বিকল হইয়া গেল। বিদায় নীলা! সু-কেও বলো—বলিয়া সে সিঁড়িতে নামিয়া গেল।

নিদর্শন

শেষ ধাপটিতে পা দিয়াছে, কোথা হইতে ঝড়ের মত আসিয়া সুনীলা সিঁড়িতে বসিয়া পড়িয়া বলিল—আমার এ বিপদের সময় আপনি আমাকে ত্যাগ করবেন না খগেনবাবু!

সে অস্বীকার করিতেই কি একটা বলিবার উপক্রম করিতেছিল, সুনীলা তৎপূর্ব্বেই একেবারে কাতরস্বরে বলিয়া উঠিল—অসময়েই ত বন্ধুর দরকার, খগেনবাবু! এ'টা কি আপনাকে মনে করিয়ে দিতে হ'বে আমার!

খগেন বলিল—কিন্তু সু তোমার যে,······

আপনি উপরে চলুন আগে। এখানে চাকর-বাকর সব আনাগোণা করে থাকে।······চলুন আপনি, দু'মিনিটে আমি আস্‌চি। আর দেখুন, আমি যদি খানকতক লুচি ভেজে দিই, একটু তরকারী করে দিই, খাবেন না?

আমি মেসে গিয়েই খাবখ'ন।

কেন খগেনবাবু? আমি কি একেবারেই অস্পৃশ্য?

না, না,—সু—বলিয়া খগেন কথাটা শেষ করিবার জন্য ইতঃস্তত করিতে লাগিল।

তবে ওপরে চলুন, আমি আসচি।—সে রান্নাঘরে কি একটা কাজে চলিয়া গেল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

অন্তর দাহ।

স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়াই হৌক আর কাজে-কর্ম্মে নিযুক্ত থাকা-হেতুই হৌক, রাঁচীতে সুশীলা বেশ থাকিত। কিন্তু এবার আসিয়া কিছুতেই মন বসিতেছিল না। অথচ তাহার কোন কারণ সে নিজেও খুঁজিতে সারা হইল। পিতার অবর্ত্তমানে সে বাড়ী হইতে চলিয়া আসিয়াছে বলিয়া নয়, কারণ সে জানিত, পিতা তাহাদের স্বাধীনতায় কখনই হস্তক্ষেপ করেন না এবং রাঁচী এই সে প্রথম আসিল না। সব সত্য, তবুও মনটি তাহার কেন যে স্বস্তি পাইতেছিল না—কে জানে!

এবারে সিংহ সাহেব-ও কেন-যে ডুমুরের ফুলটি হইয়া উঠিলেন, তাই বা কে জানে! আগে স্কুলে নিত্য নিয়মিত আসা ত ছিলই, তা' ছাড়া সুশীলার বাসায়,—সেখানে দুইটি বড় বড় কুমারী মেয়ে সুশীলার তত্ত্বাবধানেই থাকিত,—রোজ প্রাতে ও সন্ধ্যায় দর্শন দিতেনই। মেয়ে দু'টির গান-শোনা, সুশীলার সঙ্গে গল্পগুজব করা তাঁহার দৈনন্দিন কর্ম্মের মধ্যেই ছিল। এবারে স্কুলে, তা'ও ক'দিন আসেন নাই, বাসায় ত কথাই নাই। তিন চারদিন উপর্য্যুপরি তাঁহার সাক্ষাৎ না পাওয়ায় সুশীলা বাস্তবিক চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিল। সিংহসাহেবের একটা চাকর রোজই বাগানের ফুল দিতে আসিত, সে আসিয়াছে ও গেছে, সুশীলা তাহাকে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিতে পারে নাই। সে যখন আসিত, প্রায়ই সে'টা ক্লাসের সময়, তা'ও বটে, আর এই কৌতুহল দমন করিবার ইচ্ছাতেই

সুশীলা কোন কথা জিজ্ঞাসা করে নাই। আগে হইলে কৌতূহল ই বল বা আগ্রহ ব্যাকুলতাই বল, দমন করিবার কোনই প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু এখন তাহার একটু কারণ ঘটিয়াছে! ঘটিয়াছে বৈ-কি।

এখন, হাওড়া ষ্টেশনে আসিবার দিন, রেলের হুঁসিয়ার কর্ম্মচারীরা একখানা ফাষ্টক্লাসে দু'টি বার্থ দেয়, নাম লেখে মিঃ জি সিংহ ও মিসেস্ সুশীলা সিংহ। অবশ্য খুব হাঁক ডাক করিয়া, মহাসমারোহ সহকারে নাম-ফলক পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, কিন্তু সিংহের একটি কথাতে সুশীলার মাথার চুল হইতে পায়ের নখ অবধি কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। সিংহ কি উদ্দেশ্যে বলিয়াছিলেন, কে-জানে, কথাটা সুশীলার তখন আদৌ মনঃপূত হয় নাই। না হোক, এখন কিন্তু সেই কথাটাই ফেণাইয়া ফেণাইয়া আস্তে আস্তে মনের পাতাটি ভরিয়া সারা বুকের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছে। কথাটা অবশ্য এমন কিছুই না, তবুও তাহার মধ্যে যে খানিকটা নারী হৃদয়ের বুভুক্ষা আর তার চিরদিনের বেদনাপূর্ণ কামনা মিশিয়াছিল তা' সুশীলা এখন বুঝিয়াছে। কথাটা অত্যন্ত ক্ষুদ্র, কিন্তু তার সেই স্বল্প ক'টি অক্ষরের মধ্যেই এমন অমৃতময় পানীয় লুকান ছিল, যাহা এখন সুশীলার সুপেয় হইয়া উঠিয়াছে—ইহা বুঝিতে পারিয়াই সে অদম্য কৌতুহলও দমন করিয়াছে।

কথাটা অতি সামান্য কিন্তু অনেক সামান্যের মত সুশীলার স্মৃতির সমস্ত পথটাই অসামান্য হইয়াছিল। ষ্টেশনে, গাড়ীতে উঠিবার আগে, অশুদ্ধ নাম-ফলক সংশোধিত হইয়া গেল, মিঃ সিংহ টিকিট কালেক্টারকে দু'টি টাকা বখশিশ দিয়া বিদায় করিয়া কহিয়াছিলেন—লোকটা কি রকম ভ্যাবাচ্যাকা হয়ে গেছে, দেখ্‌লে সুশীলা? মানে, ভুল করে টাকা

বত্রিশ কারু বরাতেই বোধ করি হয়-না—ওর ভাগ্যে এই প্রথম, তাই অমন করে' চাইতে চাইতে গেল।

সুশীলা নিরুত্তর ছিল। সিংহ অন্যমনস্কের মত কহিলেন—আমাদের অদৃষ্টে ভুলটা যদি অমনি পুরস্কৃত হ'ত!

এই মাত্র! কথাটা শুনিয়া সুশীলার বক্ষ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, সিংহ প্ল্যাটফর্ম্মে জনতার দিকে চাহিয়া বলিলেন—এমনই লাইন, মেয়েদের একটা সেপারেট কম্পার্টমেণ্ট অবধি নেই! তোমার বোধ করি খুবই কষ্ট হ'বে, না সুশীলা?

না, কষ্ট আর কি। ট্রেণের জারনির কষ্ট, সে এ'তেও যা, তা'তেও তাই। আমার ঘুম হয় না।

আমারও যে তাই।

তবে ত ভালোই হ'য়েছে।

সুশীলা উপরের একটা বাঙ্কের দিকে চাহিয়া বলিল—এখানেও কেউ আস্‌বে বোধ করি।—অন্য বাঙ্কটায় তাহাদেরই ছোট খাট দু'একটা জিনিষ রাখা ছিল।

সিংহ বলিয়াছিলেন—না সুশীলা, আর কেউ আস্‌বে না। সমস্ত কম্পার্টমেণ্টটাই আমরা রিজার্ভ করিয়েছি। তোমার আপত্য আছে সুশীলা?

না, আপত্য আর কি?—বলিয়া সুশীলা চলন্ত ট্রেণখানির বাহিরে মুখ রাখিয়া 'ছুটন্ত' সিগন্যাল-ল্যাম্পগুলির পানেই চাহিয়া রহিল।

অনেক রাত্রে সিংহ বলিলেন—তুমি শোও সুশীলা। নাই-বা এল

ঘুম, শুলে তবু শরীরটা তত ক্লান্ত হ'বে না। আর আমাকে তুমি বিশ্বাস করতে পার, সুশীলা।

সুশীলা শুইয়াছিল এবং সে-যে তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়াছে, তাহারই প্রমাণ স্বরূপ তাঁহাকেও শুইতে বলিয়াছিল।

এখন সুশীলার মনে সেই বিশ্বাস করার কথাটাই উত্তেজক মধুর প্রভাব বিস্তার করিতে সুরু করিয়াছিল। হ্যাঁ, এ বিশ্বাস তাহার আপনা হইতেই কেমনে জন্মিয়াছিল যে, ইঁহাকে বিশ্বাস করিয়া কোনদিনই সে ঠকিবে না। কিন্তু ক'দিনের অদর্শনেই সে-যেন তাহার সেই গাঢ় বিশ্বাসও (গাঢ় বলিয়াই সে জানিত) হারাইতে বসিয়াছিল। সুশীলার মনে আছে, সে রাত্রে গাড়ীতে যত কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, সবই তাহাদের সেই অনাথ বিদ্যালয়টির সম্বন্ধে! কিন্তু তাহারই মধ্যে পরস্পর নির্ভরতা, পরস্পর বিশ্বাস এতই পরিস্ফুট হইয়া পড়িয়াছিল, যাহা বোধ করি বক্তারা নিজেই তৎপূর্ব্বে জানিত না। সিংহ যে একমাত্র তাহারই মুখ চাহিয়া সকল কর্ম্মে লিপ্ত হইয়াছেন, বোধ করি বিশ ত্রিশ বার সে কথাটা বলিয়া ফেলিয়াছিলেন। ইহাও সুশীলা বিস্মৃত হয় নাই যে সে নিজে কেবল কোমল দৃষ্টি সাহায্যেই তাঁহার সকল আশা ভরসার লতামূলে জলসেক করিয়াছিল।

সিংহ বলিয়াছিলেন—শুধু যদি তোমাকেই পাই সুশীলা ঐ বালিকা আশ্রমই একদিন ভারতবর্ষের একমাত্র নারী আশ্রম করে তুলতে পারব। যা ভারতবর্ষে, অন্ততঃ বাঙ্গালী মেয়েদের জন্যে কোথাও কেউ করে নি। এ কি কম দুঃখের কথা সুশীলা, যে এতবড় দেশটায় আমাদের মেয়েদের মাথা গোঁজবার এতটুকু স্থান কেউ করে নি; সে চেষ্টাও কারু নেই—

আশ্চর্য্য! আমি করব সুশীলা, আমি করব, তবে যদি কেবলমাত্র তোমাকেই পাই আমি! তখন বাঙ্গালী মেয়ে, এই আশ্রয় লাভ করে' তোমারই কীর্ত্তি গাইবে সুশীলা! বাঙ্গালা দেশে যে একমাত্র তোমারই দ্বারা এতবড় একটা অভাব মোচন হ'য়েচে—এ বোধ করি বাংলার ইতিহাসেও সোনার অক্ষরে ছাপা হ'বে।

সুশীলাও উত্তেজিত হইয়া বলিল—আমরা একবার বোম্বাই গিয়েছিলুম, মিঃ সিংহ। সেখানে—একটা আধটা নয়, কম করে' দশ এগারোটি এমনি আশ্রম আছে, যেখানে অনাথা, অসহায়া, সম্বলহীনা রমণীরা অনায়াসে বাস করে.' শিল্প কার্য্য করে, আরও ছোট বড় কত কাজ করবার সুযোগ পায়! এ অভাগা দেশের মত নয়।

মিঃ সিংহ পুলকিত স্বরে বলিলেন—আর অভাগা বলো না সুশীলা! জেগেছে, জেগেছে, আমাদের দেশের লোকও জেগেছে। আর জানই ত, এ-দেশ একবার জাগলে সকল-দেশকে ছাড়িয়ে উঠ্‌বে।

এই ত গেল ট্রেণের কথা। রাঁচীতে আসিয়া সিংহ প্রথমে সুশীলার বাসাতেই হাঁপ ছাড়িলেন। সুশীলা আসিয়াছেন সংবাদ পাইয়া মেয়েরা সব ছুটিয়া আসিল। সুশীলা তাহাদের আদর যত্ন করিয়া তখনকার মত বিদায় দিল। মেয়েরা চলিয়া যাইতেই সিংহ বলিলেন—দেখ্‌লে সুশীলা, তুমি এসেছ খবরটি কাণে যেতেই ওরা সব ছুটে এসেছে। ওরা তোমায় এত ভালোবাসে, সুশীলা!

সুশীলা হাসিয়া বলিল—তাই দেখ্‌ছি।

তাহার মুখের মৃদু হাসিটুকু কখন্ ভাসিয়া কখন্ অধর কোণে লুকাইয়া গিয়াছিল, কিন্তু দর্শকটি যেন অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কেবল সেই

হাসিটাই দেখিতে দেখিতে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুশীলা লজ্জারক্ত মুখখানা ফিরাইতেই সিংহ বলিয়া উঠিলেন—তুমি এদেরই ত্যাগ করতে চেয়েছিলে সুশীলা ?

সুশীলা বলিল—আমি ত্যাগ করতে চাই নি এদের। এত ভালোবাসা পেয়ে এদের ছেড়ে আমি মরতেও চাই নে।

শ্রোতাটি পরম পরিতৃপ্তির সহিত কথাগুলি গ্রাস করিয়া করুণকণ্ঠে কহিলেন, ঠিক বলেছ সুশীলা ! ভালোবাসা যে পায়, মরতেও সে বোধ করি চায় না। বোধ হয় তুমি ঠিক কথাই বলেছ। বোধ হয় কেন—তাই, তাই ঠিক ! ঠিক সুশীলা, খুব ঠিক ! ভালোবাস্‌লে মরতেও চায় না, ভালোবাসা পেলেও তাই—না ?

বারবার কথাটা পুনরাবৃত্তি করাতে সুশীলা বিস্মিতই হইয়াছিল ; কিন্তু যেন 'হয় নাই'—এমনি ভাবে বলিল—আমার ত তাই মনে হয়।

তোমার ঠিকই মনে হয় সুশীলা—তা'তে কোন ভুলই নেই। আমি ত জানি না, কোনদিন পাই-ও নি কখনও, কারু কাছে, তবু মনে হয়—এই ঠিক। তুমি যা বলেছ, তাই ঠিক।—এই কথা কয়টি বলিতে বলিতে সিংহের গলার মধ্যে যেন খানিকটা অশ্রু আর খানিকটা বাষ্প জমিয়া তাঁহার স্বরটিকে আর্দ্র ও করুণ করিয়া দিল।

সুশীলার মনে হইল—কেন তাঁহার এত দুঃখ ?

এবং ঠিক এই প্রশ্নটি অনুমান করিয়া সিংহ বলিলেন—অভাগার এই দেখেই সুখ, সুশীলা, তা'তেই তার আনন্দ ; তা'তেই তার পরিতৃপ্তি। সে ত নিজে পায় নি কোনদিনই কারু কাছে ! কাজেই তার এই পরের দেখা ছাড়া আর কি উপায় আছে, সুশীলা ?

সুশীলার মুখখানি ম্রিয়মান হইয়া গেল। একবার সিংহের কাতর মুখের পানে চাহিয়াই সে দৃষ্টি নামাইয়া লইল।

সিংহ এবারে, একেবারে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিয়া ফেলিলেন—শুধু এ'দের, এই মেয়েদের কথাই ভেবে নয়, সুশীলা, তোমাকে অনুরোধ করতে এরই অনুরোধ ছিল, সব চেয়ে বেশী—বলিয়া তিনি বুকের উপর হাত রাখিলেন। এক সেকেণ্ড থামিয়া আবার বলিলেন—তুমি যে এই অভাগাকে এতটুকু স্নেহ-ও করেছ, সুশীলা, এতটুকু যত্ন-ও করেছ, আজন্মের পোড়া এই বুকখানা তা'তেই গলে, অমৃতময় হ'য়ে উঠেছে! এ জীবনেতিহাসে রমণীর স্নেহ যাকে বলে, সুশীলা, সে-যে কি এই তার প্রথম আস্বাদ! আমি বলব না সে অমৃত না গরল; আমি বলব না পেয়ে ধন্য হ'য়েছি কি আকাঙ্খা আরো বেড়ে গেছে, শুধু আজকের দিনে তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে' কেবল এইটেই আমি বল্‌তে চাই সুশীলা, এ আবার বলা-না-বলার অতীত!

—বলিয়া সিংহ প্রস্থান করিয়াছিলেন। সুশীলা জানে সে তাঁহাকে ক্ষমাই করিরাছিল। মুখের কথায় নয়, লৌকিকতায় নয়—সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করিয়াছিল, এবং এ ক'দিন যতক্ষণ না চোখের পাতাদু'টি নিদ্রায় ভরিয়াছে, কেবলই অশ্রুর উৎস প্রবাহিত হইয়া গেছে। কেন গেছে, কি সে গেছে—সে জানে না, জানিতে পারে নাই।

বিদায়কালে সিংহ হাতটি বাড়াইয়া তাহাকে অভিনন্দিত করিতে চাহিয়াছিলেন, সুশীলা কেবলমাত্র নয়নের জল গোপন করিতেই না পারিয়াছিল মুখ তুলিতে, না তাঁহার হাতটি লইতে পারিয়াছিল। এখন সে যতই ভাবিতে লাগিল, তাহার মনের সুশীলা তাহাকে বেত্রাঘাত

করিয়া যেন শনৈঃ শনৈঃ কহিল যে, সিংহ তাহার সেই দৌর্ব্বল্যটুকুকেই অবহেলা বা অভিমান জ্ঞান করিয়া, এই পথ ত্যাগ করিয়াছেন। বাহিরের সুশীলা বলিল—না, না, অন্য কারণই হওয়া সম্ভব। তিনি রাগ করিবার লোক ত নহেন। মনের সুশীলা বলিল—যে দুঃখী তাহার অভিমানই যে সবার চেয়ে প্রবল। সিংহ ত নিজেই কাঁদিয়া বলিয়াছিলেন—ভালবাসার দুঃখী তিনি! তিনি যে তোমারি কাছে, মহাদেবের মত ভিক্ষাপাত্র হাতে লইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। কৈ, সে রিক্তপাত্র পূর্ণ করিবার কোন চেষ্টাই কি তুমি করিয়াছিলে! পূর্ণ করা দূরে থাক্, তুমি যে হাত-টা উপেক্ষা করিয়াই শূন্য হাতে পথে বাহির করিয়া দিয়াছ! ইহাতে অভিমান হইবে, না ত কি হইবে? বাহিরের সুশীলা বলিতে গেল, অসুখ বিসুখ, সংসারের, বিষয়-আশয়ের কাজ কর্ম্ম আছে ত—মনের সুশীলা ক্রোধান্ধ হইয়া বলিল—তুমি ত বাপু সব জান্তা দেখ্ছি! অত বড় লোক! কত লোকজন, আমলা গোমস্তা, দাওয়ান ম্যানেজার যাঁর, তিনি আবার নিজে কি করিবেন? ও-সব নয় বাপু, আসল কথা এই যে, তিনি বড় দুঃখেই, বুক-ভরা বড় বেদনা বহিয়াই ফিরিয়াছেন! - বিপন্ন ভিক্ষুককে এমন নিরাশ করিয়া যে প্রত্যাখান করিতে পারে—তাহার আবার রমণীত্ব! সে আবার হৃদয়ের গর্ব্ব করে! হারে!

সন্ধ্যারাত্রে বিদ্যালয়ের বালিকাদের আহারাদির তত্ত্বাবধান করিয়া স্বগৃহে ফিরিয়া রোজই সে হার্মোনিয়মটির ঢাকা খুলিয়া বসিয়া পড়িত। সাদা চাবিগুলির উপর দিয়া তাহার আঙুলগুলি পূর্ব্বের মতই চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইল কিন্তু তাহাতে না উঠিল ঝঙ্কার, না উঠিল, মূর্চ্ছনা।

সুশীলা না পারিল তার সঙ্গে গলা মিলাইয়া একা গানও গাহিতে! যত বারই সে গান গাহিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতে যায়, সেই একটা গানই তাহার কণ্ঠে গুঞ্জরিয়া ওঠে! অথচ সে'টিকে শুধু গলার বাহিরে আনিতে নয়, নিজের মনে আনিতেও সে বেদনা পাইত। কত-শত গান ছিল তাহার আয়ত্ত, সে সকলের একটিও তাহার মনে পড়িত না—কেবল সেই নয়নের জলে বিদায় দেওয়ার করুণ কাহিনীটাই তাহার স্মৃতির দ্বারটি ঠেলিয়া গলার মধ্যে জমিয়া উঠিত। কে কবে কাহাকে বিদায় দিয়া, নয়নের জলে বক্ষ ভাসাইয়া এই গান গাহিয়াছিল, কে-জানে, সুশীলার মনে হইল, কবি কেবলমাত্র তাহারই মনের কথা কল্পনার বলে জানিয়া আগে ভাগেই এ'টি গাহিয়া গেছেন। * সে ত জানে, সে কাহাকেও নয়নের জলে বিদায় করেও নাই, কাহারও গলে মালাটি দুলাইবার তরেও সে কোন চেষ্টা করে নাই, তবুও যেন গানটীর ছত্র ক'টি তাহার মনকে বুঝাইতে চাহিল—এমনই হইয়াছে, ওরে মূঢ়, সে নয়নের জলেই বিদায় লইয়াছে! সে আর ফিরিবে না! আর ফিরিবে না।

স্কুলের মেয়েদের কাছে সুশীলা ধরা পড়িতে পড়িতে সে'দিন বড়ই বাঁচিয়া গেছে। এক পড়া বার বার পড়িতে (অন্ততঃ পরিশ্রম হ্রাস-হেতু) অনেক মেয়ে, মেয়েই বা কেন, অনেক ছেলেরই মন্দ লাগে না, কিন্তু সুশীলার ক'টি ছাত্রী বিষম অনুযোগ করিয়া বসিল—রোজই আমরা কাব্য পড়ব, মা? অন্য সব সবজেক্ট যে আমাদের কিচ্ছু হ'চ্চে না! ——উপরি উপরি তাহারা পাঁচদিন একই কবিতা, একই অর্থ, একই

* শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের "বিদায় করেছ যারে নয়নের জলে" ইত্যাদি।

ভাব শুনিয়া জ্বালাতন হইয়া গেছে। শুনিয়া সুশীলার ত চক্ষুঃ স্থির। মেয়েদিগে সে বলিল বটে—এটা বড় শক্ত জিনিষ, সরমা; তাই একটু ভালো করেই তোমাদের বুঝিয়ে দিতে চাই আমি! তা বেশ—কাল থেকে তোমাদের আমি "শুভঙ্করী" পড়াব, কি বল সুহাস?—অঙ্কের নামে সুহাসের জ্বর আসিত, এবং অঙ্কের বহি খুলিলে, সত্য সত্যই অনেকদিনের চাপা পড়া ম্যালেরিয়া গুপ্ করিয়া আত্ম প্রকাশ করিয়া ফেলিত। তবুও "কাব্যে" তাহার অরুচি ধরিয়া গিয়াছিল, কেবল মুখ বদলানোর উদ্দেশ্যেই সুহাসিনী বলিয়া ফেলিল—হ্যাঁ, বড় মা। তাই করো। এবং সেই মুহূর্ত্তেই সে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল যে "শুভঙ্করী" "কাব্যের" মত "ক্রমশঃর" ধারা টানিলে সে কিছুতেই ম্যালেরিয়ার কবল হইতে নিস্তার পাইবে না এবং অন্ততঃ তিনচারদিন বোর্ডিঙে শুইয়া—ব্যস্ দিবা নিদ্রা!

কিন্তু, তাহার ম্যালেরিয়ার আশঙ্কা ঈশ্বরকৃপায় বৃথাই হইল। যেহেতু সুশীলা পরদিন কিছুতেই "শুভঙ্কর" ঠাকুরের হিজিবিজিতে মনঃ সংযোগ করিতে পারিল না। শুভঙ্করের পরিবর্ত্তে প্রভাত মুখুর্য্যের ক'টা বিলিতি গল্পই রস-সহকারে তাহাদের শুনাইয়া দিল। সরমা-ও আপত্তি করিল না, সুহাসিনীও সহাস-আননে উপভোগ করিল; কমলা, বেলা, লবঙ্গ—এরাও সব খুব হাসিল। হাসিল না, কথক নিজে! যেখানে হাসি চাপা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল, সে সময়ে মনের পর্দ্দায় রাজ্যের করুণ সুরগুলি তাহার বেসুরো হইয়া বাজিতে লাগিল।

এই প্রথম সে অনুভব করিল, খগেনের দুঃখ কি? তাহাকে সেই বিদায় করিয়াছিল। কিন্তু সে বেচারার এমন কি অপরাধ—আজ আর সুশীলা তাহা নিরূপণ করিতে পারিল না। সাংসারিক হিসাবে তাহার

যতই অপরাধ হইয়া থাকুক, সে-যে প্রেমিক এবং প্রেমের তাড়নাতেই রান্নাঘরের জানালাতেও আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল—আজ আর সুশীলা ইহার মধ্যে বিষদৃশ কিছুই দেখিল না। আজ সে প্রকৃতই অনুভব করিল, খগেনকে সে অহেতুক লাঞ্ছনা করিয়াছে, নীলাও যে কষ্ট পাইয়াছে, এখনও পাইতেছে—তাহার জন্য সে'ই দায়ী! খগেন নিদারুণ অভিমানী, নীলা উগ্র বটে, অভিমানে সে কারো চেয়ে কম নয়—আর যে কখনও কোনদিন খগেন সে বাড়ীতে পা দিবে, এ ভরসা আদৌ নাই, নীলাও যে মুখ ফুটিয়া নিজের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিবে—তাহাও সম্ভব নহে,—তবেই সেই দুইটি প্রেমোন্নত হৃদয় জন্মের মত শূন্য হইয়া গেল; এই মহাশূন্য আর কি কখনও কোন উপাদানেই পূর্ণ হইবে? এ প্রশ্ন আপনাকেই সে করিল, আপনিই উত্তর দিল,—না, প্রেমের শূন্যতা পূরণ হইবার নহে? প্রেমে যা ভাঙ্গে, কোন প্ল্যাষ্টারই তা'কে জোড়া দিতে পারে না।——ভাবিতে ভাবিতে সুশীলার কান্না পাইতে লাগিল। আলোটি নিবাইয়া, অন্ধকার করিয়া, একা-ঘরে আপন বিছানায় পড়িয়া সুশীলা ভারি কান্নাই কাঁদিল। নিজের দুঃখে, নিজের বেদনায় নহে, স্বার্থপরের কান্নাও নহে, আজ পরের দুঃখে, বিগলিত ধারে কাঁদিয়া সুশীলা উপাধান ভিজাইল, বুকের কাপড়ে মুখ মুছিয়া কাপড় ভিজাইল—কিন্তু চোখের জল গেল না। পরের দুঃখে যে এত অশ্রু ও বহে, ইহার পূর্ব্বে সুশীলার তাহা জানা ছিল না। আজ জানিল, আজই সে কাঁদিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

সুশীলার বন্ধু।

পরদিন সুশীলার যখন ঘুম ভাঙ্গিল, অনেক বেলা হইয়া গেছে। দাসীকে জিজ্ঞাসা করিতে সে বলিল—আর সবাই বিদ্যালয়ে গিয়াছেন। তবুও শয্যাত্যাগ করিতে সুশীলার ইচ্ছা হইতেছিল না। আজ তাহার শরীরটি যেন ভাল নাই, অসুখও বিশেষ কিছু সে টের পাইল না। এই অসুখ এবং না-অসুখ এরই মাঝামাঝি একটা-কিছু তাহার হইয়াছিল, ন' টার আগে সে উঠিবার চেষ্টাও করিল না। খুব দূরে একটা ব্রাহ্মমন্দিরের চূড়ায় ঘং ঘং করিয়া ন'টা বাজিল, সে'ও শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, সিংহ সাহেবের মালী অজস্র ফুল লইয়া এই বাড়ীরই হাতায় প্রবেশ করিতেছে। তাহাকে ডাকিয়া সুশীলা জিজ্ঞাসিল—সাব কাঁহা?

সাব! সাব ত কুঠিতেই আছেন, হুজুর।

সে'ও আর কিছু বলিল না, সুশীলাও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাকে আর একটি প্রশ্নও করিতে পারিল না। সেলাম করিয়া প্রস্থানোদ্যত হইতেই সুশীলা জিজ্ঞাসা করিল—কাঁহা বাহার উহার নেহি গ্যয়া?

নেহি, হুজুর, কুঠিমে, গরীব পরবর।—বেচারা হিন্দী-উড়িয়া মিশ্রিত একটা অজানা ভাষায় জবাব দিয়া, পুনরায় দীর্ঘ সেলাম করিয়া আপন কার্য্যে চলিয়া গেল। বারান্দার এক কোণে একখানা টুলে বসিয়া একটি

মেয়ে বুকের প্রায় কাছে শ্লেটখানা চাপিয়া কি লিখিতেছিল—সুশীলা তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসিল—তোমার নাম-টি কি-গা ?

মেয়েটি একগাল হাসিয়া বলিল—আমি যে পদ্মিনী, বড়-মা !

পদ্মিনী ! তুমি পড় ?

না-গো, আমি যে ছবি নিকি। এই দেখ-না বড়-মা, ঐ মোসটা চরছে ত .....বলিয়া শ্লেটখানা সুশীলার সামনে ধরিয়া কহিল—হয় নি ?

সুশীলা মেয়েটিকে উৎসাহ দিয়া বলিল—বাঃ, বেশ হয়েছে, পদ্মিনী। কিন্তু মোসের রঙ ত সাদা নয়, পেন্সিল ঘষে তুমি ওর রঙটি যে সাদা করে' ফেলেছ ।

তাই ত গো ! আচ্ছা, ও গা-টায় আর রঙ দেব না, ও শ্লেটের রঙই থাক্। কি-বল বড় মা, হবে না ?

হবে। ..পদ্মিনী তুমি সুহাসকে চেন ?

চিনি বৈ-কি ! তার সঙ্গে যে আমি আতর পাতিয়েছি। ও আতর, আতর, তোরে দেব রাঙা বর—বলিয়া মেয়েটি হাসিতে লাগিল।

সুশীলা বলিল—তোমার আতরকে বলে এস পদ্মিনী, যে, বড় মা বল্লে, তারা সব স্নান টান করে' যেন আসে, তখনই আমি পড়াব। এখনি যাও।

এই যাই—বলিয়া পদ্মিনী শ্লেটখানা নিকটস্থ একটা জানালার উপর খাড়া করিয়া পেন্সিলটি সেই ফাঁকে গুঁজিয়া "কেউ নেবে না ত বড় মা" —বলিয়া চলিয়া গেল। সুশীলা বলিল—দেখ পদ্মিনী, যদি সুহাসকে না দেখ্‌তে পাও, সরমাকেই বলে এসো—বুঝলে ?

আমি সুহাসকেই বলে আস্‌ছি ; বড় মা ঐ যাঃ !—সে জিভ কাটিয়া

গালে অঙ্গুলি স্থাপন করিয়া বলিল—সুহাসের নাম করে ফেলেছি, তুমি যেন তা'কে বলে নিও না, বড় মা।

বলিবে না, অভয় দিতে মেয়েটি বারান্দা হইতে নামিয়াই উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি করিতে করিতে চলিল—

ও সুহাস, তোরে দেব রাজহাঁস।
মস্ত একটা রাজ......

সুশীলা হাসিয়া স্নানকক্ষে ঢুকিয়া পড়িল। স্নান সারিয়া নিজেই চা তৈয়ার করিল। এক পেয়ালা খাইয়া, আর এক পেয়ালা পূর্ণ করিয়া নিজের ঘরে ঢুকিল। চা-টুকু খাইতে খাইতে সে ভাবিতেছিল—তিনি ক'দিন বাড়ীতেই আছেন, তবে কেন একবারও আসিলেন না। কার্য্যের ঝঞ্ঝাট নয়, নিশ্চয়ই, তবে কি সত্যই তিনি নিদারুণ অভিমান বশে সে দিনের প্রত্যাখ্যানেরই সাজা দিতে উদ্যত হইয়াছেন? না, না, তাহাও সম্ভব নহে,—এত অল্পে বিচলিত হইবার লোক ত তিনি নন্। এত সামান্য তুচ্ছ ব্যাপারে তিনি কখনই তাহাকে গুরুদণ্ড দিবেন না!—না, নিশ্চয়ই না! তাঁহার অসাধারণ ধৈর্য্য, উদ্ধতশৃঙ্গের মত অচল অটল হৃদয়ের পরিচয় সুশীলা অনেকবার পাইয়াছে; সেদিনও, যেদিন নীলা তাঁহাকে রূঢ়ভাবে অপমানিত করিয়াছিল—সুশীলা ত ভয়ে ভাবনায় আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছিল যে আর তিনি আসিবেন না, কিন্তু সকল দুশ্চিন্তার অবসান করিয়া দিয়া তিনি যে তাহার পরদিনই প্রশান্তমুখে প্রসন্নহাস্যেই আসিয়া ডাকিয়াছিলেন—সুশীলা! সেই তিনিই যে তাহাকে, সুশীলাকে এমন করিয়া কষ্ট দিবেন, তাহাই বা সম্ভব হয় কিরূপে?

অন্যদিনের মতই সে সারাটদিন আশঙ্কা উদ্বেগের মধ্য দিয়া কাটাইয়া-

ছিল, কিন্তু অপরাহ্নে সে কিছুতেই মনটি বাঁধিতে পারিল না। সিংহের গৃহ তাহার জানা ছিল, সেক্রেটারীয়েটের পিছন দিয়া যে রাস্তাটা বরাবর উত্তর মুখে গেছে, সেইটারই শেষপ্রান্তে সুবৃহৎ অট্টালিকাটি মিঃ সিংহের আবাস ভবন। বৈকালে মেয়েদের সঙ্গীত শিক্ষা দিবার কথা—সুশীলা সেদিনের মত তাহাদের ছুটি দিয়া, কেবলমাত্র সেই পদ্মিনীকে সঙ্গে লইয়া পথে বাহির হইয়া পড়িল।

আমাদের কলিকাতার পাঠিকাদের (বিশেষ করিয়া যাঁহারা নিয়মিত হাওয়া খাইয়া না বেড়ান,) জানা না থাকিতে পারে যে সহরের বাহিরে অনেক পর্দ্দানশীন গৃহস্থবধুও পথে ঘাটে নিঃশঙ্কচিত্তে বিচরণ করিয়া থাকে। তাহাদের পর্দ্দা যদিও একটু-আধটু ক্ষুন্ন হয়, তাহাতে তাহারা বিন্দুমাত্র ক্ষুব্ধ নহে। তাহারা মনে করে, সহরের বার যখন হয়েছি, ঘরের বাহির হইতেই বা ক্ষতি কি? তার উপর এই সব জায়গায় স্বাস্থ্যকামী যে সকল পরিবার আসিয়া থাকেন, তাঁহারা পর্দ্দাটা প্রায়ই খাটো করিয়া আসেন। কাজেই এক দল আর এক দলকে দেখিলে মুখব্যাদান করিয়া অষ্টম আশ্চর্য্য দেখার মত স্তম্ভিত হইয়া যায় না। সুশীলা কোনদিনই পথে ঘাটে বাহির হয় নাই—দু' একবার রাঁচীতে এখানে ওখানে যা গেছে, হয় গাড়ীতে না হয় সিংহের মোটরে। তবুও সে নির্ভয় ও নির্লজ্জ-পদে দেড় মাইল রাস্তা হাঁটিয়া সিংহের গৃহসম্মুখে উপস্থিত হইল। দ্বারবান কহিল—বাবু ত হ্যায়, লেকিন মুলাকাত নেহি হোবে।

সুশীলা তাহাকে যতই বোঝায়, সে 'একগুঁয়ে মোষের' মত ততই ঘাড় নাড়ে, বলে—ও নেহি হোগা।

রাগে বিরক্তিতে সুশীলার যেন কান্না পাইতে লাগিল। সিংহের দ্বারে, তাঁহারই দ্বারবান কর্ত্তৃক সে অপমানিত হইতেছে—যাহার ইঙ্গিত মাত্রে এই নেমকহারাম ভৃত্যকে তখনি লোটা কম্বল সম্বল করিয়া 'মুল্লুকের' পথে রওনা দিতে হইতে পারে, সুশীলা ক্রোধ দমন করিতে না পারিয়া কহিল—বাবু টের পেলে তোমার চাকরি যাবে জান ?

ভৃত্যটা তাহাতেও ভয় না পাইয়া বলিল—যাগা ত হোগা ক্যা !

এত স্পর্দ্ধা ! সুশীলা যেন জ্ঞান হারার মত কি চীৎকার করিবারই উদ্যোগ করিতেছিল, দ্বারবান কহিল—ও চিল্লাও আউর যো খুস করো ভেট্ নাহি হোবে ; কভি নাহি হোবে। মায়িজীকি হুকুম হায় নেহি—হামলোক ক্যা করে ?

মায়িজী !—সুশীলা কি ভুল শুনিল ? মায়িজী ! সিংহের জননী না স্ত্রী ! স্ত্রী ত নাই—তিনি নিজেই বহুদিন পূর্ব্বে বলিয়াছেন, তবে কি জননী ?

হুকুম নেহি হায় ?

নেহি, বিবি সাব্, একদম্ নেহি হায়। বাবুকো ভি বাহার যানা নেহি হায় !

সুশীলা রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসিল—কে এ শক্তিময়ী রমণী, যাহার আদেশ সিংহের মত পুরুষও অবনত শিরে বহিয়া, অন্ধকূপে আবদ্ধ আছেন ?

দ্বারবান অপ্রসন্নমুখে জানাইল—সেই মহিয়সী রমণী কে তাহা আদৌ জানে না। অন্দর মহলের উচ্চ প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া এইটুকু সংবাদই তাহারা পাইয়াছিল যে এ বাড়ীতে তাঁহার বিনানুমতিতে কাহারই প্রবেশ নির্গমনের যো নাই।

ইহার কথায় সুশীলা আদৌ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিল না। কিন্তু তাহার কড়া পাহারা উপেক্ষা করিয়া এক পা বাড়াইতেও তাহার সাহসে কুলাইল না। ফটকের সামনে ঠিক এমনি ভাবে দাঁড়াইয়া তর্কবিতর্ক করিতে তাহার আরও বিতৃষ্ণা জন্মিতেছিল। এক মিনিট ভাবিয়া লইয়া সে ফিরিতেই উদ্যত হইয়াছে, পদ্মিনী তাহার শাড়ীখানিতে টান দিয়া বলিল—ছাদে ঐ-যে কে রয়েছে বড় মা!

সুশীলা ছাদের দিকে চাহিয়া দেখিল। দেখিল, কে একজন রমণী সর্ব্বাঙ্গে নানাবিধ অলঙ্কার পরিয়া, ছোট্ট একখানি জাপানী পাখা হাতে 'হাওয়া খাইয়া' বেড়াইতেছেন। রমণীও বোধ করি ইহাদের দেখিতে পাইয়াছিলেন, লজ্জায় জড়সড় হইয়াই বোধ করি সরিয়া গেলেন। সুশীলার আশা হইল, এইবার নিশ্চয়ই সিংহ খবর পাইবেন এবং সংবাদ পাইলে যে তিনি একটি মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিবেন না, সুশীলা তাহা জানিত।...তবুও সে ঠিক এই সময়েই পদ্মিনীর বাহু আকর্ষণ করিয়া বলিল—চল্ পদ্মিনী!

পদ্মিনীও যথেষ্ট বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, বলিল—তাই চল বড় মা! সাহেব যেদিন প্যাঠশালে আস্‌বে, বলো।

সুশীলা চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, একটি স্থূলাঙ্গী স্ত্রীলোক আসিয়া বলিল—এসো গো বাছারা, গিন্নী ডাক্‌ছে।

সুশীলার কণ্ঠে প্রশ্নটি উদ্যত হইয়া উঠিয়াছিল যে, কিছুক্ষণ পূর্ব্বের দেখা সেই অলঙ্কার বিভূষিতা নারীটি কে? সে বলিল—আর এখন যেতে পারব না, সন্ধ্যে হ'য়ে এল।

স্ত্রীলোকটি বলিল—একবারটি এস, বাছা, ডাকছে। এখনি না হয় যেও এখন। এস বাছা, এস।

সুশীলা অগত্যা তাহাকে অনুসরণ করিয়া চলিল। কয়েকটা ঘর পার হইয়া যেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল, সে ঘরটার মাটী হইতে কড়ি কাঠটি পর্য্যন্ত বিলাতি সাজসজ্জায়, বিলাতি রুচিতে সুসজ্জিত। ঘরে কেহ ছিল না। স্থূলাঙ্গী তাহাদের বসিতে বলিয়া বাহির হইয়া গেল—তাহার এক মিনিট পরেই সেই রমণী আসিয়া বার দুই তিন ইহাদের আপাদ মস্তক লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসিল, কাকে খুঁজছিলে গা?

সুশীলা বলিল—মিঃ সিংহের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। তা তিনি বোধ করি অসুস্থ আছেন······

রমণী আবার সেইরূপ সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে সুশীলার পানে চাহিয়া বলিল—অসুস্থ! কোথায় পেলে, বাছা, খবরটি?

সুশীলা প্রথমটা কথা কহিতেই পারিল না। শুধু যে প্রশ্নটাই অভদ্রতাসূচক, তাহা নহে। এই রমণীর সন্দিগ্ধদৃষ্টি, ততোধিক তাহার বিশ্রী কণ্ঠস্বরে সুশীলার অত্যন্ত ঘৃণা বোধ হইতেছিল। সে রমণীর প্রশ্নের উত্তর না দিয়াই বলিল—তিনি অসুস্থ নন্—সে ত ভালোই। একবার দেখা হতে পারে কি?

অপরা কহিল—না।

সুশীলা নির্ব্বাক! এক মুহূর্ত্ত পরে বলিল—আমি এসেছিলুম তাঁর কাছে স্কুলের সম্বন্ধে একটা পরামর্শ করবার ছিল।

কি পরামর্শ—শুন্‌তে পাই?

আপনাকে কি বল্‌ব, বলুন······

তবে বলে কাজ নেই। যাঁর স্কুল তাঁর ঠিকানা দিচ্ছি—তাঁ'কেই জানিও।······চাই ঠিকানা?

স্কুল কার?

রাণী দয়াময়ীর! দয়াময়ীর ছেলে আছে, সেই এখন দেখা শুনা করবে।

সুশীলা অত্যাধিক বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল, বলিল, স্কুল, মিঃ সিংহের নয়?

না গো, না। কতবার বল্‌ব! রাণী দয়াময়ীর নাম শুনেছ?—তাঁরই। দয়াময়ী মরেছে—তার ছেলে কুমার সত্যেন্দ্র কলকাতায় থাকে।

সুশীলা জিজ্ঞাসিল—যদি কিছু মনে না করেন, আপনি কে—জান্তে পারি কি? অবশ্য আপনি যে তাঁর আত্মীয় তা আমি বুঝতেই পারছি।

রমণী ভ্রুকুটিসহকারে কহিল—কি মনে হয় তোমার?

সুশীলা বলিল—বিশেষ আত্মীয় বলেই ত মনে হয়। কিন্তু, আমরা ত অনেক দিন থেকেই জানি তাঁকে……

বাধা দিয়া রমণী বলিয়া উঠিল—এ রকম আত্মীয়ের কোন সন্ধানই পাও নি—এই ত! হুঁ—তা বেশ বুঝতে পারছি।

সুশীলা বলিল—আমরা যাই!

রমণী হাসিয়া কহিল—যাই! তা কি হয়? এতটা পথ এলে কষ্ট করে', দেখা হ'ল না, একটু মিষ্টিমুখ করে যাও।

সুশীলা হতভম্বের মত চাহিয়া রহিল। রমণী পুনশ্চ কহিল—স্কুলে ম্যাষ্টারী কর?

হ্যাঁ।

বাড়ী কোথায় ?

কলকাতা।

হুঁ……বলি, কোন্ পাড়া ?

সুশীলা প্রশ্নটাই সম্যক বুঝিতে পারিল না, তা উত্তর দিবে কি ? রমণী তাহাকে নীরব দেখিয়া কহিল—কলকাতার আমি সব চিনি গো সব চিনি। ও সোণাগাছী, রামবাগান, হাড়কাটা, বউ পদ্মিনীর গলি—সবই আমার জানা। বল না, কোন্ পাড়া ?

সুশীলা বিস্ময় দমন করিতে না পারিয়া কহিল—আপনি কি বল্ছেন, আমি ত তার একটি বিন্দুও বুঝতে পারছি নে।

তা ত পারবেই না। আচ্ছা থাক্—সে খবরটা অক্লেশেই নিতে পারব'খন। কতদিন এসেছ এখানে ? অনেক দিন নিশ্চয়ই। তা না হ'লে আর রাত্রে একলা, একটা কচি মেয়ের হাত ধরে, বাড়ীতে হাজির হ'তে পেরেছ ?

সুশীলা রক্তাক্ত মুখে নীরবে আগুনে পুড়িতে লাগিল।

রমণী বাহিরের দিকে চাহিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিল—ওরে সদু, সদু, জলটল খাবার কিছু নিয়ে আয়-না বাছা !

জল আমি খাব না। আমি যাই।

রমণী সুশীলার হাতটি ধরিয়া বসাইয়া দিয়া বলিল—একটু বস, একটুখানি।

আমাকে আপনি মাফ্ করুন। রাত্রি হ'য়ে আস্ছে, অনেকখানি পথ……

গাড়ী দেব'খন। বসো—পাঁচ মিনিট।

এই সময়েই একটা ভৃত্য আসিয়া কহিল—বাবু জেগেছেন।

রমণী তাহাকে বলিল—দিগে যা দু' পাত্র—আমি আস্‌ছি এখনি। আর দেখ, লাল বোতলটা থেকে দিস্।

সিংহ পীড়িত?

রমণী হাসিয়া কহিল—হ্যাঁ। বিষম রোগ। যে রোগে ঘোড়া মরে' ফৌত হয়, সেই রোগ।—দু' চার সেকেণ্ড থামিয়া নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসিল—একটু চল্‌বে? লজ্জা কি?—বলিয়া সে দু' হাতে কি একটা ঢালার ইঙ্গিত করিল।

সুশীলা বলিল—আমি জলটল খেতে পারব না, আপনি আমাকে মাপ করুন!—পদ্মিনী কৈ?

রমণীও বলিল—কোথায় গেল মেয়েটা?

সুশীলা চারিদিকে চাহিয়া বলিল—কি জানি!

এ দিক ওদিক বেড়াচ্ছে বোধ হয়। তা বেড়াক। উটি কে? মেয়ে?

হ্যাঁ।

তা বেশ, বেশ। ক'বছরের হল উটি? বছর নয়েক হ'বে না?

ঐ রকমই হ'বে।

রমণী হাসিয়া বলিল—ঠিক হিসাবে নেই? আচ্ছা যা হোক্! মুখখানা কিন্তু তোমার মত-ও নয়......এই যে সই!

সুশীলা দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—সত্যি বল্‌ছি আপনাকে, আমাকে ক্ষমা করুন! আর আপনার লোকটিকে বলুন, পদ্মিনীকে ডেকে দিতে।

তা বলছি। ও-রে সত্ন, দেখত, মেয়েটি কোথায় গেল!

সত্ন বাহির হইয়া যাইতেই রমণী বলিল—বস, বস। একটু কিছু মুখে দাও, যা পারো। দেখ ভাই' বাঙ্গালীর ঘরে এ রীত্ আছে।

সুশীলা মৃদুকণ্ঠে কহিল—এ খাবার সময় নয়, কেবল আপনার কথা রাখবার জন্যেই...বলিয়া সে একটুকরা সন্দেশ গালে ফেলিয়া খানিকটা জল গিলিয়া ফেলিল।

রমণী এবার স্নেহবিগলিতস্বরে বলিতে লাগিল—এই ত ভাই কথা রাখাও হ'ল, গৃহস্থের কল্যান করা-ও হল।

সুশীলা কথা কহিল না।

রমণী জিজ্ঞাসিল—তোমার নামটি কি ভাই?

সুশীলা নাম বলিল।

আমার......

সুশীলা ভদ্রতা রাখার উদ্দেশ্যেই কহিল—আপনারটি ত বল্লেন না?

রমণী হাসিয়া বলিল—আমার নাম ভাই সরসী। দেখ এই তোমার নামটি বেশ, তবে বড় পুরোণো! সেকেলে, সেকেলে, না?

সুশীলা বলিল—তা হ'বে। নাম ত আর নিজের রাখা নয়।

তা বটে! বেশ নামটি তোমার মেয়ের। পদ্মিনী—বেশ নতুন নামটি। দেখ-ভাই সুশীলা, প্রথমটা তোমার ওপর আমার একটু রাগই হ'চ্ছিল, এখন আর তা নেই। দু'টো কথা বলব, তোমারই হিতের জন্যে। যদি রাখ ত বলি?

অদম্য কৌতূহলের বশেই সুশীলা বলিল—বলুন-না?

রমণী বলিল—দেখ এর আর বেশী দিন নয়। ঐ লালবাত্তী না কি

বলে তাই জ্বালছে। সেই লালবাতীর টুনীর কাছে খবর পেয়েই ত আমি এখানে এসেছি।······সে আপন মনেই বলিতে লাগিল জ্বলবে না? অত নবাবী কি ধোপে টেঁকে! পাঁচখানা মটর রাখা, ঢাকার নবাবই পারে না, তা উনি ত উনি, পুঁটি মাছ! লালবাতীয়ালাই বল্লে দেনায় একেবারে কণ্ঠায় কণ্ঠায় হ'য়ে পড়েছে, বড় আদালতের হুকুম নিয়ে বাতী জ্বাল্‌বে।

সুশীলা বলিল—ইন্‌সলভেন্সি?

রমণী বলিল—কে-জানে বাপু কি ভেন্সি। লালবাতীই ত বলে, দেউলে, দেউলেও বলে।

সুশীলা 'হাঁ' করিয়া চাহিয়া রহিল, তলে তলে এমনটি হইয়াছে! দুঃখে তাহার মুখ অত্যন্ত ম্লান হইয়া গেল।

সরসী কহিল, তোমাকেও তাই বল্‌ছি, ঐটি হ'য়েছে, তোমারও ত একটা হিল্লে করে নেওয়া চাই; তা কিছু নগদ টগদ নিয়ে, কি-বল? তা হাঁজার পাচক দিইয়ে দিতে পারব। বেশীও কিছু পারতুম কিন্তু ভাই তা আর হ'বে না।—তোমার ঐ একটি, আমার পাঁচটি! বড়টি এই সবে চোদ্দ, তার পরেরটি বারো, এগারো, নয়, তিন—মাঝে একটি মারা গেছে কি-না। তিনটি মেয়ে, শেষের দু'টি ছেলে।

সুশীলা হাঁ করিতে গেল, সরসী সেই ক্ষুদ্র অবসরটুকুও না দিয়াই বলিল—অনেক পাপ করেছে, শেষাশেষি ভোগটিও বড় অল্প হ'বে না। শুনেছি না-কি লালবাতী জ্বাল্‌লে লোক পথেও বার হ'তে পারে না। না-গো, অজ্ঞাতবাস—আর কি!

না, না, ওসব মিছে কথা! ঢের ইন্‌সলভেন্ট আছে—বেশ কাজকর্ম্ম করছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে, ছেলে মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে।

তাই না কি ?

হাঁা। আমি দেখেছি, জানি।

তা সে মরুক্ গে যাক্। আমি ভাই এখনই একটা বিলি ব্যবস্থা করে নিতে চাই। তাই যেদিন এসেছে, সেদিন থেকেই আট্‌কে রেখেছি—আমার টুর্নী এলে, লেখাপড়া করে তবে ছাড়্‌ব। আজই রাত্রের গাড়ীতে রমেশ বাবু আস্‌বে। তা, তুমি ভাই ঐতেই রাজী ত ? রাজী হ'য়ে পড় ভাই। নইলে দুই-ই যাবে। শেষে কিছুই পাবে না।

আপনি কি বল্‌ছেন ? ? ? আমি কিছুই চাই নে।

সরসী বলিল—কেন ভাই অবুঝ হ'চ্ছ ? পাঁচহাজার! এমনই বা কি কম! তার ওপর, লেখাপড়া জান, ম্যাষ্টরী করতে পার, তোমার ভাবনা কি ? ঐ দয়াময়ীর ছেলে কুমার সত্যেন্দ্র যদি স্কুল রাখে সে ত আর তোমাদের তাড়াবে না। আমরা ভাই মুখ্যু সুখ্যু মানুষ - আমাদের এই একমাত্র ভরসা। দেখ ভাই সুশীলা, এই তিনটে বছর কি কম ভুগিয়েছে আমায় ? শুন্‌লুম রাঁচিতে, এলুম, অমনি পালাল কোথায় ঝরিয়া, কোথায় সিমলে, কোথায় কাশী! এমনি করে ঘুরিয়ে মেরেছে! শুন্‌লুম কলকাতায়, গেলুম, গিয়ে দেখি পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। এবার তাই মতলব করে আগে-ভাগে এসে পাকড়াও করেছি। তাই কি থাক্‌তে চায়—কত হাঙ্গাম ;—শেষ মদের পিপে চাপা দিয়ে তবে রাখতে পেরেছি।

আতঙ্কে শিহরিয়া সুশীলা বলিয়া উঠিল, চাপা দিয়ে !

সরসী মৃদু হাস্য করিল। বলিল—না, গো, সে-রকম কিছু নয়। বোতল, বোতল, বোতল। এবার আবার কলকাতায় গিয়ে না কি

ক'টা মেয়ের সর্ব্বনাশের চেষ্টায় ছিল, ক'দিন নেশার মুখে তা'দেরই নাম করেছে! কি-যে ভালো নাম তিনটে করেছে, ভুলে যাচ্ছি—মরণ আমার মনের! কিছু যদি মনে থাকে! হ্যাঁ হ্যাঁ, হ'য়েছে নীলা, নীলা, আর একটা সু, হ্যাঁ সু-ই বটে!

সুশীলা পাংশু বিবর্ণ-মুখে নিঃশ্বাস রোধ করিয়া বসিয়া রহিল। সরসী বলিতে লাগিল, এমন সর্ব্বনাশ যে কতজনের করেছে তার কি আর 'হিসেব' আছে ভাই? আজ বল্‌তে বুক ফেটে যায়, বোন্‌, আমারই এ সর্ব্বনাশ যেদিন করেছিল······বলিতে বলিতে সরসীর কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া গেল। এক মিনিট পরে সে সজল কণ্ঠেই কহিতে লাগিল - এই পাপেই রাবণরাজা সবংশে নিধন হ'য়েছিল—তা এ-ত তুচ্ছ মানুষ! ভাই, আমার কথা রাখ। অমত করো না, আর ভাগীদার জোটবার আগেই আমার কথায় রাজী হও, টাকাটা আমার টুর্নী রমেশ বাবু এলেই তোমাকে পাইয়ে দেব।

এই সময়েই পদ্মিনী আসিয়া সুশীলার পাশে দাঁড়াইয়া মৃদুস্বরে বলিল—বড়মা, সাহেব ও ঘরে শুয়ে রয়েছে। আমাকে ডেকে সব জিজ্ঞাসা করলে। তারপরই কি রকম একটা শব্দ করে লাফিয়ে উঠ্‌ল, তখনি আবার চিৎ হ'য়ে ধপাস্‌ করে শুয়ে প'ড়েছে। এই দেখ-সেনা, বড় মা!

সরসী বলিল—দেখ্‌বে, এস।

সুশীলা যেন কলের পুতুলটির মতই সরসীকে অনুসরণ করিয়া চলিল। পথে সরসী কহিল—যখন কলকাতা যাবে, আমার সঙ্গে দেখা করো ভাই। বুঝ্‌লে? বন্ধুত্বই যখন হ'ল। তোমাকে আমি ঠিকানা বলে দেব—বুঝ্‌লে?

নিদর্শন

সুশীলা হঠাৎ থামিয়া পড়িয়া বলিল—আর আমি যাব না, আপনি যান্।

আর যেতে হ'বে না। ঐ যে!—বলিয়া সরসী সুশীলার স্কন্ধে হাত দিয়া এ-দিক নির্দ্দেশ করিল। সুশীলা যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। সিংহ প্রায় নগ্নবেশে টলিতে টলিতে এদিকেই আসিতেছিলেন। সুশীলা দু'হাতে মুখ ঢাকিয়া কহিল—আয় পদ্মিনী। চলে আয়।

সিংহ নিকটে আসিয়া সরসীর কেশাগ্রভাগ আকর্ষণ করিয়া দন্তে দন্তে কহিলেন—সর্ব্বনাশী! এবার কি হয়?

সরসী হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল—কি আবার হ'বে?

কি হ'বে?—দেখেছিস্!—শুনিয়া সুশীলাও চক্ষু তুলিল। দেখিল দক্ষিণ হস্তে পিস্তল উঠাইয়া সিংহ সরসীকেই লক্ষ্য করিতেছেন।

সরসী কিন্তু ভয় পাইল না, সে আবার হাসিল, বিকট হাসি হাসিল। হাসিয়া বলিল—কর গুলি,—কর!

করি?

কর।

সুশীলা ভয়ার্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া কহিল—কি করছেন?

গুলি। একসঙ্গে তিনটি, না, না চার। তুমি, আমি, এই সর্ব্বনাশী আর ঐ মেয়েটাও।

পদ্মিনী সুশীলার কাপড়ের ভিতর মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। সুশীলা বলিল—আমাকে মারুণ, আমার মরণই মঙ্গল, ও-কে কেন?

সিংহ বলিলেন—সব। প্রথমে তুই।

সরসী বলিল—কর, কর। থামলে কেন?—পিস্তল খট্ করিল, কিন্তু অগ্নিরাক্ষস দেখা দিল না।

সিংহ পিস্তলের কার্ত্তুজের ঘর নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন—খুলে নিয়েছিস্?

নেব না? নইলে যে তুমি আত্মহত্যে হ'তে!

সিংহ সজোরে পিস্তলটি কক্ষ গাত্রে নিক্ষিপ্ত করিয়া, সরসীর গলাটা টিপিয়া বলিলেন—এইবার!

সরসী চীৎকার করিয়া উঠিল—নিধু! নিধু!

নিধু উর্দ্ধশ্বাসে আসিয়া সিংহের পৃষ্ঠে গোটা তিনেক ঘুঁসি লাগাইয়া সরসীকে মুক্ত করিল। নিধিরাম কলকাতার একজন প্রসিদ্ধ গুণ্ডা, সরসীই তাহাকে আনিয়াছিল। সরসী মুক্ত হইয়া গণ্ডে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল—দেখেছ? এইবারে বুঝেছ কি? সে সরসী এ নয়; যা'কে ভুলিয়ে ঘরের বার করেছিলে, সেই বোকা, পাড়াগেঁয়ে, তেরো বছরের হতভাগী সরসী এ-নয়। এখন ইচ্ছা করলে তোমার মুণ্ডুটাই...... নিধিরাম!

নিধিরাম সিংহের পৃষ্ঠে আর একটা ঘুঁসি বসাইয়া বলিল—হ'য়েছে!

সিংহ মাটীতে পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। নিধিরাম দু'একটা মাঝে মাঝে আরও পুরস্কার প্রদান করিতে ভুলিল না।

সরসী বলিল—এই একটা মেয়ের সর্ব্বনাশ করেছ! আবার কলকাতায় কা'দের চেষ্টায় ছিলে, কে-জানে! ক'দিন যে তা'দের খুব নাম করছিলে? কি ভালো নাম দু'টো—সু আর নীলা! এই,না? বল-না, একবার শুনি?

সিংহ গর্জ্জন করিল—Infernal bitch !

সুশীলা এই প্রথম কথা কহিল, বলিল—কে, ঘনশ্যাম বাবু? উনি, না—?

সিংহ উঠিবার চেষ্টা করিতেই নিধিরাম ক্ষতস্থানে সশব্দে ঔষধ প্রদান করিল।

সরসী বলিল—বেঁধে ফেলে রাখ্, নিধু। মদ দে, যত চায়, তত দে! আজকের রাতটা। কাল সকালে রমেশ বাবু এসে পড়লে, সব ঠিক হ'য়ে যাবে। দে-দে, খুব মদ দে।

সিংহ মুখ-ব্যাদান করিয়া রহিল।

সরসী নিধুকে ইঙ্গিত করিয়া, সুশীলাকে বলিল—চল ভাই, গাড়ী জুতে দিতে বলি তোমাকে। আর যদি রাজী থাক, পর্শু একবার এস, টাকাটা নিয়ে যেও।

সুশীলা বলিল—সরসী ভাই, বন্ধু, তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ! টাকার আমার দরকার নেই ভাই। তবে তুমি যা বল্‌ছ যদি সত্য হয় ঐ পাঁচ হাজার টাকা ওঁকেই তুমি দান করো। ওঁর বিপদকালে কাজে লাগ্‌বে। আমার এই অনুরোধটি তুমি রেখো ভাই। আমাকে তুমি বন্ধু বলেছ, মনে আছে?

আছে।

কথা রাখবে?

রাখব। কিন্তু তোমার……

সুশীলা হাতটি উর্দ্ধে উত্থিত করিয়া কহিল—আমার ভিন্নি আছেন, সরসী।

বেশ, বন্ধু বেশ! চল।

চল, বলিয়া সুশীলা পদ্মিনীর হাত ধরিল। সিংহের দিকে ফিরিয়া বলিল, ওঁকে তুলে শুইয়ে দিতে বল, বন্ধু!

নিশ্চয়!

—তাহারা বাহির হইয়া গেল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

হিন্দুয়ানী।

রাত্রি ভোর হইয়াছে। অন্ধকার তখনও পৃথিবীকে ত্যাগ করিয়া যাইতে পারে নাই, সুনীলা খড়খড়িটা ফাঁক করিয়া দেখিয়া, বিছানায় ফিরিয়া আসিয়া কহিল—ভোর যে হ'য়ে গেল, খগেন বাবু। একটু শুলেন না আপনি? এইবার একটু গড়িয়ে নিন্, আমি ত আছি, আর জ্বর যখন ছেড়েছে বল্‌ছেন—

খগেন বলিল—তুমিই হাত দিয়ে দেখ-না সু! আমি কি মিছে বল্‌ছি?

আমি ও বুঝতে পারি না।

খগেন সুনীলার হাতটি ধরিয়া বলিল—গরম কি ঠাণ্ডা বুঝতে পারবে না।·· কি রকম মনে হ'চ্ছে?

ঠাণ্ডাই ত মনে হয়।

ঐ জায়গায় হাত দিয়ে, যারা নাড়ী দেখ্‌তে জানে না, তারা জ্বর নির্ণয় করে। পাঁজরাটা হ'ল জ্বর-বোর্ড আর কি!

সুশীলা হাসিয়া বলিল—আচ্ছা, আপনি এত শিখলেন কোত্থেকে বলুন ত? ক্যাম্বেল হাঁসপাতালের আফিসে সেই একাউণ্টেণ্টের কাজ করেই কি?

সুনীলার হাতখানি তখনও খগেনের সুপুষ্ট থাবার মধ্যেই ছিল. সে'টিতে চাপ দিয়া খগেন কলিল—হ্যাঁ গো, হ্যাঁ, তাই করেই। কিন্তু বিছেটা কি-রকম হ'য়েছে তা বল?

সুনীলা হাসিয়া বলিল—উঁ হুঁ, কিচ্ছু হয় নি। কেবল আন্দাজী কতকগুলো......

খগেন তাহার হাতের একটা আঙুল মট্‌ করিয়া মট্‌কাইয়া দিয়া বলিল—তাই বৈ কি! কাল কি রকম? আমি বল্লুম, জ্বর ১০৩ থার্মোমিটারে কত উঠ্‌লো ম'শাই? তিন নয়?

সুনীলা বলিল—সে আমিও পাঁজরায় হাত দিয়ে বলে দিতে পারি। কিন্তু কাল সন্ধ্যাবেলা বল্লেন যে জ্বরটা রাত ১২টার সময় ছেড়ে যাবে, আমি ছু'টোর সময় থার্মোমিটার দিয়ে দেখলুম, তখনও রয়েছে। এই ত হ'ল না ম'শাই, মিলল না ত।

না মিলুক, জ্বর ত ছেড়েছে, বলিয়া সে আবার সেই শিথিল, শীতল, স্নিগ্ধ করতলটি চাপিয়া ধরিল। সুনীলা জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা খগেন বাবু, এত খবরও নাড়ী দেখে পায়?

সুনীলায় অবিশ্বাসের স্বরে খগেন বিস্মিতই হইল; বলিল—কালই যে বল্লুম সু! এই খবর কি বলছ, এক বছর, ছু'বছর, দশবছরের খবর

পাওয়া যায়! অন্ততঃ আমাদের দেশের বৈদ্যগণ পেতেন আগে! এখন সে শিক্ষাও নেই, কিছুই নেই। আমার বৃদ্ধমাতামহের নাড়ীজ্ঞান এমনই ছিল, একবার তিনি একটি লোকের নাড়ী দেখে তার ছেলেকে বলে দেন, অমুক বছরের অমুক মাসের অমুকদিনে তোমার বাবাকে গঙ্গাস্নান করাতে ত্রিবেণী নিয়ে যাবে। ছেলেরা কারণ জিজ্ঞাসা করলে! "নিয়ে যেও না বাপু!" কিছুদিন আগেই বেরিয়ে তারা ঠিক ত্রিবেণী পৌছোল। এবং সেইদিনে সেইসময়ে বৃদ্ধ সন্তান বেষ্টিত হ'য়ে সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করলে!

সত্যি খগেন বাবু?

মিথ্যে হবার কোন কারণ নেই। আমার বাবার মুখে শুনেছিলুম এই ঘটনা। আমার বাবা মিথ্যে বলতেন না।

তা জানি। বাবার কাছে অনেকবার শুনেছি। আচ্ছা আপনি নাড়ী দেখ্‌তে শিখ্‌লেন কোথায়? সত্যিই কিছু হাঁসপাতালে·····

খগেন বলিল—না। আমি শিখেছিলুম আমার এক মামার কাছে। ঐ বৃদ্ধমাতামহেরই বংশের।

সুনীলা বলিল—আপনি ডাক্তারী করেন না কেন খগেন বাবু?

এইবার করব। বলিয়া খগেন হাসিল।

হাস্‌ছেন কেন? এ'টা কি হাসির কথা হ'ল? কি-ছাই চাকরী করেন? সারা মাস খেটে একশ'টি টাকা! কতই বা বাড়বে? দু'শ তিনশ'ই হোক্। স্বাধীন জীবিকা-কে জীবিকা হ'বে, আর পয়সা-ও হ'বে। তাই করুন, খগেন বাবু।

খগেন বলিল—তাই করব, তোমার যখন অসুখ হ'বে, আমাকেই ডেকো। ফি-টা-ও দিও—যেন তার বেলায় ফাঁকি দিও না।

সুনীলা বলিল—আপনি আমার অসুখ কামনা করছেন, খগেন বাবু?

নৈলে আর ডাক্তারী করব কোথায় বল? কে-ই বা ডাক্‌বে কেই বা ভিজিট্‌ দেবে? চাকরী-বাকরী ছেড়ে যে বস্‌ব, পেট চলা চাই ত! সেই ইন্দু ডাক্তারের মা'র গল্প জান ত? জান-না?

সুনীলা বহিল—বাজে কথা আমি শুন্তে চাই-নে।

খগেন বলিল—শোনই আগে। বাজে নয়। পাড়াগাঁয়ে ইন্দু ডাক্তার চিকিচ্ছে করে। এখন গাঁ খানায় বেশী লোকের বাস নয়, ডাক্‌-টাক্‌ ও বড় কম। ডাক্তারের সংসার চলা দায় হ'য়ে পড়েছে। ডাক্তার নিজে কি করে জানি নে, ডাক্তারের বুড়ী মা সত্যনারায়ণের সিন্নী টিন্নী দেয়। এক সময় গাঁয়ে বারোয়ারী হ'বে, রক্ষে কালী পূজো। চাষার দল সব চাঁদা চাইতে গেছে, ডাক্তারের মা কেঁদে কেটে বল্লে—বাছা চাঁদা দেব কি বল? ইন্দুর কি আমার রোজগার পাতি আছে! মা কালী করুণ, গাঁয়ে মড়ক-টড়ক হোক', তখন চাইতে হবে না, বাবা, তোমাদের বাড়ী আমি নিজে বয়ে দুনো চাঁদা দিয়ে আস্‌ব। মা কালী মুখ তুলে চান্‌, তখন আমি নিজেই জোড়াপাঁঠা দিয়ে তাঁর পূজো দেব।—শুনে চাষার দল বল্লে, দোহাই মাঠাকরুণ, তোমার চাঁদা দিতে হ'বে না, আমরা অমনিই মা'র প্রসাদ দিয়ে যাব। তা আমার ডাক্তারীতেও প্রথম কামনা হে মা কালী, সু-র অসুখ দাও, নৈলে আর পেট্‌ চলে না!—এই ত!

সুনীলা হাসিয়া বলিল—তা বৈ কি! অমন নাড়ীজ্ঞান আপনার, কলকাতায় ডাক্তারখানা খুল্লে কত লোক ডেকে নিয়ে যাবে।

তা না হয় নিয়ে গেল! চিকিৎসে কি রকম হ'বে? 'বাপু হে, তুমি বাছুর খেয়েছ'—গোছ না কি?

সে আবার কি?

এক কবরেজের এক শিষ্য ছিল। শিষ্যটি প্রায়ই কবিরাজের সঙ্গে রোগী দেখ্‌তে যেত। একদিন একটা রোগীর বাড়ী কবিরাজ রোগীকে বল্লেন—তোমায় বারণ করলুম বাপু, শুন্‌লে না, খই টই গুলি খেলে, পেট্‌টি যে বড়ই স্ফীত হ'য়েছে! এখন বাড়ীর লোক, রোগী নিজে, সবাই ত অবাক্। কবিরাজ তবে হাত গুণ্‌তেও জানেন। শিষ্যটি কিন্তু বেশ চালাক, সে দেখ্‌তে পেলে বিছানার পাশে গোটাকতক খই তখনও পড়ে রয়েছে। যাক্ কবিরাজ ত মহালবঙ্গ চূর্ণ না কি খেতে বলে গেলেন—রোগীও সে যাত্রা বেঁচে উঠলো। এদিকে কিছুদিন পরে শিষ্যটি 'স্বাধীন' হ'য়ে স্বয়ং কবিরাজ হ'য়ে বস্‌লেন। একটা রোগীর খুব বাড়াবাড়ি। কিছুতেই কিছু হ'চ্ছে না, বাড়ীর লোকও চটে উঠেছে। কবিরাজ নিজেও চটে উঠেছেন। তিনি চটেছেন, রোগীর ওপর! কিন্তু কোন খুঁতই পাচ্ছেন না। একদিন, এখন, ঘরে ঢুকেই দেখ্‌লেন, একগাছা বাছুরের দড়ী রয়েছে পড়ে বিছানার কাছেই। রেগে অগ্নিশর্ম্মা হ'য়ে বল্লেন—এরকম অত্যাচার করলে কি রোগ সারে বাপু! এই যে কুপথ্যটি করেছ, বাঁচান দায় হ'য়ে উঠ্‌লো যে!—শুনে সবাই অবাক্। কবিরাজ বল্লেন—বাপু খিদেই না হয় পেয়েছিল, তাই বলে হিন্দুর ছেলে হ'য়ে ঐ অখাদ্যটিই খেয়ে বস্‌লে!—কি ম'শায়! কি খেয়েছে! —আর ম'শায়! ঐ দেখুন-না একটি গো-বৎসই খেয়ে বসে আছেন!... শুনে বাড়ীর লোক কি করলে জান? দমাদ্দম, দমাদ্দম! ধনঞ্জয়! ধনঞ্জয়!

সুনীলা হাসিয়া লুটোপুটি খাইতে লাগিল। বলিল—ওহ্-হ্, খগেন বাবু, খগেনবাবু এতও আপনি জানেন?—সে লুণ্ঠিত চাবিশুদ্ধ অঞ্চলটি স্কন্ধে তুলিয়া দিল।

খগেন আবার তাহার হাতটি ধরিয়া বলিল—এ-রকম করি? কি-বল? তার পর উত্তম মধ্যম খেয়ে······

সুনীলা হাসিয়া বলিল—আবার! খগেনবাবু, আবার!

অল্পক্ষণ পরে কহিল—সত্যি আপনি ডাক্তারী পড়লে উন্নতি করতে পারতেন, খগেনবাবু, নিশ্চয়ই।

বোধ হয় পারতুম! একটু হাসিয়া পুনরায় কহিল—কি-রকম জান? মুর্খ বয়াটে ছেলে অন্যে অনেক লেখা পড়া শিখেছে, পাশ করেছে শুন্‌লে যেমন স্বগতোক্তি করে—পড়লে আমিও পারতুম!

আচ্ছা খগেনবাবু এখন পড়লে হয় না?

খগেন তাহার গম্ভীর মুখের পানে চাহিয়া কহিল—হয়! কিন্তু আমার আকিঞ্চে যে বড় উঁচু, সু—

কি আবার 'আকিঞ্চে'?

শুধু একটা ডাক্তারী খেতাব নিয়ে পয়সা পেটাই আমার চরম ও পরম লক্ষ্য নয়। যদি ডাক্তারীই করতে হয়, ও শাস্ত্রের যেখানে যা আছে, বিলেত টিলেত ঘুরে পড়ে শুনে আস্‌তে ইচ্ছে হয়। কিন্তু, সে ত আর হ'বার নয়।

সুনীলা জিজ্ঞাসিল—কত টাকা থাকলে হ'ত খগেনবাবু?

খগেন অন্যমনস্কের মত কহিল—কি বল্‌ছ?

সুনীলা প্রশ্নটা পুনরায় কহিল। খগেন একমুহূর্ত্ত ভাবিয়া ম্লান মুখে জবাব দিল—অনেক টাকা, তবে ঠিক কত, জানিনে।

ফেণিলা বলিল—আপনার বন্ধু বীরেন্দ্রবাবু জানেন!

খগেন সুনীলার হাতটি ছাড়িয়া দিল। সুনীলা ও খগেন উভয়েই জানিত, সে নিদ্রামগ্ন।

খগেন কহিল—তিনি ত জান্‌বেনই।……এখন কেমন আছ নীলা?

বেশ আছি—বলিয়া ফেণিলা অন্যদিকে মুখ করিয়া শুইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ ইহারা আর কোন কথা কহিল না। খড়খড়ির ফাঁকে ফাঁকে অরুণোদয়ের আভায জানিয়াই সুনীলা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—আপনি মুখ হাত ধুয়ে ফেলুন, চা করে আনি।

আধঘণ্টা পরে মৃদু পদে ঘরে ঢুকিয়া বলিল—এখনো ঘুমচ্চে ত?

খগেন বলিল—হ্যাঁ। এখন কিছুক্ষণ ঘুমোবে।

সে ভালই। আসুন আপনি।—বলিয়া সে অগ্রবর্ত্তিনী হইল।

অন্যদিনের মত কাশ্মিরী বারান্দায় চায়ের টেবিলে ট্রে রাখিয়া ভৃত্য দাঁড়াইয়াছিল, খগেন বলিল—পড়বার ঘরে আন-সু।—নীলা উঠ্‌লে শব্দ পাওয়া যাবে।

সুনীলা নিজেই সমস্ত লইয়া আসিল। ভৃত্য টেবিলটা কক্ষ মধ্যে পাতিয়া দিয়া প্রস্থান করিল।

খগেন চা খাইতে খাইতে কহিল—তুমি খাবে না-সু?

খাব'খন।

এখন না?

না। একটু পরে খাব।

রব্বানি দ্বারটি ঠেলিয়া আবার সরিয়া যাইতেছিল, সুনীলা ডাকিল। রব্বানি "একটু পরে আস্‌ব দিদি," বলিয়া চলিয়া যাইতেছিল, সুনীলা দ্বার-সন্নিকটে আসিয়া কহিল—এখনই এস-না, রব্বানি। একটু পরে আবার স্নান করতে যাব।

রব্বানি নতমুখে কহিল—একটা কথা বল্‌তে এসেছিলুম দিদিমণি।

তাহাকে ইতঃস্তত করিতে দেখিয়া সুনীলা অভয়-কণ্ঠে কহিল—বল-না রব্বানি।

তবুও সে ইতঃস্তত করিতেছে, সুনীলা স্নেহমাখা স্বরে বলিল—কি রব্বানি?

রব্বানি বলিল—বাড়ীতে অসুখ-বিসুখ। কি করে' বলি, দিদিমণি? তার ওপর তুমি আবার একলা। কিন্তু…

সুনীলা বলিল—বল।

আমাদের পরব পড়েছে দিদিমণি।

ওঃ! মহরম বুঝি?

হ্যাঁ। আমার ত বলতে সাহস হয় না দিদিমণি, এমন অচল সংসার ফেলে যাই-ই বা কেমন করে?

সুনীলা উৎসাহিত হইয়া বলিল—তাই বলে তোমার ধর্ম্মকার্য্যে যোগ দিতে পাবে না তুমি! না রব্বানি, তুমি যাও। আমি বল্‌ছি।

রব্বানি নতমুখে স্খলিতস্বরে কহিল—তোমাদের দুর্গো পূজার মত বড় পরব এ'টা কি না আমাদের! তাই…

আমি জানি রব্বানি। তুমি যাও। ভারি ত কাজ, আমি চালিয়ে নেব।

তোমার কষ্ট হ'বে......

কিছু হবে না, রব্বানি। দু'দশদিন চালিয়ে নিতে আমার কোনই কষ্ট হ'বে না। বরং তোমাকে ছেড়ে দিতে না পারলেই আমার কষ্ট হ'বে। তুমি যাও রব্বানি।—কবে আস্‌বে আবার?

পর্শু আসব, দিদিমণি। আর যদি পারি, কাল রাত্রেই আসব।

বেশ।

রব্বানি কৃতজ্ঞতাপূর্ণস্বরে একটি একটি করিয়া কহিতে লাগিল—তোমাকে যে এতটুকু বেলা থেকে জানি দিদিমণি। কর্ত্তাবাবু বরাবরই কইতেন, রব্বানি, হিতেন আর সুনীলা এরা দু'টি আমার ছেলে! এদের এত বুদ্ধি, এত বিবেচনা, এত দয়া-মায়া......ইত্যাদি।

রব্বানি বাহির হইয়া যাইতেছিল, সুনীলা তাহাকে পুনরাহ্বান করিয়া কহিল—এ সময় বাবা যে তোমায় কি দিতেন রব্বানি। কৈ, তা ত তুমি বল্লে না?

সে হ'বে। কর্ত্তাবাবু আসুন-না।

না, না। বাবা আজ উপস্থিত নেই বলেই কি তাঁর নিয়মিত কাজগুলি বাদ পড়বে! তা কি হয়? কি দিতেন, বল রব্বানি? না বল, বাবার হিসেবের খাতা ত আমার কাছেই আছে, দাঁড়াও......আনি।

রব্বানি বলিল—দিদিমণি, বাবু নতুন কাপড়, একটা জামা, একটা টুপি দিতেন, আর নগদ দশটা টাকা দিতেন।

তুমি একটু দাঁড়াও—বলিয়া সুনীলা বাহির হইয়া গেল। মিনিট তিনেক পরেই একখানা বাঁধা খাতা হাতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—আঠারো টাকা, না, রব্বানি? এই নাও।

রব্বানি অতি বৃদ্ধ হইয়াছে। যাইবার কালে সে জড়িতস্বরে অনেক কথাই বলিয়া গেল, কেহই সেগুলি স্পষ্ট বুঝিতে না পারিলেও, যতটা তাহাদের কাণে গিয়াছিল তাহাতেই একজনের মুখ লজ্জায় গোলাপ বর্ণ ধারণ করিল, আর একজন সেই মুখের পানে মুগ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া স্থবিরের মত বসিয়া রহিল।

সুনীলা তাহা দেখিয়াই আবার লাল হইয়া বলিল—আপনি এখন নীলার কাছেই বস্‌ছেন ত খগেন বাবু! আমি স্নান টান করে আসি।

খগেন যেন নিদ্রোত্থিতের মত বলিয়া উঠিল—তাই এসো।

ঘণ্টা দুই পরে সুনীলা যখন ঘরে ঢুকিল, খগেন চমকিতস্বরে বলিয়া উঠিল—পূজো করছিলে না-কি সু?

সুনীলা হাসিল। মাথাটী নাড়িয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল—পূজো করব, মন্ত্র ত জানি নে, খগেন বাবু! রান্নাঘরে ছিলুম। নীলা জাগে নি?

না। কিন্তু রান্নাঘরে গরদ পরে' ঢুক্‌তে হয়, এ তুমি জান্‌লে কোত্থেকে?

সুনীলা চেয়ারটা টানিয়া বসিয়া পড়িল। হাস্যফুল্লস্বরে কহিল—সেখানে থেকেই জানি না কেন! জানি ত!

তা না-হয় জান। দেখ্‌তেই পাচ্ছি। কিন্তু যখনই যাও রান্নাঘরে, তখনই কি গরদ পর? কখনো দেখি নি কি-না, তাই জিজ্ঞাসা করছি।

তখন কেন ঢুক্‌ব? তখন ত আমি রাঁধি নে, রব্বানি রাঁধে। সত্যি বল্‌চি আপনাকে, কেন যে বাবা একটা মুসলমানকে দিয়ে রান্না

রান্নার কাজ করান, এ আমি কিছুতেই বুঝতে পারি নে। এতে সুখই বা কি হয় তা'ও ত জানি নে।

আমি জানি সু।

কি? রব্বানিকে স্নেহ করেন, তাই? সে ত অন্য কাজ দিয়েও রাখ্‌তে পারতেন। তা নয়, খগেন বাবু। অন্য কারণ আছে এর।

খগেন বলিল—আছেই ত, সু—তাঁর অন্য উদ্দেশ্য। তিনি চান্ পৃথিবীতে নতুনত্ব স্থাপন করতে।

নতুনত্ব স্থাপন করতে? ঐ বুঝি নতুনত্ব? কি কথাই বল্লেন! ও-ত হাজার হাজার লোকে করে।

খগেন বলিল—ও নতুনত্ব না। তিনি ত চান-না, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কারু সঙ্গে তাঁর কোন যোগ রাখ্‌তে।

কি রকম?

কি রকম? দেখ, তিনি গঙ্গাস্নান করেন স্বাস্থ্যের জন্য, করেন ত? আবার মুসলমানের রান্নাই খান্—কেন? তোমরা তাঁর মেয়ে, লেখাপড়া, গান-বাজনা শিখিয়েওছেন, বয়েসও হয়েছে কিন্তু তিনি পরম নিশ্চিন্ত।

সুনীলা সাশ্চর্য্যে জিজ্ঞাসিল—এতে চিন্তার বিষয় কি আছে, খগেন বাবু?

নেই? তোমাদের তিনটি বোনের মত তিনটি মেয়ে যদি অন্য কোন পরিবারে থাকৃত, বাপ মা তাদের কি করত জানো? রেতে দিনে ভেবে ভেবে তাদের পেটের ভাত চাল হ'য়ে যেত। দেহে অস্থি আর চর্ম্ম সার হ'তো।

কেন?

খগেন বিস্ময়ে প্রথম দুই তিন মিনিটকাল তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া, বলিল—বিয়ের বয়স যে পার হ'য়, সু!

হ'লই বা পার! কারই বা ক্ষতি তা'তে?—কথাটার শেষ অবধি কিন্তু সে মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া রাখিতে পারিল না।

খগেন বলিল—বাংলা দেশে বোধ করি একমাত্র জ্যাঠামশাই এক পিতা, যাঁর সঙ্কল্প হ'চ্ছে......সে ইতঃস্তত করিতে লাগিল।

সুনীলা ব্যগ্রস্বরে জিজ্ঞাসিল - কি সঙ্কল্প?

খগেন বলিতে লাগিল—বাংলাদেশে মেয়ের বিয়ে দেওয়া কি রকম কষ্টকর ও ব্যয়সাধ্য জান ত? আমার নিজের একটি বোন্ ছিল সু......

বাধা দিয়া সুনীলা কহিল—সে ত আমি জানি খগেন বাবু! বাবা কতবার ব'লেছেন সে-কথা। বলতে বলতে বাবার চোখ দিয়ে জল পড়তো!

খগেন ম্লানস্বরে কহিল—জ্যাঠাম'শায় বলেন, কেন? যে দেশে এত আয়াসসজনক কাজ-এ, মেয়ের বাপেরা কেন মেয়েদের কৌমার্য্য ব্রত শেখায় না, তাই ভাবি। যে দেশে বৈধব্য ব্রত ঘরে ঘরে পরম নিষ্ঠার সঙ্গে পালিত হ'চ্ছে সে-দেশে কুমারী রাখা কি সম্ভব নয়? অন্ততঃ আর কেউ না করুক, আমি সে চেষ্টা করব। আমার মেয়েদের আমি অনূঢ়াই রাখব এবং তাঁর ইচ্ছায় যদি সফল কাম হই, তখন দেশের অনেকেই সাহস পাবে; অনেক মেয়ে, অনেক মেয়ের মা-বাপ মস্ত বিপদ থেকে রক্ষা পাবে।......সু, এই জন্যেই গঙ্গাস্নান করলেও, তিলক ফোঁটা কাটলেও, মুসলমানের হাতের ভাতেও তাঁর বাধত না।

সুনীলা কথা কহিল না। খগেন কথাটাকে এইরূপে শেষ করিল যে, তাহার ভগ্নীর শোচনীয় মৃত্যুর পর হইতেই তাঁর সঙ্কল্প দৃঢ় হ'য়েছিল,—এ কথা হেরম্বনাথ অনেকবার খগেনকেও শুনাইয়া দিয়াছেন।

কথাটা সে শেষ করিল বটে, কিন্তু তাহার শ্রোতাটির মনের মধ্যে মাকড়সার মত কথাগুলো এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত জাল বুনিয়া বেড়াইতে লাগিল। অবশেষে সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল—আপনি জানেন না, খগেন বাবু, দিদির সম্বন্ধে তিনি মত বদলেছেন।

খগেন বলিল—সম্ভব।

সুনীলা আনত মুখখানি নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার সাদা হাত দুখানিতে এবং কপোলের যে অংশটা চোখে পড়িতেছিল তাহাতেই স্বেদবিন্দু দেখিয়া খানিক পরে খগেন বলিল—তা এই গরমে গোঁসাই ঠাকুরুণ সেজে বসে রইলে কেন? কপালটি যে ভিজে গেছে, ঘামে। পাখাটা খুলে দেব? না হয় ছেড়ে এসো।

না। পাখার দরকার নেই। আর ছাড়তে ত এখন পারব না। রান্নাঘরের কাজ ত আমার শেষ হয় নি, এখনও।

খগেন হাসিয়া কহিল—একলা মানুষ, কত সময় লাগে রাঁধতে?

সুনীলা বলিল—একলা কৈ? আপনাকেও যে খেতে হবে আজ! নৈলে কি এ-সব পরেছি আমার নিজের জন্যে! আজ না খেয়ে পার পাবেন ভেবেছেন?

খগেন গম্ভীরভাবে বলিল—না তা ভাবি নি। তবে এতটা না করলেও চল্‌ত?

কি না করলে চল্‌ত?

এই পট্টবস্ত্র পরিধান……ইত্যাদি।

সুনীলা হাসি হাসি মুখখানি বাঁকাইয়া বলিল—তা চল্‌ত বৈ-কি! ম'শায়ের যে হিঁদুয়ানী, কখন্ বলে বস্‌বেন, ছোঁয়া-নেপা, নোংরা-সোংরা, ও আমার চল্‌বে না।

খগেন বলিল—গঙ্গাজলেই তা'হলে পাকটি করছ?

নিশ্চয়ই। সে গঙ্গা হরিদ্বারে নামিয়া, কত নগ-নগরী ভ্রমন করিয়া, কত নর-নারীকে ধন্য করিয়া, ব্রহ্ম-কমণ্ডলু উচ্ছ্‌লি', হরের জটায় জোট্ খাইয়া অবশেষে টালার ট্যাঙ্কে উঠিয়া 'পতিতোদ্ধার ও প্রাণোদ্ধার' করছেন, সত্যি বল্‌ছি খগেনবাবু—সেই জলেই পাক করছি। দোষ হয় নি ত?

খগেন কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য সহকারে কহিল—দাঁড়াও। কাপড়টা ত গরদই পরেছ, বেশ দামী জিনিষই দেখছি, সেমিস্‌টা যে সুতিরই! এঃ—নাঃ—তবে আর হ'ল না খাওয়াটা, দেখছি। নাঃ।

সুনীলা চেয়ার ছাড়িয়া খগেনের পাশে আসিয়া বলিল—তাই বুঝি? কি চোখ! এটা সুতি? সাদা সিল্ক বলে!……বলিয়া সে স্কন্ধ দেশটি দেখাইয়া দিল।

খগেন পূর্ব্ববৎ কহিল—এই যা—আমাকে ছুঁলে, ঐ কাপড়ে হাঁড়ী ধরবে ত। তবেই হ'য়েছে!

সুনীলা রাগিয়া বলিল—কি বিদ্যে! তসর গরদে দোষ আছে বুঝি? না খান—না খাবেন, অত খুঁত ধরলে আমি বাঁচি নে।

তবে না-হয় খাবই'খন। বলিয়া সে হাসিয়া ফেলিল।

সুনীলা হাসিয়া খগেনের পৃষ্ঠে ক্ষুদ্র একটি কিল মারিয়া উচ্ছ্‌ল

হাসিতে মুখখানি ভরিয়া বলিল—হিঁদুয়ানী দেখে আর বাঁচি নে!

বোধ করি সেই ক্ষুদ্র কিলের শব্দেই ফেণিলার নিদ্রাটি ভাঙ্গিয়া গেল; সে চক্ষু চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল—খগেনবাবু, আমিও আর কারু হাতে খাব না, আমিও হিন্দু হব।—সুনীলা পাখার সুইচ্ বোর্ডের কাছে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

খগেন তর্ক করিল না। সুনীলার কাছে শুনিয়াছিল, এই সম্পর্কীয় তর্কেই সে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং তাহাতেই প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হয়। একটু হাসিয়া সে ব্যঙ্গ করিয়া কহিল—কি রকম হিন্দু নীলা? দ্বিজুবাবুর "এবার হয়েছি হিন্দু" না-কি? বলিয়া সে সর্ব্বজন পরিচিত গানটার একাংশ সুরে গাহিল;—

আর মুরগী খাই না, কেন-না পাই না!
("তবে) হয় যদি বিনা খরচেই,
আহা! জানত আমার স্বভাব উদার,
(তা'তে) গোপনে নাইক অরুচি!

ফেণিলা সোৎসাহে কহিল—গান খগেনবাবু, সবটা গান! আপনার মুখে হাসির গান আমার বড় ভাল লাগে!

খগেন গাহিল। একটি নয়, দুইটি, তিনটি, 'রিফর্ম্মড হিন্দু', 'হ'ল কি!' শেষের গানটার একটা কলি খগেন বার বার গাহিতে লাগিল;—

হোল কি! এ হোল কি! এত ভারি আশ্চর্য্যি।
বিলাত ফেরতা টানছে হুকা, সিগারেট খাচ্ছে ভশ্চার্য্যি।

* * * *

ছেলেরা সব চশমা প'রে বসে আছে কাটখোট্টা,
সাহেবরা সব গেরুয়া পরছে, বাঙালী নেকটাই হ্যাট কোট্‌টা।

খগেন গীত শেষ করিতেই ফেণিলা বলিল—আপনি দেখেছেন খগেন-বাবু? সাহেবকে গেরুয়া পরতে, আর বাঙালীকে নেকটাই হ্যাট কোট-টা পরতে?

শেষেরটা ত আখছার দেখছি। গোড়ারটা দেখিনি বটে, তবে ঐ Salvation army'র ওরা…

আমি দুই দেখেছি। আপনার বন্ধু বীরেন্দ্রবাবুকে দেখেছেন আপনি, খদ্দর প'রে'? আর আপনার সিংহ…

খগেন হাসিয়া বলিল—ঠিক বলেছ নীলা।

দুই মিনিট পরে ফেণিলা জিজ্ঞাসিল—আপনার সঙ্গে তাঁর দেখা হয় খগেনবাবু?

খগেন বলিল—বীরেন্দ্রবাবুর? হয়েছিল দু'দিন। মাঝে মাঝে হয় নীলা!

নীলা পাশ ফিরিতে ফিরিতে কহিল—তাঁকে, দেখা হলে শুধু এই কথাটি বল্‌বেন খগেনবাবু. যে আমাদের বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে তিনি যা বলেছিলেন,আমরা সাধ্যমত তাঁর সব কথাগুলিই রক্ষা করেছি। বলবেন?

খগেন একটুখানি অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল, ফেণিলার প্রশ্নে চমকিয়া বলিল—অ্যাঁ?

ফেণিলা বলিল—তাঁকে বলবেন, টেবিল চেয়ারে বসে মজলিস করা ছেড়ে দিয়েছি। আজ যদি তিনি এ বাড়ীতে আসেন, এই পরিবর্ত্তন দেখে নিশ্চয় খুসীই হবেন।

সে চুপ করিতেই খগেন বলিল—দেখা হলে একদিন তাঁকে ডেকেই আন্‌ব নীলা, কি বল ?

ফেণিলা ত্রস্তে বলিয়া উঠিল—না, খগেনবাবু, ঐ কাজটি করবেন না, দোহাই আপনার। আমি তাঁকে দেখাবার জন্যে করি নি ত, যে তাঁকে ডেকে দেখিয়ে বাহবা নেব। আমার ভালো লেগেছে, করেছি। তবে তিনিই না-কি গুরু, তাই তাঁকে খবরটা দিলুন। আপনি বল্‌বেন ?

খগেন বলিল—তা বল্‌ব। কিন্তু গুরু যদি নিজেই আস্‌তে চান ?

ফেণিলা কি ভাবিয়া লইল। একটু পরে বলিল—তা তিনি বলবেন না, কখনই বল্‌বেন না। তাঁর মত দৃঢ় চিত্তের পুরুষ, কোন প্রলোভনেই ভুলবেন না—আমি জানি, আমি জানি।

খগেন উত্তরোত্তর বিস্মিতই হইতেছিল। সে ইতোমধ্যেই অনেক কথা শুনিয়াছিল, কতকটা নিজের মনেই গড়িয়া লইয়াছিল। বলিল—গুরুকে ত গুরুদক্ষিণা নিতে হয় কি না তাই বল্‌ছি, নইলে যে অসম্পূর্ণ থেকে যায় দীক্ষা !

সে কি আমিও না জানি, খগেনবাবু ! কিন্তু, গঙ্গাজলে কি ফুল দিয়ে পূজো করতে হয় ? গঙ্গাজলেই গঙ্গা পূজো হয়। আমার কাজের দ্বারাই তাঁর কাছে দক্ষিণা পৌঁছে যাবে। সেই যে কি গৃহদীপ্তয় না-কি বলে, তাই করব।

খগেন সহাস্যে কহিল—কোন্‌ গৃহ ?

ফেণিলা বলিল—এই গৃহ। আর কোথা পাব, খগেনবাবু ? এই একাঘরেই, একলা, চিরদিন শেষ দিন পর্য্যন্ত......দেখি, কি পারি !

একা কেন ?

দেখবেন। বলিয়া সে একটুখানি হাসিল। তাহার রোগ'কাতর শুষ্ক মুখের মৃদু হাসিতেই কিন্তু বেচারা খগেন ঘামিয়া উঠিল।

সুনীলা আসিয়া বলিল—যান খগেনবাবু, স্নান করে আসুন! এই যে নীলা, একটু দুধ আনি ভাই?

হ্যাঁ ভাই গোঁসাই, আনো ভাই, দাও ভাই, খাই ভাই!

তিনজনেই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

স্বর্ণমুষ্টি ভিক্ষা।

সুনীলা বামহস্তের তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা পাণ ক'টি চাপিয়া ডানহস্তে চুণ লাগাইতেছিল। হঠাৎ মিলিত কণ্ঠের সঙ্গীতের স্বরে উৎকর্ণ হইয়া বলিল—কিসের গান বেরুল আবার?

খগেন বলিল—মহরমের।

সুনীলা বলিল—মহরমের আবার গান বেরোয় বুঝি?

খগেন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই গানের কতকাংশ তাহাদের কর্ণে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। সুনীলা জানেলায় আসিয়া দাঁড়াইল। একদল ছেলে, পতাকা হস্তে হার্মোনিয়ম বাজাইয়া, গান গাহিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে। সে শুনিল:—

তোর ক্ষুদ্র বুকের সাহস টুক্
ওরে, মায়ের দুঃখে মলিন মুখ,

সবার সাথে মিলিয়ে রে ভাই
একটি কণা ভিক্ষা দেরে—
মুছে তোদের চোখের জল।

শুধুই কেঁদে, শুধুই কেঁদে কি কাজ ওরে করবি তোরা বল।

বৃথাই হ'বে, ব্যর্থ হ'বে—তোদের সোণার চোখের জল।

তাহাদের মধ্যে দুইটি বালক একটা ঝুলিতে চাল, পয়সা টাকা নোট্ প্রভৃতি লইয়া জানালার নীচে আসিয়া করুণস্বরে গাহিল—একটি কণা ভিক্ষা দেরে, মুছে তোদের চোখের জল।

সুনীলা বামহাতে চোখ্‌টা মুছিয়া খগেনের দিকে ফিরিয়া কহিল—কি দেব খগেন বাবু? সে জিজ্ঞাসা করিল বটে, কিন্তু উত্তর শুনিবার মত ধৈর্য্য তাহার ছিল না। ছুটিয়া উপরে উঠিয়া গেল এবং দু'মিনিটের মধ্যেই মুষ্টিপূর্ণ করিয়া জানেলা গলাইয়া ছেলেদের ঝুলিতে ফেলিয়া দিল।

ছেলেরা গাহিল—

ওরে, চাই নে শুধুই সোণা-দানা,
চাই রে তোর হৃদয় খানা
দে, তোর মনের শক্তি হৃদের ভক্তি
বাড়ুক মোদের বুকের বল্। *

ছেলেরা গাহিতে গাহিতে ক্রমশঃ বহুদূরে চলিয়া গেল। তাহাদের মিলিত কণ্ঠস্বর যখন আর শোনা গেল না, সুনীলা খগেনের দিকে চাহিয়া বলিল—হাত গুটিয়ে বসে কেন? কি-দেব? না? বাঃ বাঃ।

---

* সম্পূর্ণ গীতটি মৎপ্রচিত্ত "দিশেহারায়" আছে।

প্রীতির

নিদর্শন

কি দিলে স্থ ?

আমার হারছড়াটা !—কি দেব. বলুন ? না বল্লে শুন্‌ছি নে। তবে বুঝি মুখে করবার যো নেই ? তাই হ'য়েছে – বলিয়া সে ম্লানমুখে খগেনের অভুক্ত আহার্য্যের পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল। খগেন বলিল—তা নয়, স্থ, তা নয়। আর আমি খেতে পারছি নে।

কোত্থেকে পারবেন বলুন ? আনাড়ীর রান্না কেই বা পারে খেতে !

বল্‌ছি তা নয়—তবু ঐ কথা বল্‌বে !

বল্‌ব না ত কি করব ? ঐ খান আপনি ? ঐ আপনার খাওয়া ? ঐ খেয়ে আপনি দশটা ছ'টা আফিসে মসীযুদ্ধ করেন ?

খগেন এক গাল হাসিয়া বলিল—মসীযুদ্ধ করে যে সব বীর তারা অল্লাহারী হয় তা জান না বুঝি ? সত্যি স্থ, ক্ষুধা যে কি তা তারা ভুলেই যায়।

সুনীলা তাহার মুখের প্রতি লক্ষ্য করিয়া গম্ভীর হইয়া জিজ্ঞাসিল কেন ?

খগেন উত্তর দিল—ক্ষিধেটা কি জান ত ? যখন ক্ষিধে পায় একটা লালা ক্রমাগত বেরিয়ে ষ্টমাক্‌টাকে ভর্ত্তি করতে থাকে এই জিনিষটাই খাদ্য হজম করে। এখন, বাবুরা সেই যে ন'টায় খেয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে গিয়ে অসি (!) তুলেছেন তা'তেই আবার ক্ষুধা জন্মাল, লালাও নির্গত হ'তে লাগল কিন্তু সেই দু'টার আগে ত আর টিফিণ হয় না, কাজেই লালাটা ততক্ষণে নাড়ীগুলিকেই এসিডে পুড়িয়ে জীর্ণ করতে লাগ্‌ল। এই রকম করে' করেই লালার তেজও কমে যায়, হজমও কমে যায়—ক্ষিধে আর জান্‌বেন তাঁরা কোত্থেকে, বল ?

দুঃখে সুনীলার মনটি ম্রিয়মান হইয়া গেল। সে কিছুক্ষণ কথাই কহিতে পারিল না। তারপর আস্তে আস্তে মুখটি তুলিয়া অব্যক্তকণ্ঠে কহিয়া উঠিল—তবু সেই—চাকরীই করতে......প্রবল বাষ্পোচ্ছ্বাসে কথাটা আর শেষ হইল না।

খগেন ম্লানমুখে কহিল—নইলে উপায় কি বল!

সুনীলা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, উপায় ঢের আছে। আপনি যদি দেখ্‌তে না চান্—অন্য কথা।

খগেন হাসিল, কহিল—ঢের আছে। বল-কি? আমি ত একটাও দেখ্‌তে পাচ্ছি নে। আমার এ চশমাটার পাওয়ার বোধ করি কমে গেছে, একবার টেষ্ট্ করিয়ে নিতে হ'চ্ছে—যদি দেখ্‌তে পাই।

সুনীলা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কহিল—আপনার মত অন্ধ চশমা পরে শোভার জন্যে, দৃষ্টি বাড়াবার জন্য নয়, খগেন বাবু! আপনি যদি না দেখ্‌তে চান্, কারু সাধ্য নেই দেখায় আপনাকে।

খগেন এবার আর হাসিল না। গম্ভীর মুখেই বলিল—অনেক আছে বল্‌ছ ত! আচ্ছা একটা শুনি—দেখি—দেখ্‌তে পাই কি-না?

কেন—আপনি ডাক্তারী পড়ুন না। নিজের ইচ্ছে রয়েছে, জ্ঞানও রয়েছে কতক। তাই কেন—করুন না। চাই কি একবার বিলেতটা ঘুরে এলে......

খগেন কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সহিত কহিল—রোস, রোস, অত তাড়াতাড়ি নয়। না পড়ে বিদ্বান হওয়া, আর না শিখে ডাক্তারী করা—দুই-ই চলে; কিন্তু পড়তে গেলে, আর বিলেত যেতে হ'লে কতগুলি টাকার দরকার জান?

সুনীলা জিজ্ঞাসিল—কত ?

খগেন উদাস-ভাবে জবাব দিল, ঠিক কত তা জানি নে, তবে শুনেছি হাজার পনেরো নিশ্চয়ই, কিছু বেশীও হ'তে পারে।

সুনীলা মনে মনে কি ভাবিয়া লইয়া মুখ তুলিল ; বলিল, এই টাকা টার আপনি জোগাড় করতে পারেন না—আপনার আত্মীয় বন্ধুর কাছে ?

এইবার খগেন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল ; হাসির বেগ কমিলে বলিল—আমার দু'রকমের আত্মীয় বন্ধু আছেন, সু। এক হ'চ্ছেন, তোমাদের ঐ সিংহ সাহেবের মত ! কি-বল চাইব, মিঃ সিংহের কাছে ? বলত তুমি, চাই। চাইব ?

সুনীলা মহা-বিরক্তির সহিত কহিল—আর ?

খগেন বলিল—আর ! আর আমার নিঃস্ব খুড়ীমা। যাঁর একমাত্র কন্যার বিবাহে আর দশ দিনের মধ্যে যদি আমি অর্থ-সাহায্য করতে না পারি—জাতি-চ্যুতির সম্ভাবনা আছে।

সুনীলা ব্যগ্র হইয়া কহিল—কৈ—এ কথা ত আমাদের কোনদিনই বলেন নি আপনি ?

উদাসীনের মত খগেন বলিল—না। বলি নি।

সুনীলার মুখ গম্ভীর হইল ; সে বলিল—তা বল্‌বেন কেন ? আমরা আপনার কে-যে বলবেন !

কিন্তু এ আঘাতের সব-টুকু বেদনা সে নীরবেই সহ্য করিয়াই লইল। সুনীলা তাহাতে তাহার চেয়েও বেশী বেদনা পাইয়া, ব্যথা-ক্ষুব্ধস্বরে বলিল—তা বল্‌বেন কেন ? অজানা-অচেনা কোথাকার কে পর আমরা, আমাদের বল্‌বেন কেন ?

প্রীতির নিদর্শন

খগেন সাতিশয় বিস্ময়ে কয়েক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া বলিল—তোমরা অজানা-অচেনা পর যদি, আপনার কে আমার তাই শুনি ?

সে আপনিই জানেন।

হাঁ, সে আমিই জানি। বলিয়া একটুখানি চুপ করিল। আবার বলিল—না সু, কত বল্‌ব ? কত শুন্‌বে ? দুঃখীর কথা যত শুন্‌বে, ব্যথা ততই বাড়বে। আর একটা ত নয় !

আবার কি ?

একজনের কিছু ধারি। যদিও শোধবার মত সঞ্চয় নেই, তবুও তার দেখা পেলে একটা চুক্তি লেখা পড়া করে'ও দিতে পারি। তার দেখাই পাচ্ছি নে।

সুনীলা জিজ্ঞাসিল—সে-কে ?

খগেন জবাব দিল— এক কাব্‌লীওলা।

এক মুহূর্ত্ত পরে সুনীলা জিজ্ঞাসিল, কত টাকা ?

দু'শো। যার জন্যে……

জানি। তা, দেখা ক'রে টাকাটা ফেলেই দিন না ছাই। ও-আপদ বালাই ধার রেখে লাভ ত নেই।

খগেন হাসিয়া বলিল—কিছু না। কিছু না ! তবে টাকাটা নেই— এই যা !

সুনীলা মনে মনে আবার কি ভাবিয়া লইল, বলিল—সেই চেক্‌টা ত রয়েছে এখনও। সেইটা ভাঙ্গিয়ে……

তোমার টাকা ?

সুনীলা এ-কথার জবাব দিল না। খগেন পুনরায় কহিল—না সু, আমি একটা লেখাপড়া করেই দেব, তার দেখা পেলে।

কেন, নেবেন না? তা নেবেন কেন? আমরা ত……বলিতে বলিতে সে কাঁদিয়া ফেলিল। চোখের জল গোপন করিতে দাঁড়াইয়া উঠিল এবং আলমারীটার দ্বার ধরিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া, শেষে বলিল—নিন্, খাওয়া ত হ'য়েছে, হাত ধুয়ে ফেলুন-গে।

খগেন উঠিল না। সুনীলার চোখের জল না দেখিলেও এইটাই সে অনুমান করিয়াছিল, তখনি তাহাকে উষ্ণকণ্ঠে কথা কহিতে শুনিয়া বলিল—বারবার এ কথায় আমি কষ্ট পাই, জান সু?

সুনীলা কি-জানিত বলা যায় না, সাড়া দিল না। কয়েক মুহূর্ত্ত নিশ্চল প্রতিমার মত দাঁড়াইয়া রহিয়া, অকস্মাৎ সজলকণ্ঠে কহিল—মুখে কষ্ট পান, খগেন বাবু, মনে নয়। মনে কষ্ট হ'লে আমাকে—আমাদের কষ্ট দিতে বাজত আপনার।

তোমাদের কষ্ট দিতে?

সুনীলা একেবারে খগেনের দিকে ফিরিয়া ভীষণ তেজের সহিত বলিয়া উঠিল—কালই মাঠে গিয়ে তাদের খুঁজে টাকাটা ফেলে দিয়ে আসুন।

খগেন পরিতৃপ্তির হাস্যে মুখটি প্রফুল্ল করিয়া কহিল—দিতে হ'বে? তোমারও, আমারও—কি বল? আচ্ছা—যাব।

তারপর—আচ্ছা, কত টাকা হ'লে আপনার খুড়ীমার মেয়েটীর বিবাহ হয়, বলুন ত?

সে'টাও দেবে না-কি?

কত টাকার দরকার—বলুন না শুনি ?

খগেন বলিল—প্রায় সতেরো-শো।

সুনীলা খগেনের সামনে বসিয়া, হিসাব করার মত বলিতে লাগিল—সতেরো শো, আর পণেরো, না, না—ও'টা বিশ,—এই একুশহাজার সাত শো টাকা হল, না ?

খগেন কিছুই বুঝিতে পারিল না। বলিল—একুশ হাজার সাতশো কি ?

কেন—আপনিই ত বল্লেন—পণেরো !

পণেরো ! পণেরো কি বল ? কাব্‌লীর-সে ত দু'শ !

সুনীলা আগুন হইয়া কহিল—সে দু'শ ত আপনার নামে চেক্ দেওয়া রয়েছে।

খগেন বলিল—তবে ?

সুনীলা জবাব দিল—আহা ! বিলেতের খরচটা ধরতে হ'বে না ! পণেরো বলেছেন-বলেই পণেরোতেই যে হ'বে তার ঠিক কি ! কিছু বেশী রাখাই উচিৎ ত ! তা, এই টাকার ওয়ার বণ্ড দেব—আজই আপনি সে-গুলো ভাঙ্গাবার চেষ্টা করুন, ব্যাঙ্কে।

বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে একমাত্র সুনীলা ছাড়া আর কাহারো মুখে এ কথাটা শুনিলে খগেন কেন, যে-কোন সুস্থচিত্ত ব্যক্তি পরিহাস কল্পনা করিয়াই সশব্দে হাসিয়া উঠিত ! কোথাকার কে, না—আত্মীয় না—কিছু, এতটা টাকা তাহাকেই দিতে চায়—এ শুনিলে 'অর্থমনর্থম'এর জগতে কে-ই বা বিশ্বাস করিয়া টাকাটা লইতেই হাত বাড়াইতে পারে !—কিন্তু খগেন হাসিলও না। অবিশ্বাসও করিল না। বরঞ্চ সে যা করিল, ঠিক তার

বিপরীত। সে আসন ছাড়িয়া সোজা দাঁড়াইয়া উঠিল। অনেকক্ষণ নতাননা পূর্ণাঙ্গী যুবতীর ঈষোন্নত-মুখের দিকে চাহিয়া স্খলিত বচনে কহিল— কিন্তু লোকে কি বলবে সু ?

সুনীলা সে কথার উত্তর দিল না। সে অন্যদিক দিয়া কথাটাকে পরিষ্কার করিতেই বলিল—আমার নামের আর নীলার নামের কাগজ আমার কাছেই আছে। আমি আমারগুলো 'এনডোর্শ' করে দিই— আপনাকে—আপনি বেরিয়ে পড়ুন। পথে বাবার সঙ্গে দেখা করে ত যাবেনই। আমরাও না-হয় লক্ষ্ণৌ অবধি সঙ্গেই যাব। কি বলেন ?—যেন সমস্তই ঠিক হইয়া গেছে, টিকিট কিনিয়া বোম্বাই ডাক-গাড়ীতে চড়িয়া বসিলেই হয়, এমনিভাবে সুনীলা কক্ষ ত্যাগ করিয়া যাইতেছিল, খগেন তাহার সামনে আসিয়া অত্যন্ত করুণস্বরে কহিল,- একে কি দান বলব ?

সে আপনি অভিধান খুজুন গে—বলিয়া সুনীলা একটু হাসিয়া, না, না—মুখখানি ভার করিয়া উপরে উঠিয়া গেল। খগেন-ও এক মিনিট মূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া আর একটা দরজা দিয়া হাত মুখ ধুইতে স্নান কক্ষে প্রবেশ করিল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

'নিদর্শন'

খগেন নিদ্রিত ফেণিলার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া দৈনিক সংবাদপত্রখানি পাঠ করিতেছিল, দ্বারের সম্মুখে আসিয়া সুনীলা ডাকিল—একবার এদিকে আসুন ত !

খগেন ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, রাশি রাশি কাগজপত্র ছড়ানো রহিয়াছে, মাটীতে বসিয়া সুনীলা সেইগুলিই গুছাইয়া তুলিতেছে। তাহাকে দেখিয়াই বলিল—এই ক'খানা মিলিয়ে দেখুন ত—কত হয় ?

খগেন সবিস্ময়ে তাহার মুখের পানে চাহিয়া বলিল—এত তাড়া ?

যা বল্‌ছি—করুন না আপনি।

খগেন কাগজ পেন্সিল লইয়া যোগ দিয়া বলিল পুরোপুরি বাইশ হাজার হ'য়েছে।

সুনীলা অন্য কাগজগুলি ভাঁজ করিতে করিতে বলিল—কিন্তু দেশে গিয়ে আপনার বোনটির বিবাহ দেওয়া বোধ করি হ'য়ে উঠ্‌বে না। আপনি আপনার খুড়ীমা'কে টাকাটা পাঠিয়ে দিয়ে লিখুন যে, আপনি এখানে থাকৃছেন না। হ'বে না তা'তে ?

খগেন বলিল—তা না হয় হো'ল, কিন্তু—

সুনীলা সুস্পষ্ট সহজকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—আপনার ও-কিন্তু টিন্তুগুলো থাক এখন। যান্, চট্ ক'রে' জামাটামাগুলো গায়ে দিয়ে নিন্—দেড়টা বাজে, ব্যাঙ্কিং তিনটেয় বন্ধ হয়—জানেন ত ?

তা ত জানি। তবে……

সুনীলা তর্জ্জনী উত্তোলন করিয়া ক্রোধের সঙ্গে বলিল—ওগুলো পরেই হবে'খন। যান্ যান্—

তবুও খগেন উঠিতেছে না দেখিয়া সে তিক্তস্বরে তিরস্কার করিল—আপনি কি ভেবেছেন—বলুন ত? কথাটা বিশ্বাস হচ্ছে না আপনার?

খগেন সাড়া দিল না, নতমুখে নীরবে বসিয়া রহিল। আর একজন তাহার মুখের দিকে চাহিয়াই অভিমানে ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া বলিল—বারবার এক কথা ভালো লাগে না আমার! উঠ্‌বেন কি—না তাই বলুন।

খগেন বলিল—না সু! এ হ'তে পারে না, হ'বে না।

সুনীলা দুই মুহূর্ত্ত স্তব্ধভাবে বসিয়া থাকিয়া উগ্র সজলকণ্ঠে কহিল—হ'তে পারে, হয়-ও—আপনি কেবল……সে চুপ করিল।

খগেন বলিল—কি করে হ'তে পারে বল?

সুনীলা কথার জবাব দিল না, শুনিতে পাইল কি-না তাহাও ঠিক বলা যায় না। সে শুধু স্তম্ভিত আড়ষ্টের মত কাগজগুলায় চোখ রাখিয়া বসিয়া রহিল। এবং তাহার সারা মুখখানার রঙ যে ফ্যাকাসে হইয়া শেষে কালীবর্ণ ধারণ করিল, তাহা দেখিয়াই খগেন অবরুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—এত দয়া কেন করলে সু? অপাত্রে দান করে কে কবে কোথায় সুখী হ'তে পেরেছে?

সুনীলা মুখ না তুলিয়াই অশ্রুপূর্ণ জড়িত কণ্ঠে কহিল—সে আমার ইচ্ছে।

খগেন বলিল—কিন্তু তুমি না-হয় পাত্র অপাত্র বিবেচনা না করেই দান করছ, আমি যে নেব, আমার সে শক্তি কৈ? আমার যে শক্তি নেই সু। হাত পাতায় যে শক্তি, যে অধিকার থাকার দরকার, আমার যে……

কথাটা শেষ পর্য্যন্ত শুনিবার ধৈর্য্য সুনীলার ছিল না। সে মাঝখানেই মুখ তুলিয়া উত্তপ্ত কণ্ঠস্বরে খগেনের কণ্ঠ ঢাকিয়া দিয়া বলিল—কিন্তু নীলার কাছে এসে চাইতে, হাত পাততে অধিকার ত পূর্ণ মাত্রাতেই বজায় ছিল! কৈ-তার বেলা ত এত যুক্তি তর্ক করেন নি আপনি।

খগেন শরবিদ্ধ পক্ষীটির মত ছটফট করিয়া উঠিল। বলিল—না সু, সে'দিন তোমার কাছেই এসেছিলুম। আমি মিথ্যে বলি নি তোমাকে।

সুনীলা কথা বলিল না। কিন্তু সে-যে অবিশ্বাস করিয়া চুপ করিয়া গেল, এ'ও খগেনের মনে স্থান পাইল না। সে শুধু উন্মুখ-মুখ-চোখ তুলিয়া সুনীলার আনত মুখের পানে চাহিয়া রহিল। পাঁচ সাত মিনিট কাটিয়া গেল, তবুও উভয়েই নীরব। তখন খগেনই বলিল—এতটা টাকা, যা বোধ করি সারাজীবনে আমি রোজগার করতেও পারব না এবং এইটাই বোধ করি তোমার সারাজীবনের সম্বল—একি আমি নষ্ট করতে পারি? কি দরকার আমার বিলেত গিয়ে? না-ই বা পড়লুম! বেশ ত আছি।

সুনীলা কটুকণ্ঠে কহিল—বেশ আছেন?

খগেন মলিন মুখে কহিল—মন্দ কি? কেটে যাচ্ছে ত!

সে ত বনে কুকুর শেয়ালেরও কাটে। তা'কে আপনি কাটা বলেন?—একটু থামিয়া পুনশ্চ কহিল—জীবনের উচ্চ আকাঙ্খা পূর্ণ করতে যাদের এতটুকু চেষ্টাও নেই·····

খগেন বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—সে ইচ্ছেও আছে, সবই আছে, কিন্তু আমি যে একান্তই নিরুপায়, একান্তই অসহায়!

আপনি নিরুপায়-ও নন্, অসহায়-ও নন্। ইচ্ছে করলেই, আপনার উপায় ও রয়েচে, সহায় ও রয়েচে। খগেনবাবু, আমি ত বিলাসিতা করতে আপনাকে বিলেত যেতে বলি নি। আপনি যাচ্ছেন লেখাপড়া শিখ্‌তে, আপনি যাচ্ছেন দেশ-বিদেশের বিদ্যা অর্জ্জন করে আন্‌তে। এবং তাই থেকে কত মহৎ কাজ হ'তে পারে তা জানেন? আজ আপনার শত ইচ্ছায় যা করতে আপনি সক্ষম হ'চ্ছেন না, তখন দেশের কত কাজ আপনার দ্বারাতেই সম্ভব হ'বে ভেবে দেখুন -দেখি? দেশে কৃতীসন্তান যতই বাড়্‌বে, দেশের অভাব যে ততই কমবে, খগেন বাবু!—সে থামিল, একমুহূর্ত্ত মাত্র। তখনি আবার বলিল—আপনি কেন ভেবে দেখ্‌ছেন না, কত লোকের উপকার আপনি করতে পারবেন? কত লোকের ভাল-মন্দ আপনার পরেই নির্ভর করবে? আপনি কেন দেখ্‌ছেন না যে, কত শত লোক বিপদে আপদে আপনার পানে চেয়ে অভয়-আশ্বাসের ভরসা করবে?—একি কম গর্ব্বের কথা!

খগেন বলিল—কিন্তু কি সর্ত্তে টাকাটা আমি নেব তা বলে দাও সু।

সর্ত্ত! কি সর্ত্তে চান আপনি, তাই বলুন না?

খগেন মনে মনে ভাবিয়া বলিল—দু'টি সর্ত্তে নিতে পারি।

সুনীলা জিজ্ঞাসিল—কি? কি?

খগেন আবার একটু ভাবিয়া বলিল—এক, যদি তুমি এই টাকাটা আমাকে ঋণ দাও। কিন্তু যদিই, আমার ভাগ্যদেবী আমার'পরে কোন দিনই না সুপ্রসন্ন হ'ন, তখন্,—তখন্—তোমার টাকাটি যে শোধ করা অসাধ্যই হ'য়ে পড়বে।

সুনীলা ব্যগ্রস্বরে জিজ্ঞাসিল—আর একটা কি বল্‌ছিলেন যে!

খগেন একটুখানি ভাবিয়া বলিল—সে থাক্।

সুনীলা অকস্মাৎ খগেনের হাতটা চাপিয়া ধরিয়া বলিল—না বলুন।

খগেন বলিল—কি হ'বে শুনে! সে পাগলামী।

তাই শুন্‌ব।—বলুন।

পাগলামী শুনে কি হ'বে তোমার?

সুনীলা হাতটা ছাড়িয়া দিয়া অপ্রসন্নমুখে বলিল—থাক্—কাজ নেই আপনার বলে।

রাগ করলে সু?

সুনীলা মুখখানি করুণ করিয়া কহিল—না, রাগ কিসের?

খগেন এই বেদনাপূর্ণ ক'টি কথাতেই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল; বলিল—একান্তই শুন্‌বে সু?

সুনীলা তেজোদীপ্তস্বরে বলিল—না শুন্‌ব না, শুন্‌ব না। একটা কথা শোন্‌বার জন্যে এত সাধতে পারি না আমি।

খগেন নতমুখে বলিল—বল সু, একটি কথা মাত্র। কেবল বল, যে আমি যেন ভাবতে পারি—টাকাটা দান নয়, ঋণ নয়—আমারই···

নিদর্শন

কে বলেছে দান? ঋণই বা কে বলেছে? ও-সব ত আপনিই ভাঙ্গছেন, গড়ছেন। আমি বলেছি?

বল সু, ভাবতে পারি যে টাকাটা তোমার-আমার...

সুনীলা দাঁড়াইয়া উঠিয়া সতেজে বলিল—কতবার বল্‌ব! আপনার আপনার, আপনার। তিন সত্য করলুম, হ'য়েছে?

খগেন-ও দাঁড়াইয়া উঠিয়া সুনীলার হাত দু'টি চাপিয়া ধরিয়া বলিল—হ'য়েছে।......কিন্তু সে হাত ছাড়িল না। একটুখানি দ্বিধার সঙ্গেই বলিল—কিন্তু জ্যাঠাম'শায়......

সুনীলা বলিল—সে-ভাবনা আপনার নয়। সব ভাবনা-চিন্তা আমার ঘাড়েই তুলে দিয়ে বেরিয়ে পড়ুন ত! ক'টা বাজল—দেখেছেন! দু'টো বাজে যে! যান্—যান্—একখানা ট্যাক্সি করে' বেরিয়ে পড়ুন।

খগেন তবুও হাত দু'টি ছাড়িল না। কি-যেন বলি-বলি করিয়াও সে বলিতে পারিতেছিল না, তাহা বুঝিয়াই সুনীলা বলিল—আবার কি? —এবারে স্বরটা তেজের-ও নয়, স্পষ্টও নয়—যেন একটু জড়াইয়া গেল।

খগেন সুনীলার পানে না চাহিয়াই কহিল—এই টাকাটা তোমার...

সুনীলা অধৈর্য্যের মত বলিয়া উঠিল—কি বল্‌বেন এবার? টাকাটা অহিন্দু। মুসলমানের রান্না খাই আমি, আমার মত ওর-ও জাত নেই?

খগেন ধীরে ধীরে তার হাত দু'টি স্কন্ধের উপর তুলিয়া লইয়া বলিল—তোমার যদি জাত নেই সু, আমারই বা কোথায় আছে? বলিয়া খগেন একটু খানি বলের সহিতই সেই নির্জীব নিস্পন্দ নারীটিকে নিকটে আকর্ষণ করিল।

সুনীলা মাথাটি হেলাইয়া, তাহার স্কন্ধের উপর রাখিয়া বলিল—কি বল্‌ছেন ?

*　　*　　*　　*

আর একটা কাজ করবেন। ফেরবার পথে বীরেন্দ্র বাবুর বাড়ীটা একবার ঘুরে আস্‌বেন। আপনারও অনেক সাহায্য হ'বে, নীলারও···

খগেন হাসিয়া বলিল—আচ্ছা।

সুনীলা রক্তাক্ত কপোলটা গোপন করিতেই জানেলার ধারে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। একখানা খালি ট্যাক্সি ট্রাম রাস্তার দিকে যাইতেছিল, খগেনকে বলিল—থামান, থামান, থামান!

খগেন চলিয়া গেল।

আধঘন্টা পরেই আর একখানা মোটর থামার শব্দে চমকিত হইয়া সুনীলা জানলায় আসিয়া দেখিল, সুশীলা নামিয়া হাতের ব্যাগটি খুলিয়া ভাড়া মিটাইতেছে। তাহার চেহারা শুষ্ক, মলিন, পাণ্ডুবর্ণ। সুনীলা তাড়াতাড়ি নীচে নামিতেই সুশীলা ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞাসিল—বাড়ীর সব খবর কি সু?

সুনীলা বলিল—উপুরে এস, বলছি। পাঁচদিন নীলা শয্যাগত, আজ একটু ভালো আছে।

সুনীলা জিজ্ঞাসিল—খগেন আসে-টাসে?

সুনীলা নতমুখেই জবাব দিল—আসেন। এখনি ছিলেন, দিদি, বেরিয়েছেন।

সুশীলা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—চল্ সু।

প্রীতির নিদর্শন

সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে সুনীলা বলিল—মিঃ সিংহ, দিদি? রাঁচীতেই? ভাল আছেন?

সুশীলা বলিল—বোধ হয়।

সুশীলা ভাবিয়াছিল, ফেণিলার সাক্ষাতে সে বাহির হইতেই পারিবে না। কিন্তু ফেণিলা তাহাকে দেখিয়া আনন্দে অধীর হইয়া বলিল—কোন্ গাড়ীতে এলে দিদি? ভালো ছিলে?

লক্ষ্ণৌ থেকে আস্‌চি, নীলা। বাবার কাছে একদিন ছিলুম।

সুনীলা ও ফেণিলা সমস্বরে জিজ্ঞাসিল—বাবা ভালো আছেন দিদি?

হ্যাঁ ভাই ভালোই আছেন। খগেন কোথা গেল? এখনি আস্‌বে ত?

ফেণিলা সুশীলার পানে চাহিল। সুনীলা অন্যদিকে মুখ করিয়া বলিল—আস্‌বেন।

সাতটার ভেতর আস্‌বে ত? তা'কে যে আমার বিশেষ দরকার রয়েছে। আমাকে নিয়ে যাবে সে কুমার সত্যেন্দ্রনারায়ণের কাছে।

কুমার সত্যেন্দ্রনারায়ণ! কে দিদি?

আমাদের রাঁচীর বিদ্যালয়ের প্রোপাইটার।

মিঃ সিংহ নন্?

না ...... সে সব বলব'খন। স্নান করে ফেলি।

সুনীলা ব্যস্ত হইয়া কহিল—আমিও দু'টো রান্না চড়িয়ে দিই গে।

সুশীলা নিষেধ করিল, বলিল—এখন চা আর রুটী টুটি খাব সু, আমার ক্ষিধে নাই।

সুনীলা বলিতে লাগিল—সে কি হয় দিদি? দুপুরবেলা অনাহারে ইত্যাদি।

না ভাই, এবেলা আর নয়। সন্ধ্যেবেলা ৬টার ভেতরে খগেন আর আমাকে খাবার করে দিস্—খেয়ে যাবো বালীগঞ্জে। হ্যাঁরে, সে খায়?

সুনীলা লজ্জায় রক্তিম হইয়া কহিল—খান্।

ফেণিলা বলিল—রব্বানির হাতে নয়, মেঝ নিজে রেঁধেছে, তাই খেয়েছে। এবার বাবাকে বলে বুড় রব্বানিকে পেন্সন করে' দেওয়া যাবে। কি-বল দিদি!

সুশীলা হাসিয়া 'হুঁ!'—বলিয়া বাহির হইয়া গেল। তখনি টুয়ালেটা হাতে করিয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল—হ্যাঁরে নীলার অত অসুখ, বাবাকে কৈ খবর দিস্ নি ত?

সুনীলা বলিল—কখন্ দিই দিদি? আর অল্পে অল্পে গেল তাই, নইলে দিতেই হ'ত।

সুশীলা হাসিল, বলিল—আর খগেন ছিল, তাও বটে না-রে!—সে প্রস্থান করিতেই সুনীলা বলিল—চুপ করে' রইলে তুমি মেঝ?

কি করব রে?

ফেণিলা হাসিয়া বলিল—দুপুরবেলা অত লাফাতে লাফাতে খগেন বাবু এ ঘরে ঢুকে জামা গায়ে দিয়ে কোথায় গেলেন ভাই, ব্যাঙ্কে। টাকা জমা দিতে?

সুনীলা লাল হইয়া জিজ্ঞাসিল—তুই জান্লি······

ফেণিলা হাসিয়া কহিল—ম'শাই, এ দোরটা যে খোলাই ছিল, দু'জনের কারুই সে হুঁস হ'ল-না একবার। বলিহারী!

প্রীতির

নিদর্শন

সুনীলা কি-একটা বলিতে উদ্যত হইয়াছিল, ফেণিলা তৎপূর্ব্বেই কহিল - বোধ করি সিঙ্গী বনগমন করেছে, না-মেঝ?

কি-জানি! তবে, একটা কিছু হ'য়েছে—নিশ্চয়ই।

সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে খগেন লাফাইতে লাফাইতে উপরে উঠিয়া ডাকিল—নীলা, নীলা, কে এসেছেন দেখ?—এ-কি বড়দি, আপনি কখন্ এলেন?

আগন্তুকটি কে দেখিবার জন্য সকলেই মুখ ফিরাইয়াছিল, কিন্তু যে মুহূর্ত্তেই বীরদত্তের সৌম্য শান্ত মূর্ত্তি তাহাদের চক্ষের সম্মুখে প্রকাশ পাইল, সুশীলা সুনীলা পাশের দরজা দিয়া সরিয়া গেল। ফেণিলা কাপড়টা মুখে ঢাকা দিল।

বীরেন্দ্র বাহিরে দাঁড়াইয়াই কহিলেন—তোমার অসুখ করেছে? খগেন বল্লে—উত্তেজনার জ্বর। তা-হোক, এ উত্তেজনায় যদি একটু আধটু জ্বর হয় ক্ষতি কি! কত লোক যে উন্মাদ পাগল হ'য়ে ঘর ছেড়ে, সংসার ছেড়ে, বিভব-সম্পদ সব ছেড়ে ফকির হ'য়ে বেরিয়েছে! হ'লই-বা একটু জ্বর! বাংলা দেশে লক্ষ লক্ষ লোকের জ্বর ত লেগেই আছে, তা'দের ত উত্তেজনা-ও নেই, অবসাদ-ও নেই—তবু ত তারা জ্বরের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায় না। তবে সে জ্বরে আর এ-জ্বরে তফাৎ যে কি—সে ত আর আমাকে বল্‌তে হ'বে না, তুমি নিজেই জান!

বীরদৎ থামিলেন; একমিনিট পরে পুনরায় কহিলেন—আমি সব শুনেছি নীলা! শুনেই তোমাকে দেখবার জন্যে অধীর হয়ে উঠেছিলাম। সে-দেখা নয়,—মনের দেখা,—দেশের তরফ থেকেই এক সন্তান অন্য এক সন্তানকে দেখবার জন্য যেমন উদগ্রীব হয়, আমিও তেমনি ব্যাকুল

হ'য়েছিলাম। কি আর বল্‌ব তোমাকে নীলা! এই আশীর্ব্বাদ করি তোমার মনস্কামনা যেন সফল হয়; বাংলা দেশের মেয়েরা যেন তোমাকে দেখে এ-হেন সময়ে স্ব-স্ব কর্ত্তব্য বেছে নিতে পারে!—

বীরদৎ হাত দু'টি উপরে তুলিয়া কহিলেন—আশীর্ব্বাদ! আশীর্ব্বাদ!

লক্ষ করতালির শব্দ থামিয়া গেলেও যেমন অনেক্ষণ অবধি ঝন্ ঝন্ করিয়া বাজিতে থাকে বীরদৎ চ'লিয়া যাইবার পরেও ফেণিলা দু'টি হাত বুকের 'পরে রাখিয়া, সেই গুরু গম্ভীর শব্দই যেন সে শুনিতে লাগিল:—

আশীর্ব্বাদ! আশীর্ব্বাদ!

সুশীলা বলিল—এ-কি সন্ন্যাস?

খগেন মুগ্ধকণ্ঠে কহিল—কি জানি দিদি! আজই মান্দ্রাজে যাচ্ছেন, প্রচারে।

সুশীলা সহাসকণ্ঠে কহিল—তুমিও?

খগেন একমুহূর্ত্ত ভাবিয়া বলিল—না বড়-দি, আমি বিলেত যাচ্ছি।

বিলেত!—সুশীলা বজ্রাহতের মত কহিল—বিলেত। তুমি—খগেন? সে ফেণিলার দিকে চাহিতে লাগিল।

খগেন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই সুনীলা চঞ্চল পদক্ষেপে খগেনের সামনে আসিয়া ছোট্ট খাতাখানি খগেনের কোলের উপর ফেলিয়া দিয়া তেমনি চঞ্চল চরণে চলিয়া গেল।

সুশীলা খাতাটা তাড়াতাড়ি তুলিয়া লইল; খুলিয়া দেখিল, ব্যাঙ্কের খাতা, খগেনের নামে। টাইটেল পৃষ্ঠায় সুনীলার হাতে বাংলায় লেখা:—

"প্রীতির নিদর্শন"

প্রীতির

নিদর্শন

ফেণিলা পড়িয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—ভুল হ'য়েছে, মেঝ, ভুল হ'য়েছে—ওটা "প্রীতির নিদর্শন"—স্বরূপ, কি, চিহ্ন এমনি কিছু হওয়া উচিৎ ছিল।

সুশীলা লেখাটার পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া স্নেহ-স্বরে কহিল—না, নীলা। ঠিকই হ'য়েছে। এ-ত আর চিহ্ন নয়, সবটাই দিচ্ছে, ওর প্রীতির নিদর্শন। ভুল নয়, কি বল খগেন ?

খগেন বলিল—আমি বাংলায় পণ্ডিত নই, বড়-দি।

কিসে পণ্ডিত তবে ?

কিছুতেই না, দিদি। আমি মূর্খ, একটা আসল, আস্ত, খাজা, নিরেট, গো-মূর্খ।

সুশীলা ছপ্ করিয়া খগেনের পিঠে খাতাটির আঘাত করিয়া কহিল—মিথ্যে কথা! এক বিষয়ের অসাধারণ পণ্ডিত তুমি! বুঝতে পারছ না ?......বল্‌ব ? কিন্তু সুশীলা বলিল না, মুগ্ধনেত্রে দেখিল :—

খগেন......"with looks of cordial love
Hung over her enamored."

Milton.

আরও দেখিল, খগেনের দৃষ্টিটা দ্বারপার্শ্বে অবস্থিত সুনীলার 'পরেই নিবদ্ধ; আর সুনীলার চোখ সে দেখিতে পাইল, কেবলমাত্র তাহার গণ্ডের একদিকটাই সুশীলার নজরে পড়িল এবং সেখানে যে রং সে দেখিল, সে রং ফুলের নয়, রৌদ্রের নয়, ইন্দ্রধনুর নয়—কেবল তরুণী নবীনার গণ্ডেরই রং।

শেষ
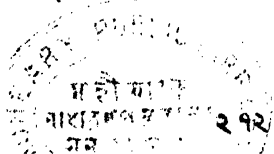
এই লেখকের আর ক'খানি বহি।

।	আলোকে আঁধারে (উপন্যাস)	...	১॥০
।	দিশেহারা (সুবৃহৎ উপন্যাস)	...	২৲
।	স্বপ্ন-পরিণীতা (ঐ)	...	১॥০
।	গৃহদেবী (ঐ)	..	॥০
৫	সীতার ভাগ্য (ঐ)	...	১৲
৬	বৌরাণী (উপহার যোগ্য ঐ)	...	১৲
৭	কিশোরী (মেয়েদের ঐ)	...	১৲
৮	ডাইনিবুড়ী (শিশুদের ঐ)	...	।/০
৯	সংশোধন (ছেলেদের নাটক)	...	।০
১০ ।	অঞ্জলি (গল্প সমষ্টি)	...	॥০
১১ ।	বড়বাবু (কয়েকটি প্রসিদ্ধ গল্প)	...	।/০
	রাজকন্যার গল্প (সুচিত্রিত) প্রতি খণ্ড	...	।/০

কয়েকখানি উৎকৃষ্ট উপন্যাস।

ধর্ম্মপত্নী—শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত সুবৃহৎ পারিবারিক উপন্যাস, মূল্য ৩৲ টাকা মাত্র। যতীনবাবুর পারিবারিক উপন্যাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলিবার নাই। এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যতীনবাবুর উপন্যাস বঙ্গ-গৃহলক্ষ্মীদের একমাত্র আদরের সামগ্রী। সুন্দর ছাপা, বিলাতী বাঁধাই।

স্বয়ম্বরা—শ্রীশ্রীপতিমোহন ঘোষ প্রণীত সামাজিক উপন্যাস মূল্য ১।৷০ টাকা মাত্র। এই পুস্তকখানিতে সমাজের অনেক চিত্রই আছে। সকলেরই পাঠ করা উচিত। এ্যান্টিক কাগজে ছাপা, রেশমী বাঁধাই।

বিয়ের কনে—শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত বৈচিত্র্যময় সামাজিক উপন্যাস। ভাব, ভাষা, ঘটনা আগাগোড়া নূতন। এ্যান্টিক কাগজে ছাপা, রেশমী বাঁধাই, মূল্য ১।৷০ টাকা মাত্র।

কমলিনী—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সরকার এম, এ, বি, এল প্রণীত সুন্দর উপন্যাস—মূল্য ১৷০। ছাপা বাঁধা সকলই সুন্দর।

মিলন—শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত সচিত্র সুন্দর স্ত্রীপাঠ্য উপন্যাস। উপহার দিবার মত এমন পুস্তক আর একখানিও নাই, নিঃসঙ্কোচে পুত্র-কন্যার হস্তে প্রদান করা যায়। রঙ্গিন কালীতে ছাপা, তুলাট প্যাডে রেশমে বাঁধা, মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

সতীর-স্বর্গ—শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত স্ত্রীপাঠ্য উপন্যাসের মধ্যে 'সতীর-স্বর্গ' সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। ২য় সংস্করণ রেশমে বাঁধা, সোনার জলে নাম লেখা, মূল্য ১৷০ মাত্র।

সতীলক্ষ্মী—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত গার্হস্থ্য উপন্যাস তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। রেশমে বাঁধা, মূল্য ২৲ টাকা।

লক্ষ্মীলাভ—৺ধীরেন্দ্রনাথ পাল প্রণীত এ এক নূতন ধরণের নূতন উপন্যাস। পল্লী-জননীর নিখুঁত চিত্র। স্বর্ণমণ্ডিত রেশমে বাঁধা, মূল্য ১৷০ মাত্র।

স্বর্ণকুটীর—দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য প্রণীত সুন্দর উপন্যাস। ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। সুরঞ্জিত রেশমে বাঁধা; মূল্য ১।৷০ দেড় টাকা মাত্র।

হরপার্ব্বতী—শ্রীসত্যচরণ চক্রবং
উপন্যাস অপেক্ষাও মধুর। যেমন ছাপা, তে

স্বর্ণ-প্রতিমা—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় ... মে বাঁধা সচিত্র সুন্দর প্রকাণ্ড সামাজিক উপন্যাস। স্বর্ণ-প্রতিমা হিন্দুগৃহের উজ্জ্বল চিত্র। পুণ্য-প্রেমের অপূর্ব্ব সমাবেশ। মূল্য ১॥০ টাকা মাত্র।

বিন্দুর বিয়ে—শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত। কন্যার বিবাহে পিতার দীর্ঘশ্বাস, অভাবের দারুণ হাহাকার, বঙ্গগৃহের প্রতিদিনের ঘটনা। মনোরঞ্জন চিত্র, রেশমে বাঁধা, সোনার জলে নাম লেখা। মূল্য ১॥০ টাকা মাত্র।

কমলার অদৃষ্ট—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত গার্হস্থ্য উপন্যাস। রেশমে বাঁধা, সোনার জলে নাম লেখা, মূল্য ১॥০ টাকা।

সঙ্গিনী—শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত। সঙ্গিনী বঙ্গকুলললনা মাত্রেরই পাঠ করা উচিত। বিবাহিত জীবনে যাহাতে রমণীর সমস্ত সুষমা নির্ম্মাল্য হইয়া উঠে, এই পুস্তকে অতি সরল ভাবে তাহারই পথ প্রদর্শন করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত সঙ্গিনীতে সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তী প্রভৃতি আদর্শ সঙ্গিনীগণের জীবনী প্রদান করা হইয়াছে। তুলার প্যাডে রেশমে বাঁধা, সোনার জলে নাম লেখা, মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

সুখের মিলন—শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত অপূর্ব্ব সামাজিক উপন্যাস। সুন্দর বাঁধা, সুন্দর ছাপা, মূল্য ১॥০ টাকা।

পরাধীনা—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত সুবৃহৎ পারিবারিক উপন্যাস। উপন্যাসখানির আগাগোড়া নূতন। এমন ঘটনাবহুল উপন্যাস বহুকাল বাহির হয় নাই। মূল্য ১॥০ টাকা।

সতীরাণী—শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত গার্হস্থ্য উপন্যাস। বিবাহ-বাসরে উপহার দিবার একমাত্র পুস্তক। দ্বিতীয় সংস্করণ, তুলার প্যাডে বাঁধা, মূল্য ১৲ এক টাকা।

রংবাহার—শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত প্রহসন। মিনার্ভা থিয়েটারে মহা সমারোহে অভিনয় চলিতেছে। মূল্য ।৵০ আনা।

ভাগ্যবতী—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মণ্ডল প্রণীত সুন্দর সামাজিক উপন্যাস। সিল্কে বাঁধা, সোণার জলে নাম লেখা, মূল্য ১॥০ টাকা মাত্র।

ভোরের আলো—শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ প্রণীত সামাজিক উপ-